সেবা
প্রকাশনী
কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম-২৭
রকিব হাসান

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ২৭

(ঐতিহাসিক দুর্গ + রাতের আঁধারে + তুষার বন্দি)

রকিব হাসান

ভলিউম ২৭

তিন গোয়েন্দা

৮০, ১১২, ১১৪

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
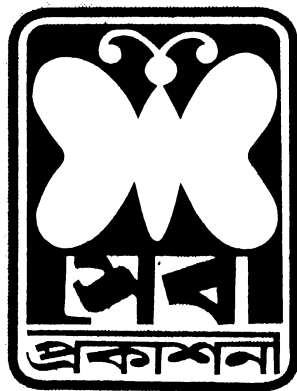
ISBN 984-16-1367-0
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
টিপু কিবরিয়া
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল: ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

সেবা প্রকাশনী

সাতচল্লিশ টাকা

Volume-27
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩৫/
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নে[illegible]ানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-

ঐতিহাসিক দুর্গ

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৯৪

তিনটে নতুন সাইকেল কিনেছে তিন গোয়েন্দা। আগেরগুলো বেশি পুরানো হয়ে গিয়েছিল, বিক্রি করে দিয়ে তার সঙ্গে টাকা ভরে কিনেছে। পুরো টাকাটাই ওদের উপার্জনের, ইয়ার্ডে কাজ করে যে পারিশ্রমিক পেয়েছে, সেই টাকা। নিজের টাকায় জিনিস কেনার মজাই আলাদা।

স্কুল ছুটি। হাতে তেমন কোন কাজ নেই। দু-দিন ধরে সাইকেল নিয়ে রকি বীচের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা।

তৃতীয় দিন সকালে কিশোর বলল, 'চলো, আজ উত্তরে চলে যাই। ম্যাপে দেখলাম, দেখার মত বেশ কিছু জায়গা আছে ওদিকটায়।'

মুসা বলল, 'দেখার মত জায়গা দক্ষিণেও আছে।'

'একসঙ্গে তো আর দুটো জায়গায় যাওয়া যাবে না। এসো, ভোটাভুটি হয়ে যাক। আমি উত্তর।'

'ভোটের কোন দরকার নেই,' সমাধান করে দিল রবিন। 'উত্তর-দক্ষিণ, কোন দিকেই যেতে আমার আপত্তি নেই।' পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করল সে। 'টস করি। মুসা, তুমিই বলো, হেড, না টেল?'

'টেল।'

'তারমানে, টেল হলে দক্ষিণে যাব আমরা,' বলতে বলতে পয়সাটা টোকা দিয়ে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল রবিন। ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগল ওটা। হাতের তালুতে লুফে নিল সে।

দেখার জন্যে ঝুঁকে এল অন্য দু-জন।

'দূর!' মুখ বাঁকাল মুসা, 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ!'

তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে বসে কথা বলছে ওরা। পায়ের কাছে বসে আছে চিতা। অনেকক্ষণ তার দিকে কারও মনোযোগ নেই, এটা সহ্য করতে পারল না সে, প্রতিবাদ জানাল 'খউ! খউ!' করে।

'এত রাগিস কেন,' হেসে কুকুরটার মাথায় আলতো চাপড় দিল কিশোর। 'তোকেও নিয়ে যাওয়া হবে আজ। সাইকেলের পাশে পাশে দৌড়াতে পারবি তো?'

কি বুঝল চিতা কে জানে, মাথা ঝাঁকাল। বলল, 'ঘউ!'

'এ-ব্যাটা বহুত চালাক,' হেসে বলল রবিন। 'মাথা ঝাঁকানোটা শিখল কোত্থেকে?'

'শিখবে না,' মুসা বলল, 'ট্রেনিংটা কি পাচ্ছে।'

সাগরের ধার দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা পথ। নাক বরাবর উত্তরে এগোল ওরা। বেশি জোরে চালাতে পারছে না, চিতার জন্যে, জোরে দৌড়ালে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়বে সে।

হনিভিল নামে একটা জায়গায় পৌঁছল ওরা। সামনে পুরানো একটা দুর্গ। পথের মোড়ে সাইনবোর্ড লেখা:

জনসাধারণের জন্যে
খুলে দেয়া হয়েছে

'ঢুকবে নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

হেসে বলল রবিন, 'ভূতের ভয় করে না?'

'এই দিনের বেলা আর কি ভয় করব।'

'বাহ্, সাহস হয়েছে আমাদের মুসা আমানের।'

'সাহস ওর কবেই বা কম ছিল?' দুর্গটার দিকে তাকিয়ে প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল কিশোর।

ঢোকাই স্থির করল ওরা। সাইকেলগুলো চত্বরে রেখে ধনুকের মত বাঁকা খিলানের দিকে এগিয়ে গেল। ওটা প্রধান ফটক। ভেতরে ঢুকতেই আবহাওয়া আরেক রকম হয়ে গেল। চমৎকার ঠাণ্ডা।

আবছা অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে কণ্ঠস্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি আছে এখানে দেখার?'

চোখে সয়ে এল আলো। এককোণে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে আছে একজন লোক। কাছে এগিয়ে গেল ওরা।

'কি আছে দেখার?' জানতে চাইল কিশোর।

'দুর্গটা ষোলো শতকে তৈরি,' মুখস্থ বুলি গড়গড় করে আউড়ে গেল যেন লোকটা, 'অপূর্ব নির্মাণকৌশল; স্থাপত্যশিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন। দেখার মত অনেক প্রাচীন আসবাব রয়েছে। কাঁচের বাক্সে সাজানো আছে পুরানো আমলের বাক্স, ফুলদানি, অস্ত্রশস্ত্র, ব্রৌচ, বাকলেস, সোনা ও রূপার তৈরি নানা রকমের অলঙ্কার—দুর্গের মহিলারা পরত ওসব। এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে দেখার।'

পুরানো আমলের জিনিসের প্রতি বিশেষ ঝোঁক কিশোরের, দেখতে খুব পছন্দ করে। তিনটে টিকেট কিনল। এগিয়ে গেল প্রবেশ-পথের দিকে। মুসার পায়ে পায়ে রয়েছে চিতা।

পেছন থেকে ডাক দিল লোকটা, 'অ্যাই, কুত্তা নিয়ে যাওয়া নিষেধ। এখানে বেঁধে রেখে যাও। ফেরার পথে নিয়ে যেয়ো।'

মুসা জবাব দিল, 'আজেবাজে কুকুর নয় আমাদেরটা। অহেতুক চেঁচায় না, দুষ্টুমি করে না···ভদ্র কুকুর। যদি মনে করেন, এর জন্যেও টিকেট কিনতে আপত্তি নেই।'

ফিরে এসে একটা টিকেটের দাম লোকটার সামনে ফেলে দিয়ে ডাক দিল চিতাকে, 'আয় চিতা, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, আয়।'

দ্বিধায় পড়ে গেছে লোকটা। সে হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই কুকুরটাকে নিয়ে সরে চলে এল গোয়েন্দারা।

লম্বা, কাঁচের তৈরি নিচু একটা শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

হতাশ মনে হলো কিশোরকে, 'এ-কি! সব তো নকল মনে হচ্ছে!'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'ওই লোক মিথ্যে বলেছে আমাদের, ঠকিয়েছে!'

'আরেকটু এগিয়ে দেখি না,' মুসা বলল। 'সামনে আসল জিনিস থাকতেও পারে। আমার কাছে কিন্তু আসলই মনে হচ্ছে।'

'না চিনলে তো আসলই মনে হবে।'

আরও শো-কেস আছে ঘরে, কিন্তু কোনটাতেই আসল জিনিস দেখা গেল না।

'আশ্চর্য! এভাবে ঠকাল?' জানালার নিচের কতগুলো খালি বাক্স আর একটা শো-কেস দেখিয়ে বলল কিশোর, 'ওগুলো ও রকম করে ফেলে রাখা হয়েছে কেন?...দেখো, শো-কেসটার তালা খোলা, ভেঙে খোলা হয়েছে! বাক্সগুলোর ডালা ভাঙা!'

ঘরে আরেকজন লোক রয়েছে, ওদেরই মত দর্শক। ঘুরে এগিয়ে এল কাছে।

'তোমরা মনে হয় কিছু শোনোনি,' লোকটা বলল। 'গত হপ্তায় ডাকাতি হয়েছে এখানে। খবরের কাগজেও তো নিউজটা দিয়েছে। আমি তো সে জন্যেই এলাম, কি কি নিয়েছে দেখতে। কিছুই রাখেনি, সব নিয়ে গেছে।' আঙুল তুলে দরজার দিক দেখাল সে, 'ঢোকার সময় একথা জানানো উচিত ছিল তার।' টিকেট বিক্রেতার কথা বলছে লোকটা, বুঝল গোয়েন্দারা। 'সে রকম কিছু তো বলেইনি, বরং আগের কথাই আউড়েছে। ভঙ্গিটা, যেন সব ঠিক, কিচ্ছু হয়নি কোথাও। টিকেটের দামও নিয়েছে সমান। এটাও এক ধরনের ডাকাতি।'

'ডাকাতি না হলেও ধাপ্পাবাজি,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। আনমনে বিড়বিড় করতে করতে এগোল দরজার দিকে।

লোকটা চলে গেলে বন্ধুদের দিকে ফিরল কিশোর, 'জিনিসপত্রের অবস্থা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। এখন বুঝলাম।'

'মিউজিয়ামে ও রকম চুরি-ডাকাতি হয়েই থাকে,' মুসা বলল, 'ও এমন কিছু না।'

'কিন্তু লোকটা যে বলে গেল কিছুই রাখেনি, সব সাফ করে দিয়েছে?'

'সুযোগ পেলে তো করবেই। আমার রাগ লাগছে টিকেট যে বেচেছে তার ওপর, দাম এক রকম রাখল কেন। চলো, ব্যাটার ঘাড় ধরে আদায় করব।'

টিকেট বিক্রেতাকে এসে ধরল ওরা।

চিতার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকটা, 'হ্যাঁ, বড় রকমের ডাকাতিই হয়েছে এখানে। তালা ভেঙে, বাক্স ভেঙে সবচেয়ে

দামী জিনিসগুলো নিয়ে গেছে। দামী যে কয়েকটা আছে এখনও, হয় নেয়ার অসুবিধের জন্যে, নয়তো বেচতে পারবে না বলে নেয়নি। বাকিগুলোর কোন দামই নেই।'

'পুলিশ কিছু করতে পেরেছে?' জানতে চাইল মুসা।

'না,' মাথা নাড়ল লোকটা। 'ভীষণ চালাক চোর। কোন সূত্রই রেখে যায়নি। এখানকার আরও দুটো মিউজিয়ামে চুরি হয়েছে। পুলিশের ধারণা, একই দলের কাজ। কেন, পত্রিকা পড়ো না?'

কিশোর আর রবিনের দিকে তাকাল মুসা। পত্রিকা-টত্রিকা সে বিশেষ পড়ে না। কিন্তু বুঝল, এই বিশেষ খবরটার ব্যাপারে ওই দু-জনও তারই মত অন্ধকারে।

রবিন বলল, 'পত্রিকা তো পড়ি। খবরটা চোখে পড়েনি। নিশ্চয় ভেতরের পাতায় বেরিয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'হ্যাঁ, ছোট্ট খবর। চোখে পড়ার মত নয়। তা-ও সব পত্রিকায় দেয়নি, দু-একটাতে শুধু। আমরা জানি বলে চোখে পড়েছে।'

'তাই বলুন। কত খবরই তো চোখ এড়িয়ে যায় আমাদের।'

আরও টুকটাক কয়েকটা প্রশ্ন করে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। বাড়ি রওনা হলো।

আসার সময় ছিল উল্টো বাতাস, এখন পেছন থেকে ঠেলছে, ফলে সাইকেল চালাতে খুব সুবিধে হচ্ছে। প্যাডেলে জোর প্রায় দিতেই হচ্ছে না।

চুরির ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে চলল ওরা।

ইয়ার্ডে ফিরেই আগে কয়েক দিনের পুরানো পত্রিকা বের করল কিশোর। রবিনের দিকে কয়েকটা ঠেলে দিয়ে বাকিগুলো নিজে নিয়ে বসল। খবরগুলো বের করতে সময় লাগল না।

পড়ে মনে হলো, বেশ সংঘবদ্ধ, শক্তিশালী একটা দলের কাজ। ছিঁচকে চোর নয়। হনিভিলের ওপর নজর পড়েছে ওদের, তার কারণ, বেশ কিছু দুর্গ আর মিউজিয়াম আছে ওখানে। অনেক আগে স্প্যানিশরা এসে কলোনি করেছিল, দু-একজন ইংরেজও এসেছিল। তারাই বানিয়েছিল দুর্গগুলো। বেশ দামী দামী জিনিস আছে মিউজিয়ামগুলোতে, যার অ্যানটিক মূল্য অনেক।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর, 'পড়ে তো মনে হচ্ছে, হনিভিলটাকে সাফ করে দেয়ার প্ল্যান করেছে চোরেরা।'

দুই

পরদিনও সকালটা খুব সুন্দর। ঝলমলে রোদ। নাস্তা খেয়েই ইয়ার্ডে চলে এল রবিন ও মুসা। মুসা আগে এল।

তার কয়েক মিনিট পরেই রবিন। ঢুকেই কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'আজকের কাগজ পড়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'পড়েছি।'

'উইলমিং হাউসেও। ওই এলাকার কোন বাড়ি আর রাখল না।

ওদের কথা বুঝতে পারল না মুসা, সে খবরের কাগজ পড়েনি। জিজ্ঞেস করল, 'কি রাখল না? কি বলছ?'

'কি আর,' রবিন বলল, 'ডাকাতির কথা। কাল রাতে হনিভিলের উইলমিং হাউসেরও চুরি করে নিয়ে গেছে সব। দামী দামী ছবি ছিল ওদের ব্যক্তিগত গ্যালারিতে, নিয়ে গেছে। পুলিশ বলছে, চুরি করতে করতে আত্মবিশ্বাস এতটাই বেড়ে গেছে ওদের, কিছু কেয়ারই করছে না।'

এককোণে সোফায় বসে একটা হিসেবের খাতা দেখছেন মেরিচাচী। বলে উঠলেন, 'বলে কেন, ধরতে পারে না? বক্তব্য দিয়েই খালাস।'

'পারলে কি আর ধরত না,' কিশোর বলল। 'আঁটঘাট বেঁধেই চুরি করতে নেমেছে চোরেরা, অত সহজে ধরা পড়ার জন্যে নয়।'

'তাহলে চোরের চেয়ে বেশি চালাক যারা, তাদেরকেই পুলিশে চাকরি দেয়া উচিত।'

'তোমার কি ধারণা সে রকম লোক নেই পুলিশে? বাঘা বাঘা ক্রিমিন্যালগুলোকে ধরছে কি করে তাহলে? না ধরলে অপরাধীতে ছেয়ে যেত না দেশটা?'

এ কথার কোন জবাব খুঁজে পেলেন না মেরিচাচী। কিশোরের সঙ্গে তর্কে পারেন না তিনি। এ জন্যে অবশ্য তাঁর কোন ক্ষোভ নেই। বরং সবার কাছে গর্ব করে বলে বেড়ান, আমার ছেলের মত বুদ্ধিমান ছেলে আর হয় না। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, 'আজও বেরোবি নাকি তোরা?'

'কাজ নেই, বসে থেকে কি করব,' জবাব দিল কিশোর।

'কাজের কি আর শেষ থাকে নাকি। বের করে নিলেই হলো। এই তো, দশ-বিশটা কাজ এখনই দেখিয়ে দিতে পারি; লোহার চেয়ারগুলো পড়ে আছে, রঙ করা বাকি, কাঠের বাক্সগুলো...'

'দোহাই তোমার, চাচী, এই পচা কাজগুলো বোরিস আর রোভারকে দিয়েই করাও। এ সব করতে আর ভাল্লাগে না...'

হাসলেন চাচী। 'করতে বলছিও না। কাজ নেই বললি, তাই দেখালাম। শোন, বেরোতে চাইলে বেরোতে পারিস। স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিতেও আমার আপত্তি নেই।'

চোখ সরু করে ফেলল কিশোর, কাজের ব্যাপারে মেরিচাচীর হঠাৎ এই উদারতা সন্দেহজনক। নিশ্চয় কোন ফন্দি করেছেন। জিজ্ঞেস করল, 'চাচা কোথায়? নাস্তার টেবিলে তো দেখলাম না।'

'ভোর রাতেই উঠে চলে গেছে। হলিউডের ওদিকটায়, কোথায় নাকি একটা বাড়ি ভাঙা হবে। অনেক পুরানো মাল আছে। পছন্দ হলে কিনে ফেলবে আগামী হপ্তা নাগাদ।'

গুঙিয়ে উঠতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল কিশোর। এত খাতিরের কারণটা

এতক্ষণে বোঝা গেছে! এই হপ্তায় খাটালে পরে আর চাপ দিতে পারবেন না, সে-জন্যে ওদেরকে ছেড়ে রেখেছেন চাচী। রাশেদ পাশা মালগুলো কিনে আনলেই গাধার খাটুনি চাপিয়ে দেবেন ঘাড়ে।

দিলে তখন আর কিছু করতে পারবে না। তার চেয়ে এখন যখন সুযোগ দিতে চাইছেন, সেটা গ্রহণ করা উচিত, পরে আর এটাও পাবে না; সামনে যা পাও হাত পেতে নাও…

'দাও তাহলে,' বলল সে, 'পিকনিকেই বেরোব আজ।'

মেরিচাচীর সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে চলল সে। সুযোগটা তো নেবেই, চাচীকেও খাটিয়ে মারবে, যতটা সম্ভব শোধ আগে থেকেই তুলে রাখবে। পিছে পিছে এল তার দুই সহকারী।

নানা রকম খাবারের ফরমায়েশ করতে লাগল কিশোর। তিন রকমের স্যান্ডউইচ, ফ্রুট কেক, পনির, টমেটো, এ সব তো নিলই, ফ্লাস্কে ভরে নিল বরফ মেশানো কমলার রস। খাবারগুলোর দিকে লোভীর মত হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। সেটা বুঝে টিপ্পনী কাটল রবিন, 'কি, জিভে পানি?'

'অ্যাঁ!…তা তো কিছুটা আসেই…থাক, পরেই খাব।'

হেসে ফেলল কিশোর আর মেরিচাচী।

স্যামন মাছের বাড়তি একটা স্যান্ডউইচ বাড়িয়ে দিয়ে চাচী বললেন, 'নাও, খেয়ে ফেলো।'

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। হনিভিলেই যাবে। জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছে ওদের। তাছাড়া একটা রহস্যের গন্ধ যেহেতু পেয়েছে, সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই কিশোর পাশার।

অন্যান্য দিনের মতই সেদিনও চিতাকে নিয়েছে সঙ্গে। সাইকেলের পাশে পাশে দৌড়ে চলেছে সে।

এক জায়গায় একেবারে সৈকত ঘেঁষে চলে গেছে পথ। সেটা পার হয়ে মোড় নিতেই ছোট একটা পাহাড় দেখা গেল। সবুজ ঘাসে ঢাকা। গাছপালা আর ঝোপও জন্মে আছে ঢালে। পাহাড়ে চড়ার প্রস্তাব দিল রবিন। চড়তে ভাল লাগে তার। চড়তে গিয়ে পা-ও ভেঙেছে; ভাঙা হাড় জোড়া লেগেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে যন্ত্রণা দেয়, তবু চড়ার অভ্যাস ছাড়তে পারে না সে। এটা যেন একটা নেশা তার কাছে। দুই বন্ধুর জানা আছে সে কথা। তাই কোন প্রতিবাদ করল না ওরা। সাইকেলগুলো পাহাড়ের গোড়ায় রেখে খাবারের প্যাকেট নিয়ে উঠতে শুরু করল।

দারুণ আনন্দে আছে চিতা। প্রজাপতি আর ফড়িঙের অভাব নেই এখানে। খুফ! খুফ! করে ওগুলোকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

'চমৎকার জায়গা, না?' মুগ্ধ হয়ে দেখছে রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ। সুন্দর।'

একটা মোটামুটি সমতল জায়গায় এসে গাছের ছায়ায় বসে পড়ল ওরা। পায়ের নিচে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঘাসে ছাওয়া ঢাল, একেবারে উপত্যকা

পর্যন্ত। মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। তার ওপাশে আবার ঘাসে ছাওয়া খানিকটা উপত্যকার পর সাগর। ঝকঝকে নীল আকাশের কোথাও একরত্তি মেঘ নেই। সাগরকে মনে হচ্ছে একটা নীল আয়না, রোদে চকচক করছে। খুব সুন্দর আবহাওয়া।

'খাওয়ার ঝামেলাটা সেরে ফেললে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তোমার কাছে ওটা আবার ঝামেলা হলো কবে থেকে?' ফোড়ন কাটল রবিন, 'ওটা তো তোমার জন্যে আনন্দ। আচ্ছা, মুসা, সোজা কথাটা সোজা করে বলতে পারো না কেন তুমি? বললেই হয়, খিদে পেয়েছে।'

'কি করে বলব? সেটা তো সব সময়ই লেগে থাকে আমার।'

হাসল কিশোর, 'ঠিক। এই অকাট্য যুক্তির পর মুসাকে তোমার আর খেপানো উচিত না, রবিন। এসো, ঝামেলাটা চুকিয়েই ফেলি।'

খাওয়ার পর কিশোর গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। উদাস নয়নে তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। কয়েকটা সী-গাল উড়ছে। দেখতে দেখতে তন্দ্রা নেমে এল তার চোখে।

ঘাসের ওপর শুয়ে রবিনও ঘুমিয়ে পড়ল।

চোখ খোলা রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল কিছুক্ষণ মুসা, তারপর সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল। খাওয়ার পর আরেক দফা প্রজাপতি তাড়াতে যেতে চেয়েছিল চিতা, ধমক দিয়ে তাকে বসিয়ে দিয়েছে মুসা। মনমরা হয়ে শুয়ে আছে এখন বেচারা।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মুসার। চোখ মেলে বোঝার চেষ্টা করল, কেন ঘুমটা ভাঙল তার। কিশোর ও রবিনের চোখ বোজা। ওরা কোন শব্দ করেনি।

কান খাড়া করে একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছে চিতা। ওর এই সতর্ক ভঙ্গিটা নজর এড়াল না মুসার। সে-ও তাকাল ঝোপটার দিকে।

'খাইছে! এ-কি!' প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠল সে।

জেগে গেল কিশোর, 'কি হয়েছে?'

'ওই ঝোপটা...নড়ল মনে হলো!'

'নড়ল?'

'তাই তো দেখলাম!'

'স্বপ্ন দেখেছ,' চোখ ডলতে ডলতে বলল রবিন। 'কই, এখন তো নড়ছে না।'

'তখন নড়েছে!'

'ঝোপ নড়লে কি হয়? হয়তো বাতাসে নড়েছে। সে তো নড়তেই পারে। এমন চমকে যাওয়ার কি হলো?'

'তা বলতে পারব না। তবে আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে ব্যাপারটা!'

'কেন, অদ্ভুত কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'তা তো বলতে পারব না। তবে অস্বাভাবিক লেগেছে, এটা ঠিক।'

'বেশি খেলে হজমের গোলমাল হয়, আর গোলমাল হলে মাথা গরম হয়ে

যায়। তোমারও তাই হয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদৃশ্য মানবের স্বপ্ন দেখছিলে নাকি তুমি?' রবিন বলল, 'ওই যে, যে লোক...'

'দেখো, রবিন, আমি সিরিয়াস...ওই তো, আবার নড়ল! ওই যে ওই বড় ঝোপটা! এবারও দেখোনি তোমরা?'

'আমরা তো তোমার দিকেই তাকিয়ে আছি...'

ঘেউ ঘেউ করে উঠল চিতা। লাফ দিয়ে উঠে সোজা দৌড় দিল ঝোপটার দিকে।

'এই চিতা, কোথায় যাচ্ছিস! আয়, জলদি আয়!' ডাক দিল মুসা। 'খবরদার, যাবিনে ওখানে!'

'নিশ্চয় খরগোশ দেখেছে,' রবিন বলল। 'খরগোশেই নেড়েছে ঝোপটা।'

'এতবড় ঝোপ খরগোশে নাড়বে? অসম্ভব...'

কিন্তু মুসাকে হেয় করে দেয়ার জন্যেই যেন ঠিক এই সময় ছুটে রেরিয়ে এল একটা খরগোশ। ভয় পেয়েছে ওটা। চিতার দিকে একবার তাকিয়ে দুই লাফে গিয়ে ঢুকল আরেকটা ঝোপে। ছুটে যেতে চাইল কুকুরটা। ধমক দিয়ে তাকে ফেরাল মুসা।

'কি বুঝলে?' মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন। 'বললাম না, হজমের গোলমাল...অহেতুক আমার আরামের ঘুমটা নষ্ট করলে।' আবার চোখ মুদল সে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কি ভাবল সে-ই জানে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। জায়গাটার বাতাসে যেন ঘুমের ওষুধ আছে। কেবলই চোখের পাতা বুজিয়ে দিতে চায়।

ঝোপটার দিকে তাকিয়েই রয়েছে মুসা। চোখের সামনে খরগোশ বেরোতে দেখেও বিশ্বাস করতে পারল না ওটা খরগোশে নেড়েছে।

কিন্তু আর নড়ল না ঝোপটা।

তিন

আরও প্রায় আধঘণ্টা পর আবার চোখ মেলল কিশোর। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'খাওয়াও হয়েছে, বিশ্রামও হয়েছে। এখানে আর বসে থাকার কোন মানে হয় না।'

'কোথায় যাব?' মুসার প্রশ্ন।

'চলো, চুরির খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

'আরেকটা জায়গা কিন্তু আছে এখানে দেখার,' রবিন বলল। 'গরডন ফোর্ট।'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল কিশোর, 'কি করে জানলে?'

'কেন, তুমি জানো না?'

নীরবে মাথা নাড়ল কিশোর।

মুচকি হাসল রবিন। 'আজকের আগে আমিও জানতাম না। সকালে একটা ট্যুরিস্ট লিফলেট পড়ে জেনেছি। আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম। বলল, এখানকার সবচেয়ে বড় বাড়ি ছিল একসময় ওটা। ও বাড়িতে এখনও চুরি করতে ঢোকেনি চোরেরা। আব্বার ধারণা, ঢুকতে পারেনি বলেই ঢোকেনি, এতটাই সুরক্ষিত। তখনই ঠিক করলাম, বাড়িটা দেখতে যাব।'

'একথা আগে বলোনি কেন?'

'তোমাদের সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে।' হাসল রবিন। 'এবং তাতে যে সফল হয়েছি, তোমাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।'

'হয়তো চুরি করার নেই কিছু ওখানে,' মুসা বলল, 'সে জন্যেই ঢোকেনি চোরেরা।'

'দামী কিছু আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'আছে, ঘড়ি।' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে ঘাড় কাত করে মুসা ও কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। ওদেরকে বিস্মিত হতে দেখে হাসল। 'সাধারণ ঘড়ি নয়, সব সোনার তৈরি, অনেক দাম একেকটার। মিস্টার আরথার গরডন, গরডন ফোর্টের শেষ মালিক এখনও বেঁচে আছেন। ঘড়িতে তাঁর বেজায় আগ্রহ। অনেক ঘড়ি আছে তাঁর সংগ্রহে। কিছু কিছু ঘড়ির আবার ইতিহাস রয়েছে। কোনটা রোমাঞ্চকর, কোনটা মজার। মানুষকে দেখাতে তাঁর আপত্তি তো নেইই, বরং গর্ব বোধ করেন।'

'এতদিন জানলাম না কেন তাহলে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।

'এতদিন জনসাধারণের দেখার জন্যে খুলে দেয়া হয়নি, তাই। হনিভিলে যে অ্যানটিকের ছড়াছড়ি, রকি বীচের এত কাছে বাস করেও এতদিন আমরা জানতাম না, এর কারণ, এতদিন সাধারণ মানুষের দেখানোর কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এবার হয়েছে। হনিভিলের ব্যক্তিগত মিউজিয়ামের মালিকরা একজোট হয়ে আলোচনা করে ঠিক করেছে, ওগুলো বাইরের মানুষকে দেখানো উচিত।'

'আর দেখিয়েই কুড়াল মেরেছে নিজেদের পায়ে, চোর লেগেছে পেছনে। তো, গরডন ফোর্ট সম্পর্কে আর কি জানো?'

'হনিভিলের ওপর সম্ভবত একটা আর্টিকেল করবে আব্বা। অনেক খোঁজখবর নিয়েছে। আমরা যদি নতুন কোন তথ্য জানাতে পারি, আমাদের কাছ থেকে সেটা কিনে নেবে বলেছে।'

'তাই নাকি?' খুশি হয়ে বলল মুসা, 'খুব ভাল। তাহলে তো আমাদের যাওয়াই উচিত। আমার কিছু টাকা দরকার। সাইকেলের একটা নতুন ধরনের ক্যারিয়ার বেরিয়েছে দেখলাম। খুব সুন্দর। টাকা পেলে কিনে ফেলব।'

মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। আপাতত সাইকেলের ক্যারিয়ার নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। 'গরডন ফোর্ট সম্পর্কে আর কি জানো, বললে না?'

'ওই তো, জনসাধারণকে দেখানোর জন্যে এই প্রথমবার ওটা খুলে

দিয়েছেন মিস্টার গরডন। মানুষের সামনে বেরোনোই তিনি পছন্দ করেন না, বাড়ির দরজা অন্যের জন্যে খুলে দেয়া তো দূরের কথা। দিয়েছেন ঠেকায় পড়ে। জমানো টাকাপয়সা শেষ। আয়-উপার্জন নেই, কোন কাজকর্ম নেই, খাবেন কি? সে জন্যে মিউজিয়ামটাই খুলে দিয়েছেন। যদি কিছু পয়সা আসে। হনিভিলে তাঁর মিউজিয়ামেই দর্শক যায় বেশি।'

'এতই যদি টাকার অভাব, একআধটা ঘড়ি বেচে দিলেই তো পারেন,' মুসা বলল। 'অ্যানটিক মূল্য থাকলে ভাল দাম পাবেন। একটাতেই অভাব অনেক ঘুচে যাবে।'

মাথা নাড়ল রবিন। 'জীবন থাকতে তা তিনি করবেন না। ওগুলো গরডনদের পারিবারিক জিনিস। অনেক হাতবদল হয়ে তাঁর হাতে পড়েছে, ওই ঘড়ি বিক্রির কথা কল্পনাই করতে পারেন না মিস্টার গরডন। তার চেয়ে না খেয়ে মরে যাবেন, সে-ও ভাল।'

'এ সব একধরনের গোঁয়ার্তুমি। জীবনের চেয়ে বড় কিছু নেই। না খেয়ে যদি মরেই গেলাম, জিনিসগুলো থেকে কি লাভ? কে দেখবে?'

'তুমি যে এতবড় দার্শনিক, তা তো জানতাম না,' রসিকতা করে বলল রবিন।

'যা-ই বলো, একেবারে ভুল বলেনি কিন্তু মুসা,' কিশোর বলল। 'মরেই যদি গেল, ওসব জিনিস বাড়িতে থাকলেই বা তাঁর কি, না থাকলেই বা কি। তা-ও আবার কোন বংশধর নেই, তিনিই শেষ। কাউকে দিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। যাকগে, একেকজনের একেক রকম চিন্তা-ভাবনা, একেক রকম মানসিকতা···হ্যাঁ, আর কি জানো?'

'আর কিছু না।'

'চলো তাহলে, নিজেরাই জেনে নেব।'

পথের একটা বাঁক ঘুরতেই বাড়িটা চোখে পড়ল ওদের। নামের সঙ্গে ফোর্ট শব্দটা জুড়ে দিয়ে ভালই করেছে। দুর্গের মতই বাড়ি। পাথরে তৈরি, অনেক মোটা দেয়াল। চারপাশ ঘিরে রয়েছে পরিখা।

'বাপরে বাপ, জবরজং অবস্থা!' প্যাডালে পায়ের চাপ কমিয়ে দিল মুসা। 'এসবের মধ্যে মানুষ বাস করত কি করে?'

'কি করবে,' রবিন বলল। 'চারপাশে ছিল শত্রু। যখন তখন ইনডিয়ানদের আক্রমণের ভয়। ও রকম পরিস্থিতিতে পড়লে তুমিও এর মধ্যে থাকাটাই পছন্দ করতে।'

পরিখা পার হওয়ার একটা ব্রীজ আছে। তোলাও যায়, নামানোও যায়। তুলে ফেললেই দুর্গে যাওয়ার পথ বন্ধ, পরিখা সাঁতরে পার হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এখন নামানোই আছে। ওটার কাছে এসে সাইকেল থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। ঠেলে নিয়ে ঢুকে পড়ল দুর্গের সিংহ-দরজা দিয়ে ভেতরে।

গেটের মুখেই চেয়ার-টেবিল নিয়ে একজন লোক বসে আছে। টিকেট দেয়। তিনটে টিকেট কিনল ওরা। চিতাকে নিয়ে এখানে কোন সমস্যা হলো

না। কুকুর ঢোকা নিষিদ্ধ নয়।

মিউজিয়ামটার নাম দেয়া হয়েছে গরডন হল। খোয়া বিছানো একটা পথ চলে গেছে বাড়ির দরজা পর্যন্ত। চত্বরের যেখানে সেখানে ঘাস জন্মে রয়েছে অযত্নে, অবহেলায়। পরিষ্কার করা জরুরী। বাড়িটারও ভাল রকম মেরামত দরকার। অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে মুসা বলল, 'কই, কোন লোকটোক তো দেখতে পাচ্ছি না?'

'এটা অসময়। এ সময়ে লোকের ভিড় বোধহয় এমনিতেই কম থাকে,' অনুমান করল রবিন। 'ঠিক সময়েই এসেছি আমরা।'

চত্বরে সাইকেল রেখে হলের দরজার দিকে এগোল ওরা।

দেখতে দেখতে মুসা বলল, 'হুঁম্, এখানে কেন চোর আসেনি, বুঝতে পারছি। আমি হলেও আসতাম না। যা জায়গার জায়গা, রাতের বেলা নিশ্চয় এখানে ভূতেদের মেলা বসে!'

তার কথায় কান দিল না অন্য দু-জন।

বাইরে থেকে যত খারাপই লাগুক, বাড়িটার ভেতরের চেহারা, বিশেষ করে হলঘরটা একেবারে অন্যরকম। এককোণে একটা ফায়ারপ্লেস ছিল একসময়, মিউজিয়াম বানানোতেই বোধহয়, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সেটা। যত্ন আর ঘষামাজার ছাপ রয়েছে এখানকার প্রতিটি জিনিসে। কারুকার্য করা পুরানো আমলের ভারি শো-কেসের ভেতর ঝলমল করছে নানা রকম ঘড়ি।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'অনেক দাম হবে একেকটার! কিন্তু পাহারা-টাহারা নেই কেন? চোরেরা নিশ্চয় জানে না, নইলে কবে সাফ করে ফেলত।'

'কে বলল, নেই?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা ভারি কণ্ঠ। 'কড়া পাহারা আছে। আমি নিজে দেখে রাখি।'

'আপনি নিশ্চয় মিস্টার গরডন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক।

হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। ওরা আমার বন্ধু। ও মুসা আমান, ও রবিন মিলফোর্ড।'

মিস্টার গরডনের বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। মাথায় চকচকে টাক, নাকের নিচে পুরু একজোড়া গোঁফ। চেহারাটা যে রকম ভারি, গম্ভীর হয়ে থাকলে ভয়ই পেত মুসা, কিন্তু মোটেও গম্ভীর নন তিনি। বেশ হাসিখুশি। একা একা বাস করলে মানুষ সাধারণত গম্ভীর স্বভাবেরই হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর বেলায় সেটা হয়নি। বরং বেশ হাসিখুশি এবং মিশুক। তিনজনের সঙ্গেই হাত মেলালেন তিনি।

চিতা ভাবল, তাকে অবহেলা করা হচ্ছে, বলে উঠল, 'হউ!'

'ওর নাম চিতা,' পরিচয় করিয়ে দিল মুসা। 'আমাদের কুকুর। খুব ভাল কুকুর।'

পরিচয় করানো হচ্ছে, বুঝে ফেলেছে বুদ্ধিমান কুকুরটা। একটা থাবা

তুলে দিল, হাত মেলানোর জন্যে। এটা শেখানো হয়েছে তাকে, জিনার রাফিয়ানের মত।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে চিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার গরডন। তারপর হেসে ফেললেন, 'বাহ্, খুব মজার কুকুর তো!'

চিতার সঙ্গেও হাত মেলালেন তিনি, কিংবা বলা যায় থাবা মেলালেন।

যাই হোক, ভদ্রলোককে খুব পছন্দ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার।

সরাসরি প্রশ্ন করলে কি মনে করেন, সে জন্যে ঘুরিয়ে বলল কিশোর, 'এত দামী জিনিস, সব নিশ্চয় বীমা করানো আছে?'

'না, নেই। বীমা করালে প্রিমিয়াম যা আসে, সেটা দেয়ারই ক্ষমতা নেই আমার। সে জন্যে নিজেই পাহারা দেই। আমাকে সাহায্য করে আমার চাকর লুই। গেটে যাকে দেখলে। খুব বিশ্বস্ত। অনেককাল ধরে আছে এ বাড়িতে।'

'কিন্তু সেটা কি ঠিক হচ্ছে...' বলতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর, ব্যক্তিগত প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছিল। সম্ভ্রান্ত এ সব মানুষের অহঙ্কার বড় বেশি থাকে। কখন যে কোনটাতে মাইন্ড করে বসবেন কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

'কিসের কথা বলছ?' এড়িয়ে যেতে দিলেন না গরডন।

'ইয়ে...এত এত জিনিস, আর আপনার লোক মোটে দু-জন, সামলানো একটা কঠিন ব্যাপার, তাই না? এদিকে যে সমানে চুরি হচ্ছে, এ খবরও তো নিশ্চয় শুনেছেন। বুঝলাম, আপনাদের দু-জনেরই পাহারা খুব কড়া, কিন্তু সারাক্ষণ তো আর এখানে থাকতে পারছেন না। খাওয়া-গোসল আছে, ঘুম আছে, ও সব সময়ে কি করেন?'

কিশোর ভয় পাচ্ছিল রেগে যাবেন, কিন্তু গরডনকে হাসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'তোমার কথাগুলোয় খুব যুক্তি আছে,' বললেন তিনি। 'আমরা শুধু এখানে থাকি দর্শক আসার সময়টাতে। বাকি সময় এগুলো মানুষের পাহারা ছাড়াই থাকে।'

'কুকুর-টুকুর আছে নিশ্চয়?' জানতে চাইল মুসা।

'না, তা-ও নেই। আসলে চোর ঢোকারই কোন পথ নেই এখানে।' মোটা দেয়াল আর বাইরের পরিখার দিকে ইঙ্গিত করলেন গরডন। 'এই বাড়িটাকে একটা বিরাট আয়রন সেফ বলতে পারো। এমন এক সময় তৈরি করা হয়েছিল এ-বাড়ি, যখন সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হত নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর। এখন তো কেবল চোরের ভয় করি, আমার পূর্বপুরুষদের ছিল প্রাণের ভয়, একটু এদিক ওদিক হলেই যখন-তখন প্রাণ যেতে পারত। সে জন্যেই খুব মোটা করে তৈরি করা হয়েছে দেয়াল, বাইরে থেকে যাতে সহজে ভাঙতে না পারে শত্রুরা। দেয়াল, দরজা, তালা, যেটার কথাই বলো না কেন, ভাঙতে হলে ডিনামাইট লাগবে। এর কমে হবে না। ঘরের দরজা-জানালা সব লাগিয়ে দিলে একেবারে নিরাপদ আমরা, আর কোন ভয় নেই। আরামসে নাক ডাকাতে পারি।'

'কিন্তু শুনলাম,' রবিন বলল, 'হনিভিলে যে চোরের দলটা হানা দিচ্ছে,' ওরা নাকি সাঙ্ঘাতিক চালাক। পুলিশ কোন হদিসই করতে পারছে না। ওদের কথা তো নিশ্চয় শুনেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন গরডন, 'শুনেছি। কিন্তু ও সব চোরের ভয় আমি করি না। ওরা ঢুকতে পারবে না এখানে। আর যদি এতটাই চালাক হয়, কোন কৌশলে আমার নিরাপত্তা-ব্যবস্থা ভেদ করে ঢুকে পড়েও, বেরোতে আর হবে না ওদের। আটকা পড়বেই।'

'তার পরেও,' হেসে বলল কিশোর, 'আপনার জায়গায় আমি হলে অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। আধুনিক চোরগুলো বড় বেশি চালাক। যন্ত্রপাতিরও অভাব নেই ওদের কাছে। কোনটা ব্যবহার করে যে ঢুকে আবার বেরিয়ে যাবে, টেরই পাবেন না হয়তো।'

কিন্তু কিশোরের এই কথার পরও সামান্যতম উদ্বিগ্ন দেখাল না গরডনকে। বরং হাহ্ হাহ্ হাসতে লাগলেন। 'মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, তোমার কি ধারণা, শুধু মোটা দেয়াল আর পরিখার ওপর নির্ভর করেই বসে আছি আমি? মোটেও না। তোমরা ভাল ছেলে, বুঝতে পারছি; বিশ্বাস করে গোপন কথাটা তোমাদের বললে কোন অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এ ঘরের প্রতিটি দরজা-জানালা, শো-কেসে লাগানো রয়েছে চোরা-ঘণ্টা। কেবল ছুঁয়েই দেখো, কান ঝালাপালা করে দিয়ে বাজতে থাকবে। আমাদের ঘুম না ভাঙিয়ে ঢুকতেই পারবে না কেউ।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। তবে সন্তুষ্ট যে হতে পারেনি তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

'তাহলে বুঝলে তো,' হেসে বললেন তিনি আবার, 'কেন চোরের ভয় আমি পাই না? যাকগে, কথা অনেক হয়েছে; এসো, এখন তোমাদেরকে সব ঘুরিয়ে দেখাই।'

ঘড়িগুলো দেখার চেয়ে ওগুলোর ইতিহাস শুনতেই বেশি আগ্রহী কিশোর আর রবিন। তবে মুসার দেখতেই ভালো লাগছে বেশি। ইতিহাস নিয়ে অত মাথা ঘামায় না।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন গরডন, কোনটার কি ইতিহাস, সংক্ষেপে জানালেন। তন্ময় হয়ে শুনল কিশোর ও রবিন। শুনতে শুনতে অন্য এক জগতে চলে গেল যেন ওরা, একলাফে পিছিয়ে গেল কয়েকশো বছর।

দেখা শেষ করে, মিস্টার গরডনকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

এখনও বেলা অনেক বাকি।

'এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কি করব?' মুসার প্রশ্ন।

'কি করবে তাহলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রবিন।

'এক কাজ করি, চলো, সাগরে নেতে সাঁতার কাটি। এখানকার সৈকতটা খুব সুন্দর।'

রবিনের অমত নেই। কিশোরের মত জানতে চাইল, 'কিশোর, তুমি কি বলো?'

'উঁ!' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। 'নামতে অসুবিধে নেই। কিন্তু আমি ভাবছি ওই ঘড়িগুলোর কথা।'

'দেখে এসেছি, ভাল লেগেছে, ব্যস, হয়ে গেল। অত ভাবাভাবির কি আছে?'

'অতিরিক্ত দামী জিনিস। ভাবনা সেটা নিয়েই। চোরেরা চেষ্টা করবেই।'

'যাঁর জিনিস তিনি যদি ভয় না পান, তোমার কি?'

'না, আমার কিছু না। তবে চোরগুলোকে তাঁর ছোট করে দেখাটা মোটেও উচিত হচ্ছে না।...থাক, চলো, সাঁতার কাটিগে।'

বন্ধুদের সঙ্গে পানির দিকে এগোল সে। কিন্তু মনের খুঁতখুঁতানিটা গেল না কিছুতেই।

চার

সারাদিন পরিশ্রম করে রাতে সুন্দর ঘুম হলো কিশোরের। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল ঝরঝরে শরীর-মন নিয়ে। বিছানা থেকে উঠে জানালায় গিয়ে দেখল বাইরে উজ্জ্বল সোনালি রোদ। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরে নেমে এল নিচে।

নাস্তার টেবিলে বসে কাগজ পড়ছেন রাশেদ পাশা। মেরিচাচী রান্নাঘরে ব্যস্ত।

কিশোরকে দেখেই চাচা বলে উঠলেন, 'সাংঘাতিক চোর তো!'

থমকে গেল কিশোর, 'মানে!'

'এই দেখ,' কাগজটা দেখালেন রাশেদ পাশা, 'বড় করে নিউজ করেছে। হনিভিলে পুরানো বাড়ি আর মিউজিয়ামগুলো নাকি সাফ করে দিচ্ছে চোরেরা। কাল রাতে গরডন ফোর্টে ঢুকে অনেকগুলো দামী সোনার ঘড়ি নিয়ে গেছে।'

লাফ দিয়ে এগোল কিশোর, 'কই, দেখি তো!'

খবরটা পড়া শেষ করে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম...'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা, 'কি সন্দেহ করেছিলি?'

'ঘড়িগুলো যে চুরি হবে।'

'গিয়েছিলি নাকি ওখানে?'

'হ্যাঁ।' আগের দিন যে মিউজিয়ামটা দেখে এসেছে সে কথা চাচাকে জানাল কিশোর।

'চোরা-ঘণ্টা ছিল?' রাশেদ পাশাও কিছু বুঝতে পারছেন না, 'তাহলে বাজল না কেন? আর যদি বেজেই থাকে, মিস্টার গরডন শুনলেন না কেন?'

'তালাই বা খুলল কি করে? যা শক্তর শক্ত! জানালা দিয়ে ঢোকার উপায় নেই, ইস্পাতের শাটার লাগানো। দরজাও খুব শক্ত। মিস্টার গরডন তো বললেন ডিনামাইট ছাড়া ভাঙা যাবে না।'

'চিমনি দিয়ে ঢোকেনি তো?'

'বিশ বছর আগেই ওই পথ বন্ধ করে দিয়েছেন গরডন। বহু বছর ধরে চিমনির নিচে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলে না।'

'কেন, বন্ধ করলেন কেন?'

'নিরাপত্তার কথা ভেবেই।'

'হুঁ। ঘণ্টা বাজল না কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না!'

'সিসটেমটা অকেজো করে দেয়া হয়েছিল হয়তো। তার কেটে কানেকশন নষ্ট করে দিয়েছিল চোরেরা। কিন্তু সেটা তো পরের কথা, কাটতে হলে আগে ঢুকতে হবে। ঢুকল কি করে?'

'পুলিশও সেটা বুঝতে পারছে না।'

সারাটা সকাল রহস্যটা নিয়ে মাথা ঘামাল কিশোর। মুসা আর রবিন এল। তাদের সঙ্গেও আলোচনা করল। কিন্তু কেউ কোন সমাধান দিতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত গরডন ফোর্টে যাওয়াই স্থির করল গোয়েন্দারা। জায়গাটা দেখলে যদি কোন বুদ্ধি বেরোয়, কোন সূত্র চোখে পড়ে, এই আশায়। যদিও তেমন কিছু পাবে বলে মনে হলো না কিশোরের, তবু বলা যায় না...

কিন্তু আরথার গরডনের দেখা ওরা পেল না, ফোর্টেও ঢুকতে পারল না। বাইরে দেখা হলো সাদা পোশাক পরা একজন পুলিশম্যানের সঙ্গে।

কি করে চোরেরা মিউজিয়ামে ঢুকল, জানে না পুলিশ।

আরেকটা খবর জানা গেল, তাতে রহস্যের কোন সমাধান হওয়া দূরে থাক, আরও জমাট বাঁধল। হনিভিলে প্রথম দুটো চুরি হওয়ার পর থেকেই এই এলাকায় রাত-দিন ছদ্মবেশে নজর রেখে চলেছে পুলিশ। কিন্তু চোরের টিকিও ছুঁতে পারেনি, চোখের দেখাও দেখতে পারেনি একবার।

পেরিয়ে গেল তিনটে দিন। হনিভিল-চুরি রহস্য যে অন্ধকারে ছিল, সেখানেই রয়ে গেল। কিছুই করতে পারল না পুলিশ। চোরের কোন সন্ধান করতে পারল না।

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'আমরা একবার তদন্ত করে দেখতে পারি, কি বলো?'

'লাভ হবে না,' মাথা নাড়ল মুসা, 'পুলিশ যেখানে কিছু করতে পারেনি, আমরা কি করব? ওরা তো কম চেষ্টা করছে না।'

'তাছাড়া শুরু করব কোনখান থেকে?' রবিনেরও মুসার মত একই বক্তব্য।

জবাব দিতে পারল না কিশোর। ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কেবল দু-বার। 'কিন্তু তবু একবার হনিভিলে যেতে চাই।'

'যেতে কোন আপত্তি নেই আমার,' মুসা বলল। 'তবে তদন্ত করে যে কোন লাভ হবে না, এটাও বলে দিই। শোনো, অকারণ সময় নষ্ট না করে বরং আরেক কাজ করি চলো। ওখানকার সৈকতটা আমার ভারি পছন্দ।

একটা নৌকা ভাড়া করে সাগরে বেরিয়ে পড়ব। পানিতে কি পরিমাণ টিলা-টক্কর আর পাহাড় আছে দেখেছ? ওগুলোর মধ্যে দিয়ে নৌকা বাইতে খুব ভাল লাগবে।'

'ঠিক বলেছ,' আবার মুসার কথায় সমর্থন দিয়ে, উৎসাহে তুড়ি বাজাল রবিন। 'খুব ভাল প্রস্তাব। যা গরম পড়েছে, নৌকায় বেড়ানোর এটাই সময়।'

'যা গরম পড়েছে,' রবিনের কথার প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর, 'ঝড় ওঠারও এটাই সময়! কিন্তু, তবু আমার আপত্তি নেই। চলো, যাই।'

নৌকায় করে বেড়ানোর অতটা শখ নেই কিশোরের, সে রাজি হয়েছে হনিভিলে যেতে পারবে বলে। চুরির রহস্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত ছোট্ট ওই গ্রামটাতেই পড়ে থাকবে তার মন।

নৌকা ভাড়া নিতে অসুবিধে হলো না। প্রচুর জেলে আছে ওখানকার জেলে-বস্তিতে। তাদেরই একটা ছেলের কাছ থেকে নৌকাটা ভাড়া নিল তিন গোয়েন্দা। বেশ সুন্দর আর শক্ত নৌকা, প্রায় নতুন। ফলে ভাড়া কিছুটা বেশিই দিতে হলো।

নৌকায় চড়ে বসল তিন গোয়েন্দা আর চিতা। দাঁড় তুলে নিল মুসা। ধীরে ধীরে বাইতে শুরু করল। এগিয়ে চলল কয়েকটা ডুবো পাহাড়ের দিকে। সমস্ত আকাশ পরিচ্ছন্ন, একটুকরো মেঘও নেই কোথাও, কেবল দিগন্তের কাছে কালো কালো দুটো ছায়া। বাতাসটাও ঠাণ্ডা। আনন্দ ও উত্তেজনায় সেটা খেয়ালই করল না ওরা।

সাগরের পরিবর্তন প্রথম লক্ষ করল রবিন। চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো দেখো, ঢেউগুলো যেন কেমন!'

তাই তো! কিশোর আর মুসাও দেখল, কালির মত কালো হয়ে গেছে পানি। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। নৌকার চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে ঢেউ, বাড়ি মারছে নৌকার গায়ে।

'সর্বনাশ!' ভয় পেয়ে গেছে কিশোর, 'ঝড় আসছে মনে হয়!'

চোখের পলকে যেন সারা আকাশে মেঘ ছড়িয়ে পড়ল, আড়ালে চলে গেল সূর্য, উধাও হয়ে গেল ঝলমলে রোদ।

মুহূর্ত পরেই কঠিন কিছুর মত যেন নৌকার গায়ে এসে বাড়ি মারল ঝোড়ো বাতাস।

সাগরকে ভয় পায় না যে মুসা, তার মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে! ঝড় আসছে! এই আবহাওয়ায় এগোনো অসম্ভব...'

কথা শেষ হলো না তার, ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলে উঠল নৌকা।

চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কিশোর, জলদি, তুমিও বাও!'

আরেকটা দাঁড় পড়ে আছে নৌকার পাটাতনে। তাড়াতাড়ি তুলে নিল কিশোর।

ভীষণ দুলছে নৌকা, একবার এদিকে কাত হচ্ছে, একবার ওদিকে। ভয়

হচ্ছে, উল্টেই না যায়। নাকটাকে কোনমতে সোজা রেখে তীরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ আবার চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'হায় হায়, গেল, রবিন পড়ে গেল!'

রবিনের দিকে পেছন করে ছিল কিশোর, সে জন্যে তার পড়ে যাওয়াটা দেখতে পায়নি। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে যেখানটায় বসেছিল সে, সে-জায়গাটা এখন খালি।

সে তাকাতে না তাকাতেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল চিতা। সাঁতরাতে শুরু করল রবিনের দিকে।

দ্রুত দাঁড় বাইতে লাগল মুসা। রবিনের কাছাকাছি হতে চাইছে। কিন্তু যত তাড়াতাড়িই সে করুক, ঢেউ তাকে কাছে যেতে দিচ্ছে না, কেবলই দূরে সরিয়ে নিচ্ছে নৌকাটাকে। ঢেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে রবিন, মাথা একবার ভাসছে, একবার ডুবছে। ভাসলেই ওপর দিকে দু-হাত ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে সে।

চিৎকার করে বলল কিশোর, 'রবিন, ডুবো না, কোনমতে ভেসে থাকো, আমরা আসছি!'

গায়ের জোরে দাঁড় টানছে সে আর মুসা, ঢেউয়ের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, ক্রমেই সরে যাচ্ছে রবিনের কাছ থেকে। আর কোন উপায় না দেখে কিশোরকে শক্ত হাতে দাঁড় ধরে রাখার নির্দেশ দিয়ে ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল মুসা। সাঁতরে চলল রবিনের দিকে।

মুসা দাঁড় ছেড়ে দিতেই ভীষণ ভাবে দুলে উঠল নৌকা। পাক খেয়ে গলুইটা ঘুরে গেল আরেক দিকে। সামলানোর প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারল না। একপাশ থেকে ধাক্কা মারছে ঢেউ। বার বার কাত করে দিচ্ছে, উল্টে ফেলার ভয় দেখাচ্ছে যেন।

রবিনেরও অবস্থা ভাল না। মুসার মত ভাল সাঁতারু নয় সে। ঢেউ এসে মাথার ওপর ভেঙে পড়লেই তলিয়ে যাচ্ছে, চলে গেলে আবার ভাসছে। ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা নোনা পানি ঢুকে যাচ্ছে নাকে-মুখে। সাধ্যমত চেষ্টা করেও পানি ঢোকা ঠেকাতে পারছে না। ও জানে, আর বেশিক্ষণ এভাবে ভেসে থাকতে পারবে না। তলিয়ে যাবেই।

চিতাকে এগিয়ে আসতে দেখল এই সময়।

ডুবছে-ভাসছে, ডুবছে-ভাসছে...আর পারছে না রবিন। হাল ছেড়ে দেয়ার আগে দেখতে পেল, চিতা পৌঁছে গেছে তার কাছে। পেছন থেকে তার শার্টের কলারের কাছটা কামড়ে ধরল। এই ঢেউয়ের মধ্যে নিজেকে বাঁচানোই কঠিন, তার ওপর রবিনের ভার, অনেক বেশি হয়ে গেল কুকুরটার জন্যে। তবু কামড় ছাড়ল না, টেনে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করল রবিনকে।

টান লেগে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যেতে শুরু করল শার্টের কাপড়।

কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান কুকুরটা। চট করে ওই জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে আরেক জায়গায় কামড়ে ধরল।

প্রাণপণে সাঁতরে চলেছে মুসা। এর চেয়ে জোরে আর পারে না। চিতাকে দেখতে পেল। বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল, 'চিতা, ছাড়িসনে, ছাড়িসনে, আমি আসছি!'

পৌঁছে গেল মুসা। রবিনের তখন সহ্যের শেষ পর্যায়। ঘোরের মধ্যে যেন পলকের জন্যে চোখে পড়ল মুসার মুখটা, তারপরই জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান হারাতেই ভারি হয়ে গেল তার শরীর।

নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মুসা। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু রবিনকে ছাড়ল না। চিতাকে বলল, 'কামড় ছাড়িসনে! ধরে রাখ!'

নৌকা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে কিশোর। ঢেউ আর স্রোতই তাকে সাহায্য করল রবিনের কাছে নৌকা নিয়ে আসতে। বাতাসের হঠাৎ হঠাৎ দিক পরিবর্তনই বাঁচিয়ে দিল, নইলে শুরুতে যে ভাবে উল্টো দিকে নৌকাটা ঠেলে নিয়ে চলেছিল, তেমন হলে কাছে যাওয়া সম্ভব হত না, বরং বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যেত।

অনেক কষ্টে রবিনের অসাড় দেহটা ওপর দিকে ঠেলে দিল মুসা।

দাঁড় ছেড়ে যে তাকে ধরবে কিশোর, তারও উপায় নেই।

চিতাও সাহায্য করছে। নিচে থেকে যতটা সম্ভব ঠেলে ওপরে তোলার চেষ্টা করছে রবিনকে।

রবিনকে ধরাটা হলো আগের কাজ, তাকে আগে নৌকায় তুলতে হবে। দাঁড় ফেলে দিয়ে তোলার জন্যে যেই কাত হলো কিশোর, অমনি নৌকাও কাত। সে-ও পড়ে গেল পানিতে। পাগলের মত থাবা বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল নৌকার কিনার। পারল না। পিছলে সরে গেল ওটা। মাথা তোলার পর দেখে, নাগালের বাইরে চলে গেছে।

এ সব বিপদের মুহূর্তে মাথা যেন বরফের মত শীতল হয়ে যায় মুসার। সাহস, শক্তি, সবই বেড়ে যায়। ঘাবড়াল না সে। নৌকাটাকে ধরে আনার চেষ্টা করতে গেল না। জানে, পারবে না, বরং রবিনকে হারাতে হবে। জরুরী গলায় কিশোরকে বলল, 'খবরদার, এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়বে না! চিত হয়ে ভেসে থাকো! স্রোতই ঠেলে নিয়ে যাবে!'

মুসার কথামত কাজ করল কিশোর। যে স্রোতটা ওদের নৌকাটাকে এখানে টেনে এনেছে, সেটাতে পড়ে ভেসে রইল ওরা। সাঁতরানোর চেষ্টা আর করল না। করে লাভও নেই। স্রোতই ওদের ভরসা, যেদিকে টেনে নিয়ে যায়, যাবে।

নাকটা বেশ কিছুক্ষণ পানির ওপরে থাকায় ভাল করে দম নেয়ার সুযোগ পেল রবিন। জ্ঞান ফিরল তার। ফলে তাকে এখন ধরে রাখা অনেকটা সহজ হয়ে এল মুসার জন্যে। চিতা তাকে সাহায্য করেই চলেছে। কিশোর নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত, আর কারও কোন সাহায্য করতে পারল না।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। বাজ পড়তে লাগল বিকট শব্দে। তারপর নামল মুষলধারে বৃষ্টি। সাগরের পানির তুলনায় অনেক গরম বৃষ্টির পানি।

সামনে কয়েকটা টিলা দেখা যাচ্ছে। তারও পরে তীর। তবে বেশি দূরে নয়। কিন্তু ঢেউয়ের যা অবস্থা, ওইটুকু দূরত্ব পার হওয়াও কঠিন।

টিলাগুলোর কাছে যাওয়ার আগেই পায়ের নিচে মাটি ঠেকল মুসার। তীরের মাটি নয়, ওটা ডুবো পাহাড়ের চূড়া।

যাই হোক, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে হলেও কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে পারবে। এ মুহূর্তে এইটুকু পাওয়াই অনেক বেশি। আশা হলো তার, এ যাত্রা বেঁচেই গেল।

পাঁচ

সবার আগে তীরে লাফিয়ে উঠল চিতা। যেখানে পা রাখল সে, সেটা মাটি নয়, পাথর। পানি থেকে উঠে গেছে পাথরের একটা পাহাড়। খুদে একটা সৈকতও আছে, তবে তাতে বালির চিহ্নও নেই, কেবল নুড়ি আর পাথর। বালির দরকারও নেই, ডাঙা যে একটা পাওয়া গেছে, পানি থেকে উঠতে পারছে, এতেই খুশি তিন গোয়েন্দা।

পানির কিনারেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর ও রবিন। মুসা বসল হাত-পা ছড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল চিতা।

'কাজই একটা করেছিস তুই, চিতা,' গলা চাপড়ে দিয়ে আদর করল মুসা। 'নাহলে রবিনকে বাঁচাতে পারতাম না।'

রবিনও অনেক আদর করল কুকুরটাকে।

'কিন্তু ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এখানে এভাবে পড়ে থাকলে তো হবে না,' কিশোর বলল। 'ঠাণ্ডা লেগেই মরে যাব।'

'করবটাই বা কি?' নীরস কণ্ঠে বলল মুসা। 'এই পাহাড় ডিঙাতে পারব না! নৌকাটাও তো গেল। আচ্ছা, এই নৌকার ব্যাপারটা নিয়ে কি করা যায়, বলো তো?'

'কি করা যায় মানে?'

'ছেলেটার নৌকা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না?'

'ডুবেই যদি গিয়ে থাকে, তো আর কি করব। নতুন আরেকটা কিনে দিতে হবে যে ভাবেই হোক। সে সব নিয়ে ভাবছি না এখন। আগে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই দরকার। এখানে বসে বৃষ্টিতে ভিজে নিমোনিয়া বাধানোর কোন মানে হয় না। ওঠো, দেখি, কোন জায়গা পাওয়া যায় কিনা।'

'আমি এখন হাঁটতে পারব না,' দু-হাত নেড়ে বলল রবিন। 'গায়ে একবিন্দু জোর নেই।'

'তাহলে তুমি আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো। আমরা ঘুরে দেখে আসি। ঢেউয়ের কাছ থেকে দূরে থাকবে। চিতা, তুই থাক, পাহারা দে।'

পানির ধার থেকে দূরে সরে এল মুসা ও কিশোর। বাঁ পাশ ঘুরে এগোল। কয়েক পা যেতে না যেতেই চোখে পড়ল একটা পাহাড়ের গায়ে একটা কালো গর্ত। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখার পর বুঝল, ওটা গুহামুখ।

মুসা বলল, 'সুড়ঙ্গও থাকতে পারে ভেতরে।'

'ঢুকে দেখা দরকার।'

ভেতরে অনেক বড় একটা গুহা। বাইরের গর্তটা দেখে অতটা মনে হয় না। আরও একটা ব্যাপার অবাক করল ওদের; একধরনের অদ্ভুত সবুজ আলো ভেতরে, আবছাভাবে আলোকিত করে রেখেছে গুহাটাকে।

'খাইছে! আলো আসে কোত্থেকে?'

আলোর উৎসের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাল কিশোর। 'মনে হচ্ছে, কোন ধরনের ফসফরাস লেগে আছে পাথরের গায়ে। সামুদ্রিক আগাছা জন্মেছে কত, দেখেছ? ওগুলোর গা থেকেও আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে। এসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর একটা ঠাঁই পেয়েছি, ব্যস।'

'ওই যে আরেকটা গর্ত। নিশ্চয় সুড়ঙ্গমুখ। চলো, ঢুকে দেখি, বেরোনোর পথ পেয়ে যেতে পারি।'

'রবিনকে ডাকো, সবাই মিলে একসঙ্গেই যাই।'

ডাক শুনে উঠে এল রবিন। এখনও দুর্বল, তবে হাঁটতে পারছে। তার পায়ে পায়ে এল চিতা।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু গুহার ভেতরটা বেশ গরম।

ভেজা কাপড়-চোপড় নিয়ে চলতে কষ্ট হবে। শার্ট খুলে চিপে পানি ঝরিয়ে নিতে লাগল কিশোর।

দেখাদেখি রবিন আর মুসাও তাই করল। চিতার কাপড় নেই, রোম ভিজেছে। ঝাড়া দিয়ে গা থেকে পানি ঝরাতে গিয়ে সবাইকে ভেজাতে লাগল। কিন্তু কেউ কিছু মনে করল না।

শার্ট-প্যান্টের পানি ঝরিয়ে আবার পরে নিল ওরা। চুপচুপে ভেজা কাপড়ের চেয়ে এটা অনেকটা সহনীয়।

গর্তটায় ঢুকে পড়ল ওরা। মুসার অনুমান ঠিক, সুড়ঙ্গই ওটা। পায়ের নিচে ভেজা পাথর, মনে হয় জোয়ারের সময় পানি ঢোকার কোন পথ আছে।

এখানেও সেই অদ্ভুত সবুজ আলো। টর্চ কিংবা অন্য কোন রকম আলো ছাড়া সুড়ঙ্গে ঢোকা যায় না, কিন্তু এখানে সে সবের দরকার হলো না, সবুজ আলোয় পথ দেখে দেখে ভালই এগোনো যায়।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ওরা। বেশ চওড়া সুড়ঙ্গ। শ্বাস টানতে অসুবিধে হচ্ছে না। তারমানে বাতাস চলাচলের পথ আছে।

কিছুদূর এগোনোর পর থমকে দাঁড়াল মুসা। সামনে সমস্যা। দু-ভাগ হয়ে দু-দিকে চলে গেছে সুড়ঙ্গটা। ডানেরটা ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমেছে, বাঁয়েরটা ওপরের দিকে উঠেছে।

'কোনটা দিয়ে যাব?'

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। দুটো পথই দেখল। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'বাঁয়েরটা দিয়েই তো যাওয়া উচিত। রবিন, তোমার কি মনে হয়? পাহাড়-টাহার সম্পর্কে তো তোমার আইডিয়া খুব ভাল...'

'ওপরেই ওঠা উচিত, পথ খোলা থাকলে একসময় না একসময় বেরোতে পারবই। নিচে, পাতালে নেমে কি করব?'

কথাটা ঠিক। সুতরাং বাঁয়েরটা ধরাই স্থির হলো। আগে আগে চলতে বলা হলো চিতাকে। সঙ্গে টর্চ নেই, গুহার ভেতরের অল্প আলোয় অনেক কিছুই ভালমত চোখে পড়ে না। কোথায় কোন বিপদ ওত পেতে আছে কে জানে।

শুরুতে সুড়ঙ্গটা যতখানি চওড়া ছিল, এখন আর ততটা নয়। ছাত অনেক নিচে নেমে এসেছে, মাথা নামিয়ে চলতে হচ্ছে ওদের। দু-পাশের দেয়ালও চেপে আসছে। পাশাপাশি চলা আর সম্ভব হচ্ছে না, এগোতে হচ্ছে একসারিতে। পায়ের নিচে আলগা পাথরের ছড়াছড়ি, অসুবিধেই করছে। সবুজ আলোও কম। এখানে ওখানে নানা রকম ছায়া, ভূতুড়ে মনে হয়।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল কিশোর, কারণ তার সামনে দাঁড়িয়ে গেছে চিতা।

'কি হলো? দাঁড়ালি কেন?'

'ঘাউ!' করে জবাব দিল কুকুরটা। সতর্ক কণ্ঠস্বর।

'সাবধান,' বন্ধুদের বলল কিশোর। 'এগিও না। আগে দেখে নিই, কি দেখে থমকাল চিতা।'

বকের মত গলা বাড়িয়ে দিল মুসা। সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কই, কিছু তো দেখছি না?'

এক পা আগে বাড়ল কিশোর। আরেক পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল। আগে না বেড়ে পা-টা দিয়ে সামনের মেঝেতে কি আছে বোঝার চেষ্টা করল।

কিন্তু পায়ে কিছু ঠেকল না। মাটি নেই নাকি? বুঝে ফেলল হঠাৎ। বন্ধুদের জানাল, 'সামনে গর্ত, বুঝলে। ভাগ্যিস ওকে আগে দিয়েছিলাম। নইলে কোথায় যে পড়তে হত, কে জানে!'

'খাইছে! সামনে যাব কি করে?' মুসা বলল। 'পিছিয়ে গিয়ে অন্য সুড়ঙ্গটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখব নাকি?'

'দাঁড়াও, আগে দেখে নিই। ওটা দিয়ে গিয়েই বা কি করব? পাতালে গেলে কি আর বেরোনোর পথ পাব নাকি? জোয়ারের পানি ঢুকলে তো পড়ব আরও বিপদে, খাঁচায় পড়া ইঁদুরের মত দম আটকে মরতে হবে।'

একেবারে দেয়াল ঘেঁষে এগোনোর চেষ্টা চালাল কিশোর। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে এক-পা পাশে বাড়িয়ে দেখে নিল, কিছু আছে কিনা। মাটি ঠেকল পায়ে। নিশ্চয় গর্তের কিনারা। কতদূর পর্যন্ত মাটি আছে, পা দিয়ে দেখে দেখে আন্দাজ করে নিল। গর্তটা রয়েছে মেঝের মাঝামাঝি। কিনারে মাটি যেটুকু আছে, সেটা ধরে গর্তটা পার হয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভব। তবু কোন ঝুঁকি নিতে চাইল না সে। আগে যেতে বলল চিতাকে। মানুষের চেয়ে

কুকুরের দৃষ্টিশক্তি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ।

গর্তটা গভীর কতখানি না জানলেও কতটা বড়, মোটামুটি অনুমান করা গেল, তবে পেরিয়ে আসার পর। বেশি চওড়া নয়। আলো থাকলে হয়তো লাফ দিয়েই পার হয়ে আসতে পারত। যাই হোক, নিরাপদেই পেরিয়ে এল সবাই। এ ক্ষেত্রেও অনেক সাহায্য করল চিতা।

যতই ওপরে উঠছে, আস্তে আস্তে খাড়া হচ্ছে পথ। ছাত এতটাই নিচে নেমে এল, চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোতে হলো। গোয়েন্দাদের তাতে কষ্ট আর পরিশ্রম দুটোই বেড়ে গেল, তবে চিতার কিছু হলো না, সে আগাগোড়াই চারপায়ে ভর দিয়ে চলতে অভ্যস্ত।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'এসে গেছি! পেয়ে গেছি মুখ!'

পেছনে মুসা আর রবিনের চিৎকারও শোনা গেল। দিনের আলো চোখে পড়েছে ওদেরও।

ঝট করেই যেন চওড়া হয়ে গেল সুড়ঙ্গটা। ছোট একটা গুহায় নিজেদের আবিষ্কার করল গোয়েন্দারা। পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে গুহাটা, প্রাকৃতিক নয়, আপনাআপনি তৈরি হয়নি। এক পাশের একটা ফোকর দিয়ে আলো আসছে।

তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরিয়েই ককিয়ে উঠল কিশোর, 'উফ্, বাবারে, কি কাঁটার কাঁটা! এই, কাঁটা ফোটাতে না চাইলে সাবধানে বেরোও তোমরা!'

চিতা আগেই বেরিয়ে গেছে।

মুসা আর রবিনও বেরোল। সাবধান থাকা সত্ত্বেও ঝোপের কাঁটার খোঁচা থেকে রেহাই পেল না ওরাও, তবে কিশোরের মত অতটা খেতে হলো না।

ঝোপ থেকে বেরোল ওরা। জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে মুসা বলল, 'আহ্, বাইরের বাতাস যে কি মজার!'

'দেখো, ঝড়বৃষ্টিও থেমে গেছে,' রবিন বলল।

'আরে, তাই তো! বৃষ্টির কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম! এই হলো এখানকার সাগরের এক রোগ। যখন-তখন ঝড় ওঠে, আবার সেরে যায়।'

'চিরকাল থাকলেই কি খুশি হতে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'না, তা তো অবশ্যই হতাম না। এক-আধবার বৃষ্টি ভালই লাগে, কিন্তু চিরকাল কে চায়। বৃষ্টির চেয়ে রোদ অনেক অনেক বেশি ভাল।' ঝোপটার দিকে ভাল করে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল সে, 'খাইছে! এই, দেখো, চেনা লাগছে না! এ-তো সেই ঝোপ! এই পাহাড়েই সেদিন পিকনিক করেছিলাম, মনে আছে?'

ঝোপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিস্ময় ফুটল কিশোরের চোখেও। 'আরে, তাই তো! এই ঝোপটাকেই তো নড়তে দেখেছিলে তুমি!'

'খরগোশ বেরোলে তো নড়বেই...' বলল রবিন।

কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিল না কিশোর, 'খরগোশে নড়ায়নি! মুসা ঠিকই বলেছিল, এতবড় ঝোপ খরগোশে নড়াতে পারবে না।'

'তাহলে কিসে নড়াল?'

'মানুষ!'

'মানুষ!' একসঙ্গে তার কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা আর রবিন।

'হ্যাঁ!' উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে কিশোরের গাল। 'নিশ্চয় কেউ লুকিয়ে ছিল এই ঝোপের মধ্যে। নিচে গুহায় নেমেছিল, উঠে এসে আমাদের দেখে আর বেরোয়নি। মুসার কথা বিশ্বাস করে তখন যদি দেখতে আসতাম, ঠিক দেখে ফেলতাম লোকটাকে। সুড়ঙ্গটাও আবিষ্কার করে ফেলতাম। আজ ক তো পেয়ে গেছি নেহায়েত কপালগুণে।'

কাকতালীয়,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, অনেকটা সে রকমই। তবে কাকতালীয় মনে হলেও এ রকম ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে, প্রচুর। নইলে ফ্রান্সের সেই বিখ্যাত গুহাটা আবিষ্কৃত হত না, যেটাতে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা ছবি।'

'কিন্তু লোকটা কি করছিল এখানে?' মুসার প্রশ্ন। 'আমাদের দেখে লুকিয়েই বা পড়তে যাবে কেন? কিসের ভয়?'

'কি করছিল, তা বলতে পারব না। তবে লুকিয়ে পড়ার একটাই কারণ, বেআইনী কিছু করছিল। আমরা দেখে ফেললে সন্দেহ করতে পারি, এই ভয়েই বেরোয়নি।'

'আচ্ছা, এই ব্যাটা চোরের দলের কেউ নয় তো? মিউজিয়ামগুলোকে খালি করে দিচ্ছে যারা?'

'ভাল কথা মনে করেছ তো! হ্যাঁ, তা হতে পারে!' একমুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর, নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল। তারপর বলল, 'শোনো, এখানে আবার আসব আমরা। তৈরি হয়ে। পাহাড়ের নিচে কি আছে না আছে, সব দেখব। টর্চের আলোয় ভাল করে দেখব সুড়ঙ্গগুলো।...চলো এখন, বাড়ি যাই।'

ছয়

পরদিন সকালেই একটা ভাল খবর পেল গোয়েন্দারা। যে নৌকাটা ঝড়ে ডুবে গিয়েছে ভেবেছিল, সেটা খুঁজে পেয়েছে কোস্টগার্ড। একটা টিলার খাঁজে অর্ধেক ডুবে আটকে ছিল, তুলে নিয়ে এসেছে। ফিরিয়ে দিয়েছে তার মালিককে।

ছেলেটা কিশোরকে টেলিফোন করেছিল। জানিয়েছে, নৌকাটার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, তবে পাথরে ঘষা লেগে রঙ নষ্ট হয়ে গেছে। কিশোর তাকে চিন্তা না করতে বলে দিয়েছে; বলেছে, ডাঙায় তুলে শুকাতে। তারপর তিন গোয়েন্দা গিয়ে রঙ করে দিয়ে আসবে নৌকাটা। খরচাপাতি যা হবে, সব ওদের। খুশি হয়েছে ছেলেটা।

একটা ভাবনা গেছে কিশোরের। বাইরে চমৎকার রোদ। আবহাওয়া

পরিষ্কার। ঝড়বৃষ্টির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গুহাটায় তল্লাশি চালাতে যেতে কোন অসুবিধে নেই। রবিন আর মুসাকে ফোন করে দিয়েছে। রওনা হয়ে গেছে ওরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

তৈরি হয়েই আছে কিশোর। দুই সহকারী আসতেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চিতা তো অবশ্যই আছে সঙ্গে। গুহার ভেতরে সে একটা বিরাট সাহায্য।

সেই পাহাড়টার কাছে চলে এল ওরা, যেটাতে রয়েছে গুহা থেকে বেরোনোর একটা সুড়ঙ্গমুখ। সাইকেলগুলো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে কাঁটাঝোপটায় এসে ঢুকল ওরা। সাবধানে উঁকি দিল গর্তের ভেতরে।

সঙ্গে করে টর্চ নিয়ে এসেছে। ভেতরে আলো ফেলে দেখল কিশোর। কিছু চোখে পড়ল না। কোন নড়াচড়া নেই। একটা ডাল সরিয়ে সবে নিচে নামতে রাখতে যাবে, এই সময় গরগর করে উঠল চিতা।

ঝট করে গর্তের কাছ থেকে সরে চলে এল সে। তাকাল দুই সহকারীর মুখের দিকে। কি করবে বুঝতে পারছে না।

সবার আগে ঘুরে গেল মুসা। ঝোপ থেকে বেরোনোর জন্যে পা বাড়াল। তার হাত চেপে ধরল রবিন। হেসে ফেলল।

গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা খরগোশ। ভয়ে ভয়ে একবার কুকুরটার দিকে, তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দুই লাফে বেরিয়ে গেল ঝোপ থেকে।

তেড়ে যেতে চাইল চিতা। কলার ধরে ফেলল কিশোর, 'না না, যাবিনে! এমনিতেই যথেষ্ট ভয় পাইয়ে দিয়েছিস বেচারাকে। যা ঢোক, তুই আগে ঢোক।'

টর্চ হাতে নেমে এল কিশোর। তার পেছনে মুসা, সবশেষে রবিন। একসারিতে এগোল।

ওদের দু-জনের কাছেও টর্চ আছে, কিন্তু জ্বালতে মানা করল কিশোর। একটাতেই চলবে, বাকি দুটো রিজার্ভ থাক। প্রয়োজন ছাড়া ব্যাটারি খরচের কোন মানে হয় না।

আগেরবারের চেয়ে এবার তাড়াতাড়ি চলতে পারছে, তার কারণ সঙ্গে আলো আছে; তাছাড়া পথও মোটামুটি চেনা, কোথায় কি বিপদ আছে জানে।

সেই গর্তটার কাছে চলে এল। খুব বেশি বড় না, তবে অনেক গভীর। উঁকি দিয়ে একবার নিচে তাকিয়েই সরে চলে এল মুসা। এমনিতেই কুয়াকে তার ভীষণ ভয়; তার ধারণা, একধরনের ড্রাগনের বাস ওসব জায়গায়, আর এখানকার মত বদ্ধ জায়গা হলে তো কথাই নেই।

একটা ছোট পাথর তুলে নিয়ে আলগোছে গর্তটায় ছেড়ে দিল কিশোর। এক···দুই করে গুণতে লাগল। পাথরটা নিচে পড়তে পড়তে সাত পর্যন্ত গোণা হয়ে গেল তার।

'খাইছে!' শিউরে উঠল মুসা, 'এ তো একেবারে পাতালে চলে গেছে!'

'পড়লে আর বাঁচাবাঁচি ছিল না,' রবিন বলল। 'ভূত হয়ে কুয়া পাহারা

দেয়া লাগত সারাজীবন।'

'এহ্‌হে, ওসব অলক্ষুণে কথা বোলো না তো! কোত্থেকে আবার শুনতে পাবে, নিজেদের দল ভারি করার জন্যে এসে লাগবে আমাদের পেছনে!' জোরে জোরে দোয়া পড়ে সবার গায়ে ফুঁ দিতে লাগল মুসা। মনে মনে বলল, 'যা ভূত যা! যত রকমের ভূত আছিস; মায়ানেকড়ে, রক্তচোষা, ঘাড়ভাঙুড়া, সব যা!'

খুব সাবধানে গর্তের কিনার দিয়ে পার হয়ে এল কিশোর। ঘুরে দাঁড়িয়ে আলো ধরল, পেরিয়ে এল মুসা ও রবিন। চিতা তার আগেই পার হয়ে গেছে।

মূল সুড়ঙ্গটা যেখানে দু-ভাগ হয়ে গেছে সেখানটায় চলে এল ওরা।

ডানের পথটা দেখিয়ে হেসে বলল মুসাকে, 'কি, পাতালে নামবে? না থাকবে এখানে?'

'নাহ্‌, সত্যি কথাটাই বলি ভাই, একা থাকার সাহস আর নেই। ভয় ধরিয়ে দিয়েছে রবিন।'

'তোমার কি ধারণা পাতালে ভূত নেই?'

'তা আবার নেই! ওখানটায় তো ভূতের হেডকোয়ার্টার! কিন্তু মরতেই যদি হয় তিনজন একসঙ্গেই মরি। তাছাড়া বেশি লোক দেখলে ভূতেরা ঘাড় মটকাতে না-ও আসতে পারে।'

'তুমি কি আগে থাকতে চাও?'

'না বাবা, মাপ চাই, আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব। তোমরাই আগে-পিছে থাকো। ভয় যখন করোই না, আর কি।'

সুতরাং আগের মতই চিতাকে সামনে এগোতে বলে তার পেছনে চলল কিশোর, মুসা মাঝখানে, সবার পেছনে রবিন।

চলতে চলতে মুসা বলল, 'আমার বিশ্বাস, এ পথ কোথাও না কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছেই। কারণ পাতালের ভেতর দিয়ে বেরোনোর কোন পথ থাকতে পারে না। অবশ্য পৃথিবীর আরেক পিঠ ফুঁড়ে যদি বেরিয়ে যাওয়া যায়, জুলভার্নের গল্পের মত, তাহলে আলাদা কথা। যদি দেখো সামনে পথ বন্ধ, কি করবে?'

'এটা আবার জিজ্ঞেস করা লাগে নাকি?' রবিন বলল, 'পথ না থাকলে ফিরে আসব।'

চুপ হয়ে গেল মুসা। সে ওই সুড়ঙ্গেই ঢুকতে চাইছে না। সে জন্যেই কোন না কোন ছুতোয় যাওয়া বন্ধ করতে চাইছে। এখনকার ভীতু মুসা আমানকে দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না, মাত্র আগের দিন এক চরম দুঃসাহস দেখিয়েছে সে, নিজের জীবনের মায়া না করে ঝড়ে-উন্মত্ত সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে বন্ধুকে উদ্ধার করে আনার জন্যে!

এগিয়ে চলেছে ওরা। টর্চের আলোর ও-ধারে রহস্যময় সব ছায়া, দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয়, ভয়ঙ্কর কোন কিছু ওত পেতে রয়েছে ও-সব জায়গায়। আলো নিভিয়ে দেখেছে কিশোর, ঘুটঘুটে অন্ধকার, অন্য সুড়ঙ্গটার মত সেই আজব সবুজ আলো নেই।

চলেছে তো চলেছেই, মনে হচ্ছে, পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রে ঢুকে যাচ্ছে। পথ আর ফুরায় না। মুসা তো ভয় পাচ্ছেই, রবিন আর কিশোরেরও এখন কেমন কেমন লাগছে। বাতাস অদ্ভুত রকম ভারি, স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস টানতে পারছে না।

ধীরে ধীরে সরে আসছে দু-পাশের দেয়াল। সরু একটা গলিমত হয়ে গেছে। এতটাই সরু, দু-জন পাশ কাটানোই মুশকিল।

তারপর হঠাৎ করে চওড়া হয়ে গেল পথ। নিচু ছাতওয়ালা বিশাল এক গুহায় এসে ঢুকল ওরা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। পরক্ষণেই 'বাবা গো! খেয়ে ফেলল গো!' বলে দিল এক চিৎকার।

'কী! কী হয়েছে!' চেঁচিয়ে জানতে চাইল রবিন এবং কিশোর।

'কে জানি আমার চুলে হাত বুলিয়েছে...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ডানা ঝাপটানোর শব্দ হলো মাথার ওপর। ঝট করে ওপর দিকে টর্চ তুলে ফেলল কিশোর। গুহার ছাতে ঝুলছিল অসংখ্য বাদুড়, ঘাবড়ে গিয়ে উড়তে শুরু করেছে।

'খাইছে রে! সব ভ্যাম্পায়ার...' ঘুরে দৌড় দিতে যাচ্ছিল মুসা।

'তোমার মাথা!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'ভ্যাম্পায়ার না ছাই! অতি সাধারণ বাদুড়। আমাদের ভয়েই অস্থির।'

আলো দেখে একটা বাদুড়ও আর ঝুলন্ত রইল না ছাতে, সব ডানা মেলে দিয়ে ফড়ফড় করে উড়তে লাগল। দল বেঁধে নিচে নেমে এসে বেরিয়ে যেতে শুরু করল সুড়ঙ্গ দিয়ে।

অবাক হয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল চিতা। বদ্ধ জায়গায় বাদুড়ের ডানার ফড়ফড় আর চিৎকার মিলে এক বিচিত্র শব্দের সৃষ্টি করল। সেটাকে আরও ভয়াবহ করে তুলল প্রতিধ্বনি।

কুকুরটাকে চুপ করতে বলে আলো নিভিয়ে দিল কিশোর। আস্তে আস্তে কমে এল ডানা ঝাপটানোর শব্দ। একেবারে থেমে যাওয়ার পর সাবধানে নিচের দিকে করে আবার আলো জ্বালল সে। কিছু কিছু বাদুড় বেরিয়ে গেছে, তবে বেশির ভাগই আবার গিয়ে ঝুলেছে ছাতে। বিরক্ত না করলে সন্ধ্যার আগে বেরোবে না ওগুলো।

প্রায় ফিসফিস করে মুসাকে বলল, 'ভ্যাম্পায়ার যে নয় ওগুলো, বুঝতে পারছ? ভয় গেছে?'

মলিন হাসি হাসল মুসা। মাথা ঝাঁকাল কেবল, কিছু বলল না।

গুহার আরেক প্রান্তে ফোকর দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ। সোজা সেদিকে এগোল কিশোর। গর্তের মধ্যে আলো ফেলে উঁকি দিয়ে দেখল। যা ভেবেছে, তাই। আরেকটা সুড়ঙ্গ।

একমুহূর্ত দ্বিধা করে ঢুকে পড়ল তার ভেতরে।

সাত

বাদুড়ের গুহাটা থেকে বেরিয়ে এসে খুশিই হয়েছে সবাই। একটা শব্দ করা যায় না, অমনি প্রতিধ্বনি, বিকট হয়ে ওঠে শব্দ। আর শব্দ হলেই উড়তে শুরু করে বাদুড়ের দল, ওগুলোর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজও জঘন্য।

এগিয়ে চলেছে ওরা, কিংবা বলা ভাল, নেমে চলেছে। চুপ হয়ে গেছে সবাই। কিশোরও অস্বস্তি বোধ করছে। এ কোথায় চলেছে ওরা?

'কোথায় যাচ্ছি, কিশোর?' না বলে আর পারল না রবিন। 'আর এগোবে, না ফিরব?'

'এতখানি এসে ফিরে যাওয়া কি উচিত? কোন বিপদেও পড়িনি এখনও। সামনে কিছু আছে কিনা বুঝতে পারছি না। তেমন বুঝলে ফিরে যাব।'

আর কিছু বলল না রবিন।

কিছুদূর এগোনোর পর এই সুড়ঙ্গটাও চওড়া হয়ে এল। সামনে আরেকটা গুহা। বাদুড়ের গুহার চেয়ে অনেক বড়। একটা বিস্ময়কর জিনিস দেখতে পেল এখানে। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। পাতালের নদী। দু-ধারে পাথরের পাড়। একজায়গায় একটা পাথরের প্ল্যাটফর্ম-মত হয়ে আছে, তৈরি করেছে একটা প্রাকৃতিক বন্দর।

মৃদু শিস দিয়ে উঠল কিশোর।

'অবাক কাণ্ড!' মুসা বলল, 'এ জিনিস তো কেবল সিনেমায় দেখা যায়!'

'গিয়ে দেখব নাকি কোথায় বেরিয়েছে?'

গুহাটার ছাত অনেক উঁচুতে। বাতাসও বেশ পরিষ্কার, শ্বাস নিতে যে অসুবিধেটা হচ্ছিল এতক্ষণ, সেটা কেটে গেল।

কিশোরের প্রশ্নের জবাবে রবিন বলল, 'কোথায় আর বেরোবে? নিশ্চয় সাগরে গিয়ে পড়েছে।'

'সেটাই তো দেখতে চাই। ধরো, পানিতে নেমে গা ভাসিয়ে দিলাম। স্রোতই আমাদের টেনে নিয়ে যাবে মোহনার কাছে।'

'অত সহজ না হয়ে ভয়ঙ্কর কিছুও ঘটতে পারে,' মুসা বলল। 'নিচে চেপে আসতে পারে গুহার ছাত। হঠাৎ করেই হয়তো দেখব, নাক জাগিয়ে রাখারও জায়গা নেই। স্রোত ঠেলে যে উজানে বেরিয়ে আসব তখন, তারও উপায় থাকবে না। স্রেফ ডুবে মরব।'

মুসার মত *প্রায় উভচরই* যখন নামতে সাহস করছে না, কিশোরও করল না আর। প্ল্যাটফর্মটার দিকে এগিয়ে গেল। ওখানে পৌছে নিচের দিকে তাকিয়েই কুঁচকে গেল ভুরু। হাত নেড়ে সঙ্গীদের ডাকল, 'অ্যাই, দেখে যাও! একটা লোহার আঙটা!'

সবাই দেখল। চিতাও কিছু না বুঝে উঁকি দিল নিচে। পানির ঠিক সমতলে পাথরের গায়ে বসানো রয়েছে আঙটাটা, ঢেউয়ে একবার ডুবছে, একবার

ভাসছে।

'খাইছে!' মুসা বলল, 'একেবারেই তো নতুন মনে হচ্ছে! কে নৌকা বাঁধে এখানে?'

'নৌকা বাঁধে কে বলল তোমাকে?'

'অ্যাঁ! তাই তো! এখানে নৌকা বাঁধতে আসবে কে? কিন্তু লোহার আঙটা তো আর আপনাআপনি তৈরি হতে পারে না. কেউ একজন বসিয়েছে। তারমানে নিয়মিত আসা-যাওয়া করে এখানে।'

'মাঝে মাঝে বুদ্ধি সত্যি খুলে যায় তোমার। আমিও এ কথাই ভাবছি।'

'আর কি মনে হয় তোমার?' প্রশ্ন করল রবিন।

'আর?...এসো, খুঁজে দেখি, আর কিছু পাওয়া যায় কিনা। পেলে হয়তো আন্দাজ করতে পারব।'

আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগল কিশোর। আলোকরশ্মি ঘোরাতে লাগল, ডানে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে। সরে গেল সহকারীদের কাছ থেকে। আচমকা থমকে দাঁড়াল। আলো পড়েছে একটা কাঠের বাক্সের ওপর। পাথরের স্তূপের আড়ালে রয়েছে ওটা।

তার ডাকে দৌড়ে এল মুসা ও রবিন।

'নিশ্চয় ভেতরে কিছু আছে,' বলতে বলতে গিয়ে ডালা ধরে টানল কিশোর।

তালা নেই। সহজেই উঠে এল ডালা। ভেতরে দুটো কাপড়ের থলে, আর একটা অনেক বড় চ্যাপ্টা ব্যাগ।

কৌতূহলে গলা বাড়িয়ে এল তিন গোয়েন্দা। কি আছে থলের ভেতর? খোলা কি উচিত হবে? ভয় পাচ্ছে, যেন খুললেই বেরিয়ে আসবে আলাউদ্দিনের প্রদীপের দৈত্যের মত কোন দৈত্য।

অবশেষে একটা থলের মুখের বাঁধন খুলে ফেলল কিশোর। নিচের দুই কোণ ধরে উপুড় করতেই হড়হড় করে বেরিয়ে এল সোনার মোহর, দামী পাথর, সোনার গহনা, আর পুরানো আমলের মেডেল।

পুরো আধ মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে রইল সবাই। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর বিড়বিড় করল রবিন, 'গুপ্তধন!'

'দেখতে সে রকমই লাগে বটে,' কিশোর বলল।

নিচু হয়ে একটা জিনিস তুলে হাতের তালুতে রেখে দেখতে লাগল। সোনার তৈরি একটা গোলাপ ফুল। নিখুঁত পাপড়ি। খুদে খুদে হীরা বসিয়ে পাপড়ির গায়ে শিশিরকণা বানানো হয়েছে। বিশাল পান্না কেটে কেটে তৈরি হয়েছে পাতাগুলো। দক্ষ শিল্পীর তৈরি।

'দেখি তো?' ফুলটা হাতে নিল রবিন। 'এ তো মনে হচ্ছে সেই বিখ্যাত গোলাপটা!'

'কোন বিখ্যাত?' জানে না মুসা।

'হনিভিলে যে সব জিনিস চুরি হয়েছে, তার মধ্যে বিখ্যাতগুলোর একটা লিস্ট দিয়েছে পেপারে। একটা সোনার গোলাপের কথাও লেখা আছে। আমি

শিওর, এটাই সেটা।'

'তারমানে এগুলো চোরাই মাল বলতে চাচ্ছ?'

'চাচ্ছি না, বলছি।'

'বাবা গো! চোরের হেডকোয়ার্টারে দাঁড়িয়ে আছি আমরা?'

ওদের কথায় তেমন কান নেই কিশোরের। ব্যাগটা খুলছে। সেটা থেকে বেরোল কয়েকটা ছবি। বিখ্যাত চিত্রকরদের মাস্টারপিস একেকটা। এগুলোরও লিস্ট দিয়েছে কাগজে।

'চোরের হেডকোয়ার্টারে যে দাঁড়িয়ে আছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' এতক্ষণে মুসার কথার জবাব দিল কিশোর।

'প্রথমে চিচিং ফাঁক করে দিল ঝড়, তারপর এখানে এসে পেয়ে গেলাম চোরাই ধন...মারছে রে! একেবারে আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের গল্প দেখি!'

দ্বিতীয় থলেটাও খোলা হলো। সেটা থেকে বেরোল কতগুলো সোনার ঘড়ি। আগেও দেখেছে ওগুলো তিন গোয়েন্দা, চেনে। আরথার গরডনের জিনিস।

'আমার বিশ্বাস,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর, 'জায়গাটাকে স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করছে চোরেরা। চুরি করে এনে এখানে জমা করে, তারপর পাচার করে দেয় অন্য কোথাও। ছবিগুলোকে কোনভাবে ক্যামোফ্লাজ করে দেয়। সোনার গহনা, যেগুলোর অ্যানটিক ভ্যালু কম সেগুলোকে গলিয়ে ফেলে।'

'চুরি রহস্যের কিনারা তাহলে আমরা করে ফেললাম,' মুসা বলল। 'হনিভিলে চুরি করার মত বাড়ি আর কমই আছে। বেশিদিন আর থাকবে না এখানে চোরেরা। সমাধানটা করে ফেলতে পেরেছি, এটাই ভাগ্য।'

রবিন বলল, 'ডাকাতের গুহায় ঢুকে বসে আছি। যে কোন সময় এসে পড়তে পারে ওরা। তাহলে ভাগ্য বেশিক্ষণ আর পক্ষে থাকবে না আমাদের। ওরা আসার আগেই পালাতে হবে। পুলিশকে খবর দিয়ে তারপর নিশ্চিন্ত।'

'যাব,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে তার আগে থলের মুখগুলো আবার আগের মত করে বেঁধে রেখে যেতে হবে। যাতে চোরেরা বুঝতে না পারে এগুলো খোলা হয়েছে। দেখি, ধরো তো, হাত লাগাও, আবার থলেতে ভরে ফেলি।'

দ্রুতহাতে জিনিসগুলো আবার থলেতে ভরতে আরম্ভ করল ওরা। যেটাতে যা ছিল ঠিক সে-ভাবেই রাখল। ভাল করে এদিক থেকে ওদিক থেকে দেখল কিশোর—খোলা যে হয়েছে কিছু বোঝা যায় কিনা। যায় না। সন্তুষ্ট হয়ে ডালা নামিয়ে দিল বাক্সের।

আর কিছু করার নেই এখানে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে গিয়ে এখন পুলিশকে খবর দিতে হবে।

গুহা থেকে বেরোনোর জন্যে ঘুরতে যাবে, এই সময় গরগর করে উঠল চিতা।

আট

কোন সন্দেহ নেই, কেউ আসছে। কুকুরটার ভাবভঙ্গিতেই সেটা স্পষ্ট। তাড়াতাড়ি টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর। নিচু স্বরে নির্দেশ দিল, 'জলদি লুকাও!'

একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে এসে বসে পড়ল ওরা।

চিতার কলার চেপে ধরে আছে মুসা। বলল, 'চুপ! একদম চুপ থাকবি!'

তার কথা বুঝল বুদ্ধিমান জানোয়ারটা। চুপ করেই রইল। কিন্তু কান দুটো সতর্ক। মুখ ফিরিয়ে রেখেছে পাতাল-নদীর ভাটির দিকে। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছে না গোয়েন্দারা। তবু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে রেখেছে, দেখার জন্যে। কান পেতে আছে শব্দ শোনার আশায়।

একটু পরেই শোনা গেল ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ।

'দাঁড়!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'নৌকায় করে আসছে!'

এই অন্ধকার পাতাল-নদীতে কে আসতে যাবে নৌকায় করে? প্রশ্নটা মনে জাগতেই জবাবটাও পেয়ে গেল, আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'ভূত! ভূত ছাড়া আর কিছু না! শুনেছি, পাতালের এ সব নদীতে নাকি ভূতুড়ে নৌকায় চড়ে আসে ভূতেরা...'

'তা আসে,' মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'তবে জ্যান্ত ভূত। চোরেরা আসছে, আমি শিওর। চুপ করে থাকো। কথা বোলো না।'

ভাটির দিকে নদীটা একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে গেছে, আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে উঠছে সেই সুড়ঙ্গমুখটা। ভীষণ অন্ধকারে ক্রমেই উজ্জ্বল হতে লাগল সেই আলো। দাঁড় বাওয়ার শব্দ জোরালো হচ্ছে।

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে গোয়েন্দারা। ভয় যতটা না পাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে উত্তেজিত। কারা আসে, দেখার জন্যে অস্থির।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল নৌকাটা। গলুইতে বাঁধা একটা মোটরগাড়ির হেডলাইট, ব্যাটারিতে চলে। নৌকার ইঞ্জিন নেই, দাঁড় বেয়ে আসছে লোকগুলো। মোট তিনজন ওরা। একজন লম্বা, ঝাঁকড়া চুল। অন্য দু-জন বেঁটে; একজন গাট্টাগোট্টা, আরেকজন রোগাটে—তার আবার পাতলা পাতলা দাড়িও আছে। তিনজনের চেহারাই কুৎসিত। চেহারা খারাপ হলেই যে মানুষও খারাপ হবে, এমন কোন কথা নেই, কিন্তু এদের চেহারা দেখে মনে হতে লাগল কিশোরের, এরা ভাল লোক নয়।

লোকগুলোর ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যায়, জায়গাটা ওদের পরিচিত। যাতায়াত আছে এখানে। ওদের চোখে পড়ে গেলে বিপদ হবে, ভাবছে সে। ওরা যে এই গুহায় ঢুকেছে, বাইরের কেউ জানে না এ খবর। ওরা যদি আর কোনদিনও এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে, কেউ জানবে না ওদের কি হয়েছে। ঝোপের মধ্যে সাইকেলগুলো খুঁজে পাবে অবশ্য পুলিশ, হয়তো আঁচও করবে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে ওরা, কিন্তু ওদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে

কিনা সন্দেহ। এমনও হতে পারে, ধরার পর চোরেরা ওদেরকে রাখলই না এখানে, তখন যে কি হবে···

জোর করে এ সব কথা মন থেকে দূর করে দিল কিশোর। যা ঘটার ঘটবে, এখন আর ভেবে লাভ নেই। দেখাই যাক না, কি হয়?

এগিয়ে আসছে নৌকা। থামল এসে পাথরের প্ল্যাটফর্মটার ধারে। দাঁড় রেখে লাফিয়ে তীরে নামল লম্বা লোকটা। নৌকার দড়ি ধরে টেনে এনে বাঁধল লোহার আঙটাতে।

তার দুই সঙ্গীও বসে নেই। একজন নেমে এসে শক্ত করে ধরে রাখল নৌকাটা, অন্যজন একটা থলে হাতে নিয়ে নেমে এল। ধরার ভঙ্গিতেই বোঝা যায়, বেশ ভারি।

কাজ শেষ করে পাথরের ওপর বসে পড়ল তিনজনে। সিগারেট টানতে টানতে কথা বলতে লাগল।

ওদের প্রতিটি কথা শোনার জন্যে কান পেতে আছে তিন গোয়েন্দা। জানা গেল, লম্বা লোকটার নাম ডারবি, সে দলের নেতা। দুই সহকারীর একজনের নাম জুরাই, অন্যজন, অর্থাৎ দাড়িওয়ালা লোকটার নাম পটার। আরও জানা গেল, হনিভিলে আরও দুটো বাড়িতে ডাকাতি করার পর এই এলাকা ছাড়বে ওরা।

সিগারেট খাওয়া শেষ করে উঠল লোকগুলো। বস্তাটা তুলল। ওটাতে চুরির মাল। আগের রাতে চুরি করেছে। টর্চ জ্বালল ডারবি।

বুক কাঁপছে গোয়েন্দাদের। এদিকে আসবে না তো? তাহলে চোখে পড়ে যাবে, এটা নিশ্চিত। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল তিনজনে। পারলে পাথরের স্তূপের ভেতরে ঢুকে যেতে চায়। রাফির কলার শক্ত করে চেপে ধরল মুসা।

কিন্তু না, এদিকে এল না লোকগুলো। ওদের উল্টোদিকে চলল, যেখানে বাক্সটা আছে। বাক্সের ডালা তুলে থলেটা রাখল তার মধ্যে।

'যাক,' ডারবি বলল, 'অনেক হলো। আর চুরি না করলেও পারি। যা আছে এগুলো ভাগাভাগি করে নিলেই যথেষ্ট।'

'কিন্তু পারলে করব না কেন?' দাড়িওলা পটার বলল, 'একবারই তো করছি। যা পাব সব হাতিয়ে নেব, সারা জীবন পায়ের ওপর পা তুলে খেতে পারব।'

হেসে বলল জুরাই, 'আমার কেবল হাসি পায় পুলিশগুলোকে দেখলে। সাদা কাপড়, এই ছদ্মবেশ, ওই ছদ্মবেশ, কতভাবে যে ঘোরাঘুরি করছে আমাদের ধরার জন্যে। যদি জানত ওদের নাকের ডগাতেই রয়েছে মালগুলো···' কথা শেষ না করেই জোরে জোরে হাসতে লাগল সে।

কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেল গোয়েন্দাদের। মুসা তো পারলে বলেই ফেলে : *অত হেসো না, মিয়ারা, অত হাসি ভাল না! তোমরা তো জানো না, কি ঘটছে! জানলে এই হাসি থাকত না!*

কিশোর ভাবছে, ইস্ আরেকটু আগেই যদি বেরিয়ে যেতে পারত, এতক্ষণে পুলিশকে খবর দেয়া হয়তো হয়ে যেত। তাদের নিয়ে রওনা হয়ে

যেতে পারত এখানে আসার জন্যে। কিন্তু এখন আর সে উপায় নেই। চোরেরা যতক্ষণ না বেরোয় ওরাও বেরোতে পারছে না। ঝামেলা হয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়ে এখন পুলিশকে খবর দিলে, ওদের এসে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করতে হবে চোরগুলোর জন্যে। একবার এসেছে যখন, এখন চলে গেলে আবার কখন আসবে চোরেরা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে মাল যেহেতু আছে এখানে, যখনই আসুক আসতে ওদের হবেই।

কিন্তু প্ল্যানমাফিক কাজ করতে দিল না একটা ইঁদুর। গর্ত থেকে বেরিয়ে খাবারের সন্ধান করতে লাগল ওটা। চলে এল গোয়েন্দাদের দিকে। আর পড়বি তো পড় একেবারে চিতার পায়ে।

ইঁদুরের সাড়া পেয়েছে, গায়ে ছোঁয়া লেগেছে, আর কি চুপ থাকে সে। চুপ থাকতে বলা যে হয়েছে, এ কথাটাও বেমালুম ভুলে গিয়ে বিকট স্বরে ঘেউ ঘেউ করে ধরতে গেল ইঁদুরটাকে।

ভীষণ চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তিন চোর।

চিৎকার করে বলল ডারবি, 'অ্যাই অ্যাই, কুত্তা এল কোত্থেকে!'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দুই সঙ্গী। কিছুই বুঝতে পারছে না।

আবার চেঁচিয়ে উঠল ডারবি, 'দেখছ কি? ধরো ওটাকে!'

কিন্তু ধরা পড়ার জন্যে বসে নেই কুকুরটা। ইঁদুরকে তাড়া করে ঢুকে গেল কিছুক্ষণ আগে যে সুড়ঙ্গটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল গোয়েন্দারা, সেটাতে।

চিৎকার করে, হাত নেড়ে শাসাতে শাসাতে পিছু নিল চোরেরা।

নয়

বোকা হয়ে দেখল তিন কিশোর, একটা বিচিত্র মিছিল চলে যাচ্ছে তাদের সামনে দিয়ে। সবার আগে আগে প্রাণভয়ে ছুটছে বিরাট এক ইঁদুর, পেছনে তেড়ে যাচ্ছে একটা কুকুর, তার পেছনে লম্বা এক লোক, তার পেছনে খাটো মোটাসোটা আরেকজন, এবং সব শেষে রোগাটে দাড়িওলা আরও একজন।

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'বাদুড়ের গুহার দিকে গেল!'

'সর্বনাশ তো করে দিল!' গলা কাঁপছে রবিনের, 'আমরা কি করব এখন!'

ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে কিশোরের মাথায়। বলল, 'লুকিয়ে থেকে আর লাভ নেই। চিতাকে ধরতে পারুক বা না পারুক, এদিকে আর কেউ আছে কিনা খোঁজ করতে আসবেই ওরা।'

'কিন্তু আমরা যে আছি ওরা তো জানে না!' অসহায়ের মত শোনাল রবিনের কণ্ঠস্বর।

'না জানলে কি? ভালমতই বুঝবে, কুত্তা যখন ঢুকেছে, সঙ্গে মানুষও আছে। তাকে খুঁজবেই।'

'কি করব তাহলে?'

‘এসো আমার সঙ্গে,’ স্তূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর।
তার দুই সহকারীও বেরোল।
মুসা বলল, ‘যে পথে এসেছি সে পথে বেরোতে পারব না। ওরা ওদিকেই আছে।’
‘সে জন্যেই তো ওদিকে যাব না। নৌকা নিয়ে এসেছে লোকগুলো, তারমানে সাগরের দিক থেকে এখানে ঢোকার পথ আছে। আমাদের বেরোনোর এখন একমাত্র পথ ওটাই, নদী দিয়ে।’
‘সাঁতরে যাবে?’
‘মোটেও না। আমাদের ধরতে পারলে একবিন্দু দয়া দেখাবে না ওরা। তবে দয়া করে নৌকাটা যেহেতু রেখে গেছে, সুযোগটা নেব না কেন?’
আর কথা বলল না মুসা। আরেকবার মনে মনে কিশোরের বুদ্ধির তারিফ করল। এত সহজ কথাটা তার মাথায় আসেনি!
গলুইয়ের হেডলাইট জ্বলেই আছে। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে বাঁধন খুলতে লেগে গেল কিশোর। মুসা ও রবিনকে তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠে বসতে বলল।
একটাও কথা না বলে উঠে পড়ল রবিন।
মুসা থমকে দাঁড়াল।
‘কি হলো?’ তাগাদা দিল কিশোর, ‘উঠছ না কেন? এটাই একমাত্র উপায়। ওঠো। আমার হয়ে গেছে।’
‘চিতার কথা ভাবছি। ওকে না নিয়ে যাব?’
‘ওকে নেয়ার কথা ভাবলে আর বেরোনো হবে না আমাদের। ওকে ধরতে পারবে না ওরা, কিন্তু এখানে থাকলে আমাদের ধরে ফেলবে। এখনও হয়তো সময় আছে। তাড়াতাড়ি যেতে পারলে ওরা পালানোর আগেই পুলিশ নিয়ে ফিরে আসতে পারব। ওঠো, ওঠো, জলদি।’
আর দ্বিধা করল না মুসা। নৌকায় উঠে দাঁড় তুলে নিল।
বাঁধন খোলা হয়ে গেলেও হাত থেকে দড়ি ছাড়ল না কিশোর। লাফ দিয়ে চড়ে বসল। দুলে উঠল নৌকা। তবে বেশি কাত হলো না। নিখুঁত করে তৈরি, ভারসাম্য খুব ভাল। আঁটঘাট বেঁধেই যে কাজে নেমেছে চোরেরা, এ থেকেই বোঝা যায়।
সবার আগে সুড়ঙ্গ থেকে বেরোল পটার। নৌকা নিয়ে ছেলেরা চলে যাচ্ছে দেখে চিৎকার করে উঠল, ‘ডারবি, জুরাই, জলদি এসো! কুত্তাটা একা নয়! সঙ্গে লোক আছে!’
ছুটে বেরোল অন্য দুই চোর।
পটারের মতই চেঁচিয়ে উঠল জুরাই, ‘ছেলে! কয়েকটা ছেলে!’
দু-হাত মুখের কাছে জড়ো করে চিৎকার করে ডাকল ডারবি, ‘অ্যাই, শোনো তোমরা, ফেরত আসো! নাহলে ভাল হবে না!’
‘না, অনেক ধন্যবাদ,’ নাটকীয় ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা, ‘ফিরে আর আসছি না আমরা। গুহাটা ভাল না।’
‘ভাল চাও তো এসো, নইলে পস্তাবে!’

কিন্তু ডারবির হুমকি কানেই তুলল না তিন গোয়েন্দা। দাঁড় বাওয়ার গতি বাড়িয়ে দিল আরও। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্রোতের টান। রীতিমত ছুটতে শুরু করল নৌকা। দেখতে দেখতে চলে এল সুড়ঙ্গমুখের কাছে।

নদীর তীর ধরে দৌড়ে আসছিল ডারবি, কিন্তু ছেলেরা নাগালের বাইরে চলে গেছে বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে গেল।

সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল নৌকা।

'নিজেদের খুব চালাক মনে করেছিল ব্যাটারা,' দাঁড় বাইতে বাইতে বলল মুসা। 'এখন কেমন হলো? তিন গোয়েন্দাকে তো চেনে না...' শব্দ করে হাসল সে। সুড়ঙ্গে সে-শব্দ প্রতিধ্বনিত হতেই চমকে থেমে গেল।

স্রোতের টান গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে নৌকার। এক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার বলল সে, 'বুদ্ধিটা দারুণ করেছ, কিশোর!'

'বুদ্ধি আর তেমন কি হলো! পালিয়ে এলাম বটে, কিন্তু আসল কাজটাই বাকি,' কিশোরের মুখে হাসি নেই, গম্ভীর হয়ে আছে। 'চোরগুলোকে এখনও ধরতে পারিনি। ওদের গোপন জায়গা ফাঁস হয়ে গেছে, এটা জেনে ফেলেছে ওরা। যত তাড়াতাড়ি পারে এখন মাল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু বাক্সটা আমরা দেখে ফেলেছি, এটা কি করে বুঝবে? কি করেই বা বুঝবে, ওরা যে চোর এটা আমরা জানি? বরং ভাবতে পারে, এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম, সুড়ঙ্গটা দেখে কৌতূহল হয়েছিল, ঢুকে পড়েছি। ওদেরকে চোরটোর কিছুই ভাবিনি।'

'না ভাবলে পালালাম কেন? ভয়ই বা পেলাম কেন? ওরা যে খারাপ লোক সেটাই তো জানার কথা নয় আমাদের।'

তাই তো! এটা তো ভাবেনি! জবাব দিতে পারল না মুসা।

দশ

স্রোতের বেগ বাড়ছে। দাঁড় বাইতে বাইতে বিড়বিড় করে বলল মুসা, 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, এত স্রোত কেন? ঢালু হলেই কেবল এ রকম হওয়ার কথা। কিন্তু পাতালে ঢাল কোথায়?'

'পাতাল হলে ঢালু জায়গা থাকতে পারবে না, এটা তোমাকে কে বলল? একটা ব্যাপার নিশ্চয় লক্ষ করোনি তুমি,' কিশোর বলল, 'শুরুতে নিচের দিকে নামলেও পরে ওপর দিকে উঠেছি আমরা। নদীটা নেমেছে ওপর থেকে, ঢাল বেয়েই নেমে যাচ্ছে নিচে, সাগরের দিকে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' কিশোরের কথা সমর্থন করল রবিন। 'উঁচু যে হয়েছে, এটা আমিও খেয়াল করেছি। বাদুড়ের গুহাটা থেকে বেরিয়েই ওপর দিকে উঠেছে পথ। ওপরে উঠার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে যায় মানুষ, নিঃশ্বাস ভারি হয়ে যায়। গুহা থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েই সেটা টের পেয়েছি আমি।'

তর্ক করল না মুসা। জানে, পাহাড় সম্পর্কে কিশোরের অনুমান ভুল হলেও রবিনের হবে না।

'ওই যে, এসে গেছি,' বলে উঠল কিশোর।

মুসা আর রবিনও দেখল, সামনে আলো। হেডলাইটের আলো পড়েছে গুহার দেয়ালে ও সামনের পানিতে। তারও ওপার থেকে আসছে দিনের আলো।

'উফ্, বাঁচলাম,' হাঁপ ছেড়ে বলল মুসা, 'ছুঁচোগিরি থেকে মুক্তি পেলাম! অন্ধকার একদম ভাল্লাগে না আমার।'

অন্য দু-জনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সরু সুড়ঙ্গমুখটা দেখতে পাচ্ছে, গোল মুখের নিচের অর্ধেকটায় পানি, ওপরের অংশটা ফাঁকা, দূর থেকে আধখানা চাঁদের মত লাগছে। পাহাড়ের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নদীটা ওখানে মিশেছে সাগরের সঙ্গে।

জোরে এক ঠেলা দিয়ে যেন সুড়ঙ্গ থেকে ওদেরকে বের করে দিল স্রোত। পুরোপুরি জোয়ার চলছে। বাইরে বেরিয়ে একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল যেন নৌকাটা, তারপর আপনাআপনি ভেসে চলল একদিকে।

পানিতে দাঁড় দিয়ে জোরে জোরে দু-বার খোঁচা মারল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, কোথায় যাব?'

চারদিকে তাকাতে লাগল কিশোর।

'ওই তো পাহাড়টা,' হাত তুলে দেখাল সে। 'আর ওই যে ঝোপটা, যেটা দিয়ে আমরা ঢুকেছি। ঠিক জায়গাতেই এলাম। আমি তো ভাবছিলাম, কোনদিক না কোনদিক দিয়ে বেরোয়, চিনে ফিরব কি করে··· যাক, একটা বড় চিন্তা গেল। এখন দুটো কাজ আমাদের। এক, পুলিশকে খবর দেয়া; দুই, চোরগুলোর ওপর নজর রাখা। বেরিয়ে যাবে ওরা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেরোলেই যাতে পিছু নিতে পারি সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা দু-জনে নেমে যাও। রবিন, তুমি সাইকেল নিয়ে চলে যাও থানায়। যত তাড়াতাড়ি পারো পুলিশ নিয়ে এসো। মুসা, তুমি গিয়ে ওই ঝোপটার কাছে পাহারা দাও। চোরগুলোকে বেরোতে দেখলে ওদের পিছু নেবে।'

'আর তুমি?' জানতে চাইল মুসা।

'আমি গুহায় ফিরে যাব। সুড়ঙ্গের মুখে লুকিয়ে থেকে হোক, গুহার ভেতরে ঢুকে হোক, যে ভাবেই পারি নজর রাখব ব্যাটাদের ওপর।'

'সুড়ঙ্গের মুখে নজর রেখে কি লাভ?' রবিনের প্রশ্ন। 'নৌকাটা তো নিয়েই এসেছি আমরা। আসবে কি করে ওরা?'

'যদি সাঁতরে বেরোয়?'

কিশোরের পরিকল্পনায় কোন ফাঁক দেখতে পেল না রবিন। চুপ হয়ে গেল।

'মুসা, জলদি করো,' তাড়া দিল কিশোর। 'পাহাড়টার গোড়ায় নৌকা ভেড়াও। নেমে যাও তোমরা।'

'জোয়ারের সময় এখন ভেড়াতে পারব কিনা কে জানে। পানি কেমন

ফুলেছে দেখেছ!'

তবে যতটা আশঙ্কা করেছে মুসা, ভেড়াতে তার অর্ধেকও কষ্ট হলো না। খুদে একটা বালির সৈকত পেয়ে গেল পাহাড়ের গোড়ায়। ওখানে নৌকা ভিড়িয়ে নেমে পড়ল সে আর রবিন।

সাগরের এদিকটায় বেশ খাড়া হয়ে উঠে গেছে পাহাড়। পাথরের ছড়াছড়ি। কপালে হাত রেখে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল রবিন। ওপারের রাস্তায় যেতে হলে পাহাড়টা ডিঙিয়ে যেতে হবে। সেটা অসম্ভব নয়। কিশোরকে সাবধানে থাকতে বলে মুসার দিকে ফিরল। 'পেরোতে হবে। পারবে না?'

'পারব না কেন? তুমি না হয় পাহাড়ে একটু বেশিই চড়তে পারো, আমি তো কমও পারি।'

উঠতে শুরু করল দু-জনে।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না কিশোর। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল সুড়ঙ্গমুখের দিকে।

মুখের কাছে পৌঁছে দ্বিধা করল একবার। যাবে কিনা ভাবছে। শেষে যাওয়াই স্থির করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আসার সময় স্রোতের অনুকূলে এসেছিল, এখন প্রতিকূল। তখন ছিল তিনটে দাঁড়, এখন একটা। মুসার মত নৌকা চালানোতেও দক্ষ নয় সে। বুঝতে পারছে, গুহা পর্যন্ত যেতে খুব কষ্ট হবে, তবে অসম্ভব নয়।

উঠে চলেছে রবিন ও মুসা। চার হাত-পাই ব্যবহার করছে। পাথর খামচে ধরে, পাথরে পায়ের ভর রেখে উঠে চলেছে দ্রুত।

শুরুতে সহজই মনে হলো কাজটা। কিন্তু যতই ওপরে উঠতে লাগল, খাড়া হতে লাগল ঢাল, অত সহজ আর রইল না। একটা সময় তো মুসার মনে হলো, এখানেই আটকে থাকতে হবে; না পারবে নিচে নামতে, না পারবে ওপরে উঠতে। তাকে সাহায্য করল রবিন। 'উঠে এসো, উঠে এসো, ও কিছু না, এই তো হয়ে যাচ্ছে!' এ সব বলে বলে সাহস দিতে লাগল।

অবশেষে নিরাপদেই চূড়ায় উঠে এল দু-জনে। মুসার হাতের তালু আর কনুইয়ের ছাল উঠে গিয়ে জ্বালা করছে, একটা নখ ভেঙে রক্ত বেরোচ্ছে। রক্ত মুছতে গিয়ে ব্যথা লাগল, গুঙিয়ে উঠল সে।

রবিনের কিছুই হয়নি।

ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে দু-জনে। কিন্তু জিরানোর সময় নেই। এদিকের ঢাল খাড়া অনেক কম। তাছাড়া ঝোপঝাড় আছে। নামাটা মোটেও কঠিন না।

সাইকেলের কাছে দৌড়ে নেমে চলল রবিন।

সামান্য ঘুরে গিয়ে ঢাল বেয়ে কাঁটাঝোপটার দিকে এগোল মুসা।

ঝোপের কাছেই একটা বড় গাছ আছে। তার গোড়ায় এসে বসে পড়ল। লুকিয়ে থেকে চোখ রাখল ঝোপের দিকে। চোরেরা বেরোলে এখন তার নজর

এড়িয়ে যেতে পারবে না কিছুতেই।

রবিন ওদিকে আরেকটা ঝোপের কাছে পৌঁছে গেছে। সাইকেলটা বের করে তাতে চড়ে বসল। রওনা হলো হনিভিল পুলিশ ফাঁড়ির দিকে। এখান থেকে সবচেয়ে কাছের পুলিশ স্টেশন ওটাই। দ্রুত প্যাডাল ঘুরিয়ে চলল। জোরাল বাতাসে চুল উড়ছে তার।

সাইকেল চালাতে চালাতে ভাবছে সে, 'পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করবে তো? করলেও তাদের নিয়ে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে কে জানে! ততক্ষণে কি পালিয়ে যাবে চোরেরা? গেলে ওদেরকে ঠেকাতে পারবে না কিশোর আর মুসা। রয়েছে তো একা একা। দু-জন একসঙ্গে থাকলেও ওরকম জোয়ান তিনজন মানুষের সঙ্গে পারত না।'

রবিনকে পথের মোড়ে হারিয়ে যেতে দেখল মুসা। আবার ঝোপের দিকে নজর ফেরাল। সে ভাবছে, 'চোরগুলো যদি বেরোয়ই এখান দিয়ে, কি করব? ওদের চোখে পড়া চলবে না কিছুতেই। তাহলে ঠিক এসে চেপে ধরবে। ওরা বেরোলেই পিছু নিতে হবে। কোথায় যায় দেখতে হবে। তারপর ছুটে গিয়ে কিশোরকে জানাতে হবে। কিংবা ফোন করতে হবে থানায়...'

ফাঁড়িতে পৌঁছল রবিন। সামনে ডিউটিরত পুলিশম্যান যাকে দেখল, তার কাছেই গড়গড় করে বলে ফেলল সমস্ত কথা। এমন করে বলল, না বিশ্বাস করে পারল না লোকটা।

'ধরতে হবে ব্যাটাদের!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল পুলিশম্যান। 'কিছুতেই পালাতে দেয়া যাবে না! তবে এখানে লোক নেই। ফোর্স দরকার আমাদের।'

ফাঁড়িতে লোক এখন সে একাই। আরও যারা ছিল, ডিউটিতে বেরিয়েছে। কাছাকাছি থানা আছে কয়েক মাইল দূরে, হনিভিলের পাশের শহরে। সেখানে ফোন করে ফোর্স পাঠাতে বলে রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল। তার সাইকেলটা তুলে নিল গাড়িতে। ছুটল উপকূলের সড়ক ধরে। যাদের কোন হদিসই করতে পারেনি এতদিন পুলিশ, এ রকম একটা দলকে ধরতে পারলে চাকরিতে তার কদর এবং সম্মান অনেক বেড়ে যাবে, এটা বুঝতে পেরে চোরগুলোকে ধরার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

পুলিশের গাড়িটা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। গাছের গোড়া থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে দৌড় দিল পথের দিকে।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল গাড়ি।

কাছে পৌঁছে যে ঝোপের কাছে লুকিয়ে ছিল, সেটা দেখিয়ে বলল মুসা, 'ওটার ভেতর একটা সুড়ঙ্গমুখ আছে। কিন্তু কেউ বেরোয়নি এখনও।'

দূরে সাইরেন শোনা গেল। ছুটে আসছে পুলিশের আরও দুটো গাড়ি।

কাছে এসে ওগুলোও ব্রেক কষল। একপাশের দরজা খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন একজন সার্জেন্ট।

দ্রুত তাঁকে সব কথা জানাল হনিভিল ফাঁড়ির পুলিশম্যান।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন সার্জেন্ট। পুলিশম্যানকে বললেন, 'ব্রাউন, তুমি এখানেই থাকো। চোরগুলোকে বেরোতে দেখলেই বাঁশি বাজাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ব্রাউন।

দুই গোয়েন্দা আর সঙ্গে আসা পুলিশের দু-জনকে নিয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করলেন সার্জেন্ট। উল্টোদিকের ছোট্ট সৈকতটায় নামার ইচ্ছে। তারপর এগিয়ে যাবেন সেই সুড়ঙ্গমুখের কাছে, যেটা দিয়ে বেরিয়ে সাগরে পড়েছে পাতাল-নদী।

মুসার আর নামার ইচ্ছে নেই। নামলে আর উঠতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না তার, সাহস করতে পারছে না। শেষে তাকে ওখানে রেখেই খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে লাগল তিনজন পুলিশ। তাদেরকে পথ দেখাল রবিন।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেকটা সরে গেল ওরা। সুড়ঙ্গমুখটা কোথায় আছে অনুমান করে নিয়ে এগোচ্ছে রবিন।

অনুমান ভুল হলো না তার। ঢালের ওপর থেকেই দেখতে পেল, ভেতর থেকে নদীর পানি হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে সাগরে পড়ছে। পানির ঘূর্ণি আর ফেনা দেখেই চেনা যায় জায়গাটা।

নিচে নেমে এল ওরা। সুড়ঙ্গের একেবারে ছাতে বসে নিচে উঁকি দিল।

কিশোরকে চোখে পড়ল না রবিনের। তারমানে ভেতরেই রয়েছে। মুখের কাছে হাত জড়ো করে এনে চিৎকার করে ডাকল, 'কিশোর! বেরিয়ে এসো! আমরা এসেছি!'

জবাব নেই।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার ডাকল রবিন।

সাড়া পেল না এবারেও।

কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার।

এইবার জবাব এল। সুড়ঙ্গের অনেক ভেতর থেকে।

কয়েক মিনিট পর নৌকা নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর।

বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'চোরগুলো বেরিয়েছে ওদিক দিয়ে?'

'না,' জানাল রবিন।

'এ দিক দিয়েও বেরোয়নি। তারমানে ভেতরেই রয়ে গেছে।'

'তুমি গুহার কাছে যাওনি?'

'না। স্রোতের জ্বালায় পারলাম না। একা যাওয়া সম্ভব না।'

সার্জেন্ট বললেন, 'চলো তাহলে, সবাই মিলেই যাই।'

একজন পুলিশকে সুড়ঙ্গমুখে পাহারায় রেখে, রবিন ও আরেকজন পুলিশ নিয়ে নৌকায় চেপে বসলেন সার্জেন্ট।

এগারো

নীরবে সুড়ঙ্গ ধরে নৌকা বেয়ে চলল ওরা।

বড় গুহাটায় পৌঁছে প্ল্যাটফর্মের লোহার আঙটায় নৌকা বাঁধল কিশোর।

লাফ দিয়ে দিয়ে নামল রবিন ও দুই পুলিশম্যান। কিন্তু চোরগুলোকে দেখা গেল না।

'এদিক দিয়েও বেরোয়নি, ঝোপের মধ্যে দিয়েও বেরোয়নি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'তাহলে কোথায় গেল?'

'যাওয়ার জায়গার কি অভাব আছে নাকি?' রবিন বলল, 'বেরোয়নি যখন, ভেতরেই আছে কোথাও। সুড়ঙ্গে ঢুকে দেখা দরকার।'

বাদুড়ের গুহাটায় চলে এল ওরা। টর্চের আলোয় দেখা গেল ছাতে ঝুলে থাকা প্রাণীগুলোকে। চকচক করছে চোখ। আজ কপালে ওদের বড়ই অশান্তি। বার বার বিরক্ত করা হচ্ছে। আলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ চিৎকার করে উড়াল দিল কয়েকটা বাদুড়। দেখাদেখি বাকিগুলোও যোগ দিল ওদের সঙ্গে। মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকল।

চুপি চুপি এগোতে চেয়েছিল পুলিশেরা, বাদুড়গুলোর জন্যে সেটা আর সম্ভব হলো না। তাড়াতাড়ি ওই গুহা থেকে সরে এল দলটা।

চোরগুলোকে দেখা গেল না কোথাও।

তিন গোয়েন্দার চেনা প্রতিটি গুহা, প্রতিটি সুড়ঙ্গে খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু পাওয়া গেল না চোরগুলোকে; যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

'তোমরা ঠিক দেখেছ?' সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন পুলিশ সার্জেন্ট। 'মজা করোনি তো আমাদের সঙ্গে?'

'কি যে বলেন, মজা করব কেন!'

চোরগুলোর চেহারার বর্ণনা দিল কিশোর, নাম বলল।

রবিন বলল, 'চোরাই মালগুলো নদীর পাড়ের গুহাটায় রেখেছে ওরা। চলুন, দেখাব।'

আবার আগের জায়গায় ফিরে এল দলটা। কিন্তু আরেকবার হতাশ এবং বিস্মিত হতে হলো দুই গোয়েন্দাকে। মালসহ বাক্সটা হাওয়া।

গম্ভীর হয়ে গেছেন সার্জেন্ট।

'বি...বিশ্বাস করুন,' তোতলাতে শুরু করল রবিন, 'মা-মালগুলো এখানেই ছি-ছিল...'

'হু...' নিচের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন সার্জেন্ট। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন জিনিসটা। একটা সোনার ঘড়ি। হাতের তালুতে নিয়ে তাকিয়ে রইলেন দীর্ঘ একমুহূর্ত। দূর হয়ে গেল গম্ভীর ভাবটা। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তোমরা... সমস্ত চোরাই মাল নিয়ে পালিয়েছে ব্যাটারা!'

'কি করে?' বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। 'যে দু-দিক দিয়ে

বেরোনোর পথ আছে, দুটোতেই নজর রেখেছিলাম। যাবে কোন পথে?'

'কিশোর,' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন, 'ঝড়ে নৌকা হারিয়ে আমরা সে দিন যে মুখটা দিয়ে ঢুকলাম, সেটা দিয়ে বেরোয়নি তো?'

'বেরোলেই বা কি? যাবে কি ভাবে? ওদিক দিয়ে পাহাড় ডিঙানো অসম্ভব। জলপথে পালাতে পারে, কিন্তু তার জন্যে নৌকা দরকার। সেটা তো আমাদের দখলে। আমার বিশ্বাস, এই পাহাড়ের নিচেই কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা।'

এই সময় শোনা গেল কুকুরের ডাক।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চোখ-মুখ। চিতার কথা ভুলেই গিয়েছিল। 'চিতা! চিতা!' বলে চিৎকার করে ডাকল সে।

যেন পাহাড় ফুঁড়ে উদয় হলো কুকুরটা। কিশোরের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে হাত চেটে দিতে লাগল।

'চিতা, কোথায় ছিলি তুই?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

জবাবে দু-বার 'খোক! খোক!' করে ডাক ছেড়ে তার হাতও চেটে দিল।

ইঁদুরটাকে তাড়া করায় কুকুরটার ওপর ভীষণ চটে গিয়েছিল কিশোর। ভেবে রেখেছিল, ফিরে এলে আচ্ছামত ধোলাই দেবে। কিন্তু আসার পর ওটার খুশি দেখে আর পেটানোর মন থাকল না। মানুষও তো ভুল করে, আর চিতা তো একটা কুকুরই। মাপ করে দিল সে।

মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ছিলি কোথায়?'

কি করে যেন কিশোরের কথা বুঝে গেল কুকুরটা। আরও দু-বার খোক! খোক! করে লেজ নাড়তে নাড়তে রওনা হলো যে দিক থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে দিকে।

'আসুন,' সার্জেন্টকে বলে কুকুরটার পিছু নিল কিশোর। কিছুদূর এগিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'রবিন, দেখো দেখো, আরেকটা সুড়ঙ্গ! এটা তো দেখিনি আমরা!'

আবার আগে বাড়তে গেল কিশোর। কাঁধ চেপে ধরে তাকে থামালেন সার্জেন্ট। 'আমি আগে যাই, তোমরা পেছনে থাকো। চোরগুলোর কাছে পিস্তল থাকতে পারে।'

'মনে হয় না। থাকলে নৌকাটা যখন কেড়ে নিলাম, তখনই গুলি ছুঁড়ত।'

'তবু, আমি আগে যাই।'

চিতাকে অনুসরণ করে একসারিতে এগিয়ে চলল দলটা।

চলছে তো চলছেই, পথ আর ফুরায় না। অধৈর্য হয়ে উঠলেন সার্জেন্ট, 'মাইলখানেক তো চলে এলাম, আর কদ্দূর?'

হঠাৎ মোড় নিল সুড়ঙ্গ। ওপাশে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল চিতা। সামনে মনে হলো পথ বন্ধ। একটা পাথরের ওপর দু-পা তুলে দিয়ে ফিরে তাকিয়ে খোক! খোক! করতে লাগল।

পাথরের গায়ে একটা লোহার আঙটা দেখা গেল। এগিয়ে গিয়ে সেটা ধরে টানলেন সার্জেন্ট। নড়ে উঠল পাথরের দরজা। খুলে এল। ওপাশে একটা

সিঁড়ি উঠে গেছে।

লাফ দিয়ে সিঁড়িতে উঠল চিতা। ওপরে উঠতে লাগল। তার পিছু নিল দলটা।

অবাক হয়ে ভাবছে দুই গোয়েন্দা, সিঁড়ির মাথায় কি দেখতে পাবে?

গুনে গুনে উঠছে কিশোর। মোট বিশ ধাপ ওঠার পর সিঁড়ি শেষ হলো।

দাঁড়িয়ে গেলেন সার্জেন্ট। সামনের দিকে তাকিয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'কই, কোন পথ তো দেখছি না! দেয়াল!'

পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'কিন্তু চিতার ভুল হতে পারে না। কড়া ট্রেনিং দিয়েছি আমরা ওকে। একটু সরুবেন, আমি একবার দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা?'

একমুহূর্ত দ্বিধা করে সরে দাঁড়ালেন সার্জেন্ট।

দেয়ালে হাত বোলাতে শুরু করল কিশোর। কোন গোপন সুইচে হাত পড়তেই বোধহয় কিট্ করে একটা শব্দ হলো, খুলে গেল একটা গোপন পাল্লা। ওপাশে আবছা আলো।

সঙ্গে সঙ্গে কিশোরকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সার্জেন্ট বললেন, 'আমি আগে যাই। পেছনে এসো।'

সাবধানে দরজার ওপাশে ঢুকে গেলেন তিনি। তাঁর পেছনে সঙ্গী পুলিশম্যান। তাদের পেছনে এগোল দুই গোয়েন্দা।

বেরিয়ে এল একটা বড় ঘরে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না যেন কিশোর। প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'এ কি! আরথার গরডনের মিউজিয়াম!'

কিন্তু অবিশ্বাস করারও জো নেই। সারি সারি কাঁচের শো-কেস সাজানো। শূন্য। ঘড়িগুলো নেই তাতে।

ফিরে তাকাল কিশোর, গোপন সিঁড়িপথটার দিকে, যে পথে উঠে এসেছে ওরা; বিশাল ফায়ারপ্লেসটার ওপাশে লুকানো। এই পথ খুঁজে বের করল কি করে চোরেরা?

ফিরে গিয়ে আরেকবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল পাল্লাটা। থাবা দিল। কেমন ভোঁতা আওয়াজ বেরোল। বুঝে ফেলল সে ব্যাপারটা। পাথরের পাল্লা নয় ওটা। কাঠের তৈরি, পাথরের মত রঙ করা। এতটাই নিখুঁত, হাত বোলালেও সহজে বোঝা যাবে না। নিশ্চয় অনেক সময় নিয়ে, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আস্তে আস্তে কেটে ওখানকার পাথর সরিয়েছে চোরেরা। আগেই কাঠের পাল্লাটা বানিয়ে রেখেছে। পাথরটা সরিয়ে ওখানে বসিয়ে দিয়েছে নকল দরজা, সুইচ টিপে যেটা খোলা যায়।

চুরি করার সময় এই পথটাই ব্যবহার করেছে চোরেরা। এ দিক দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গেছে সহজেই, মিউজিয়ামগুলোর জিনিসপত্র চুরি করে আবার এ পথেই ফিরে গেছে। এই চলাচলের সময়টায় এলার্ম বেলের তার ডিসকানেক্ট করে দিত, ফলে হলঘরের দরজা খোলার সময়ও বাজত না ওগুলো। আর দরজার তালা খোলাটা তো কোন ব্যাপারই ছিল না ওদের মত

চোরের জন্যে। নিশ্চয় লক এক্সপার্ট ওরা—সবাই না হলেও অন্তত একজন তো বটেই।

দুর্গের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করত বলেই বাইরের কারও চোখে পড়েনি। সন্ধ্যা হলেই দরজায় তালা লাগিয়ে ভেতরে বসে থেকেছেন গরডন আর তাঁর চাকর লুই। এটাতে আরও সুবিধে হয়েছে চোরদের। বাড়ির বাইরে কোন পাহারা না থাকায় নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত ওরা, দুর্গের কারও চোখে পড়ারও ভয় ছিল না। প্রথমেই ঘড়ি চুরি করলে এই পথ ব্যবহার বন্ধ হয়ে যেতে পারত, সে জন্যেই এখানে করা স্থির করেছিল সবার শেষে, যখন পথ বন্ধ হয়ে গেলেও আর কোন ক্ষতি হবে না ওদের। অনেক চিন্তা-ভাবনা, জোগাড়-যন্ত্র করে তবেই কাজে নেমেছে ওরা। পুলিশকে বোকা বানাতে পেরেছে এ কারণেই।

তার অনুমানের কথাটা সার্জেন্টকে বলল কিশোর।

তিনিও একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন।

'রাতে চলাচল করত, সেটা নাহয় মেনে নেয়া গেল, কিন্তু দিনের বেলা এই সাহস করল কি করে!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন সার্জেন্ট, 'কেউ দেখল না? মিস্টার গরডন আর তাঁর চাকরটা কোথায়? নেই নাকি বাড়িতে?'

শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর, 'তাঁদের কিছু করেনি তো?'

'তাই তো! এ কথাটা তো ভাবিনি!' সঙ্গের পুলিশম্যানের দিকে তাকিয়ে বললেন সার্জেন্ট, 'বিল, খোঁজো, খোঁজো!'

নিচতলার সবগুলো ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মিস্টার গরডন বা তাঁর চাকর লুইকে পাওয়া গেল না। ওপরতলায় উঠে গরডনের নাম ধরে ডাকলেন সার্জেন্ট।

গোঙানি শোনা গেল।

শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিল সবাই।

একটা বড় ঘরে এসে ঢুকল। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না।

'মিস্টার গরডন, কোথায় আপনি?' চিৎকার করে আবার ডাকলেন সার্জেন্ট।

একটা বড় ওয়ারড্রোবের ভেতর থেকে গোঙানি শোনা গেল আবার।

দৌড়ে গিয়ে একটানে পাল্লা খুলে ফেলল বিল। ভেতরে দেখা গেল এক বিচিত্র দৃশ্য। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে গরডন আর লুইকে। মুখে কাপড় গোঁজা।

তাড়াতাড়ি দু-জনকে বের করে আনা হলো। গরডনের মুখের কাপড় টেনে খুলে ফেলল কিশোর। 'আপনাকে মারধোর করেছে ওরা, মিস্টার গরডন?' ছুরি বের করল বাঁধন কাটার জন্যে।

'না,' জোরে জোরে দম নিতে লাগলেন গরডন। 'তবে বাধা দিলেই মারত। মিউজিয়ামে ছিলাম আমরা। কোনদিক দিয়ে যে বেরোল, টের পেলাম না। পেছন থেকে এসে জাপটে ধরল আমাকে আর লুইকে। বেঁধে ফেলল। তারপর ওপরে বয়ে নিয়ে এসে ঢুকিয়ে রাখল ওয়ারড্রোবের মধ্যে। সার্জেন্ট,

ওরাই চুরি করেছে আমার ঘড়িগুলো, কোন সন্দেহ নেই আর!'

লুইয়ের বাঁধনও খুলে দেয়া হলো।

'ভাববেন না, মিস্টার গরডন,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল কিশোর, 'ওই ঘড়ি আমরা খুঁজে বের করবই!'

বারো

এই ঘটনার পর দুই দিন পেরিয়ে গেল। কোন খোঁজই নেই আর চোরগুলোর। খবর জানার জন্যে পত্রিকার পাতা ঘাঁটল তিন গোয়েন্দা, বার বার হনিভিলে গেল, মিস্টার গরডনের সঙ্গে দেখা করল, পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করল।

নতুন কিছু জানাতে পারলেন না গরডন। ভীষণ মন খারাপ করে থাকেন। ওই ঘড়িগুলোই ছিল তাঁর শেষ সম্বল।

গরডন ফোর্টে গিয়ে যে সাদা পোশাক পরা পুলিশম্যানের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল সেদিন, তার সঙ্গে দেখা হলো আবার। আগের বারের মত ভাল ব্যবহার আর করল না এবার। তার রাগ, পুলিশ হয়ে সে কিছু করতে পারল না, আর কয়েকটা ছেলে চোরের ঘাঁটি খুঁজে বের করে ফেলল। ওপরঅলার কাছ থেকে ধমক শুনতে হয়েছে এ জন্যে।

ইতিমধ্যে আরও একটা কাজ করেছে তিন গোয়েন্দা। হনিভিলে গিয়ে সেই জেলের ছেলের নৌকাটা রঙ করে দিয়ে এসেছে। ছেলেটার নাম জিম। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ওদের।

তৃতীয় দিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসল ওরা। অবশ্যই হনিভিলের চুরি নিয়ে।

মুসা বলল, 'অহেতুক খোঁজাখুঁজি করছি আমরা। ওরা কি বসে আছে নাকি? ঘাঁটিতে হানা দিয়েছি, চেহারা চিনে ফেলেছি, আর কি থাকে?...আমি বলছি, পালিয়েছে ওরা। হনিভিলের ত্রি-সীমানায় নেই।'

'আমার তা মনে হয় না,' মেনে নিতে পারল না কিশোর। 'ওরা বড় বেশি বেপরোয়া। এত সহজে পালাবে না। দু-চারদিন চুপচাপ থাকবে, ঘাপটি মেরে থাকবে কোথাও, তারপর আবার চুরি শুরু করবে।'

'করলেই কি? কি করে খুঁজে বের করব আমরা? কোথায় আছে ওরা, মালগুলো কোথায় রেখেছে, কিছুই জানি না আমরা। কোথায় খুঁজতে যাব?'

'এক্ষুণি ওদের নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে,' রবিন বলল, 'অপেক্ষা করি আমরা। দেখি, আর চুরি করে কিনা। তারপর অবস্থা বুঝে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই, তাই অপেক্ষা করাই স্থির করল তিন গোয়েন্দা।

তবে বেশিদিন তা করতে হলো না। পরদিনই খবরের কাগজে বেরোল চুরির খবর। হনিভিলের মাইল বিশেক দূরে অ্যাবেভিল নামে আরেকটা গাঁয়ে

এক বাড়িতে হানা দিয়েছে চোর। পুরানো আমলের সোনা-রূপার প্লেট, ছোট ছোট কয়েকটা অমূল্য ভাস্কর্য আর প্রায় পঁচিশ হাজার ডলারের অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

বিকেল বেলা খবরটা দেখেই কিশোরকে ফোন করল রবিন। কিশোরও দেখেছে। মুসাকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে আসতে বলল রবিনকে।

ওরা এল। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখে পুরানো স্যুইভেল চেয়ারটায় বসে টেবিলে পা তুলে দিয়েছে কিশোর। আনমনে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। ওদেরকে দেখে পা নামাল। বলল, 'কি বলেছিলাম? এটা ওই তিন চোরের কাজ।'

'কেন, আর কোন দল থাকতে পারে না?' মুসার প্রশ্ন।

'পারে। তবে ওই এলাকা এখন গরম। নতুন কোন দল এসে ঢোকার সাহস করবে না। ডারবির দলেরই কাজ, আমি শিওর। সেদিন শোনোনি, গুহায় তো ওরা বলেইছে, ওই এলাকার সমস্ত সম্পদ না নিয়ে বিদেয় হবে না।'

'কিন্তু পুলিশের নাকের ডগায় কি করে এ কাজ করছে ওরা সেটাই বুঝতে পারছি না!'

'সাহস বড় বেশি ওদের,' মন্তব্য করল রবিন।

'বুঝলাম সাহস বেশি, কিন্তু লুকিয়ে আছে কোথায়? এখন তো ওদের চেহারার বর্ণনা পেয়ে গেছে পুলিশ। আর এলাকাটা অত বেশি জনবহুলও না যে কারও চোখে পড়বে না। রেডিওতে ঘোষণা করে দেয়ার পরও আছে কি করে? ওখানকার কোন গুহাও তো আর বাকি নেই, গরুখোঁজা করেছে পুলিশ। বনের মধ্যেও গিয়ে খুঁজে এসেছে। কিচ্ছু পেল না। আমার তো বিশ্বাস, জাদু জানে ব্যাটারা!'

'জাদু না কচু!' মুখ বাঁকাল কিশোর।

'মালগুলোকেই বা কি করল ওরা? গরডনদেরকে বেঁধে রেখে যাবার পর বেশি সময় পায়নি। দূরে কোথাও যাবার সুযোগ পায়নি। চট করে তাহলে কোথায় লুকিয়ে ফেলল?' মাথা চুলকাল রবিন। 'তার মানে ধরেই নেয়া যায়, গরডন ফোর্টের কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়েছে।'

'সেই কাছাকাছি জায়গাটা কোথায়?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'একআধটা জিনিস তো আর নয়, বিরাট এক বাক্স। পুলিশ তো কোনখানে খোঁজা বাদ রাখেনি।'

'হয়তো বাদ আছে। এমন কোন জায়গা, যেটার কথা জানা নেই পুলিশের। এলাকাটা তাদের চেয়ে যে অনেক ভাল চেনে চোরেরা, এটা তো বোঝাই গেছে। কার বাড়ির নিচ দিয়ে ঢুকলে গোপন পথ পাওয়া যাবে, সেটাও জানা আছে ওদের। অনেক দিন ধরে ওখানে থেকে থেকে সমস্ত জায়গা চিনেছে আগে ওরা, কিছু কিছু জায়গার সংস্কার করেছে, তারপর কাজে নেমেছে।' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি মনে হয়?'

'ঠিকই বলেছ।' ধীরে ধীরে বলতে থাকল যেন নিজেকেই, 'সে দিন

নৌকায় করে গুহায় ঢুকেছিল ওরা। গুহাটায় ঢোকার জন্যে এর চেয়ে ভাল যান আর হয় না। ওই অঞ্চলে নৌকার আরেকটা সুবিধে—চোখে পড়ার ভয় কম। কারণ জেলেদের বাস, প্রচুর নৌকা চলাচল করে এমনিতেই, চোরের নৌকাটা আলাদা করে চিনে নেয়া কঠিন। গাড়িতে করে চলাফেরা করলে অনেক আগেই পুলিশের চোখে পড়ে যেত। এখন ওদের নৌকাটা নেই, পুলিশ নিয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে লুকানোর জায়গা বের করতে হয়েছে ওদের। অনেক ভেবে দেখলাম, একটাই জায়গা আছে ওদের লুকানোর...'

চুপ হয়ে গেল সে। এক এক করে তাকাল রবিন ও মুসার মুখের দিকে।

'কোথায়?' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা।

'আন্দাজ করো তো?'

'পারছি না। বলে ফেলো।'

'সেই গুহায়, যেটাতে প্রথম লুকিয়েছিল।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা। 'খাইছে! তুমি বলতে চাইছ ওদের সেই পুরানো গুহায়!'

'সেই সম্ভাবনাই কি বেশি নয়?'

আস্তে আস্তে মাথা দোলাল রবিন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। একমাত্র ওই গুহাটাতেই খোঁজার কথা ভাববে না পুলিশ। কারণ একবার তাড়া খেয়ে পালানোর পরও আবার ওখানে গিয়ে ঢুকবে চোরেরা, এটা কল্পনাই করবে না। আর সেই সুযোগটাই নিয়েছে ওরা।'

'তাহলে ভয়ানক দুঃসাহসী বলতে হবে ওদের!' বিড়বিড় করল মুসা।

'তাতে কি কোন সন্দেহ আছে?' কিশোর বলল, 'সেটা অনেক আগেই প্রমাণ করে দিয়েছে ওরা। সাহস যেমন আছে, বুদ্ধিও আছে।' টেবিলে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগল সে। 'আরেকবার গিয়ে দেখার কথা ভাবছি আমি। আজ রাতেই যাব, নৌকায় করে, পাতালের নদীটা দিয়ে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! রাতের বেলা ওই গুহায় আবার? ভূতের কথা না হয় বাদই দিলাম, আবার গিয়ে পড়বে বাঘের মুখে! ধরতে পারলে এবার আমাদের কি করবে ভেবেছ?'

'ভেবেছি,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'গোয়েন্দাগিরিতে ঝুঁকি আছেই। সেই ভয়ে পিছিয়ে এলে রহস্যের তদন্ত করা আর হবে না। তবে যতটা ভয় পাচ্ছ, ততটা পাওয়ার কোন কারণ নেই। পুলিশের ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে থাকতে হয় চোরদের, বেরোতে পারে না। বেরোতে হলে একমাত্র রাতে। আমরাও ঢুকব রাতে। ওদের সামনে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম তখন। চোরাই মালগুলো নিয়ে বেরিয়ে চলে আসব।'

'যত ভাবেই বোঝাও, যাওয়াটা রিস্কি। বড় বেশি রিস্কি। তার চেয়ে আরেক কাজ করি চলো, পুলিশকে জানাই...'

'সময় নেই এখন। পুলিশকে গিয়ে বলব, তারা বিশ্বাস করবে, ফোর্স নিয়ে বেরোবে, এ সব করতে করতে দেখা যাবে অনেক সময় লেগে গেছে। অযথা মূল্যবান সময় নষ্ট করব। তারপর গিয়ে হয়তো দেখব, মালপত্র নিয়ে চোরেরা

হাওয়া। তখন আঙুল চোষা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।' সরাসরি মুসার দিকে তাকাল সে, 'এত ভাবছ কেন? এর চেয়ে বিপজ্জনক কাজ আমরা করেছি, করিনি? তাহলে এত ভয় কেন? আর ভূতের ভয়ে যদি কাবু হয়ে থাকো, তাহলে আর কিছু বলার নেই আমার। কারও বিশ্বাস, সেটা অন্ধই হোক আর যাই হোক, একবার মনে শেকড় গাড়লে ভাঙা বড় কঠিন।'

প্রশ্ন তুলল রবিন, ধরো, গিয়ে ধরা পড়লাম চোরদের হাতে। আটকে ফেলল। বাইরে থেকে সাহায্য দরকার। পাব কি করে? কিছু একটা ব্যবস্থা করে যাওয়া উচিত না?'

'হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা ভাল কথা মনে করেছ ' তর্জনী নাচাল কিশোর। ডুবে গেল ভাবনায়। ঘন ঘন বার দুই চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। বলল, 'এক কাজ করতে পারি, একটা চিঠি লিখে চাপা দিয়ে রেখে যেতে পারি ডাইনিং টেবিলে। আমি ফিরে না এলে চাচা-চাচীর চোখে পড়বেই।'

'আগেই যদি পড়ে?'

'পড়লে পড়বে। বড়জোর পুলিশকে খবর দেবে। তাতে কোন ক্ষতি নেই আমাদের।'

'রাতের বেলা বেরোতে যদি বাধা দেয় বাবা-মা?' মুসার প্রশ্ন।

'এসব অবান্তর প্রশ্ন,' বিরক্ত হলো কিশোর। 'রাতে ঘর থেকে বেরোওই, এটা নতুন কিছু না। আর যদি সামনে পড়েই যাও, বলে দেবে গরম লাগছে, হাওয়া খেতে যাচ্ছ। আর কিছু বলার আছে?'

'নাহ্,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। একবার যখন যাবে বলে গোঁ ধরেছে কিশোর পাশা, যাবেই সে, কোনভাবেই ঠেকানো যাবে না।

'রাতে কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল রবিন।

'খাওয়া-দাওয়ার পর।'

'আচ্ছা, নৌকা নিয়ে যাওয়ার দরকারটা কি?' মুসা বলল, 'তাতে অনেক সময় লাগবে। পাহাড়ও ডিঙাতে হবে। এত কষ্ট না করে সেই ঝোপের ভেতর দিয়ে ঢুকলেও তো পারি। মালগুলো হাতে হাতে তুলে নিয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে বের করে আনব। সাইকেলে যতটা পারি তুলে নিয়ে আসব, বাকিটা লুকিয়ে রেখে আসব কোথাও। পরে আবার গিয়ে নিয়ে আসব। হয় না এটা?'

মাথা দোলাল কিশোর, 'হয়। মন্দ বলোনি। বুদ্ধিটা ভাল।'

খুশি হলো মুসা। যাক, তার একটা কথা অন্তত রেখেছে কিশোর। বলল, 'বড় বড় বাস্কেট লাগিয়ে নেব সাইকেলের সামনে। পেছনে ক্যারিয়ার তো আছেই। তিন-তিনটে সাইকেল। অনেক মাল ধরবে।'

বাইরে থেকে মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর, এই কিশোর, কোথায় তোরা? বেরিয়ে আয়। তোর চাচা ডাকছে।'

'এই রে, সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল কিশোর, 'বোধহয় মাল পেয়ে গেছে! কাল সকালেই আনতে যাবে! তারপর শুরু হবে চাচীর অত্যাচার…নাহ্ যে করেই হোক, আজ রাতের মধ্যেই কেসটার একটা কিনারা করে ফেলতে হবে।'

তেরো

নিরাপদেই বেরিয়ে এল ওরা যার যার বাড়ি থেকে। কোন বাধা এল না। তিনজনে মিলে রওনা হলো হনিভিলে। না না, চারজন, চিতাও রয়েছে সঙ্গে।

এমনিতেই উপকূলের সড়কটায় যানবাহন চলাচল কম। রাত হয়ে যাওয়াতে সেটা আরও কমে গেছে। দ্রুত প্যাডাল করে চলল। চলে এল পাহাড়টার গোড়ায়। সাইকেলগুলো ঝোপে লুকিয়ে, চিতাকে কোন শব্দ না করার কড়া নির্দেশ দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা।

চাঁদ উঠেছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ঘন ঘন আসতে আসতে জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় পথ দেখে চলতে কোনই অসুবিধে হচ্ছে না। ঝোপটাও চিনতে পারল। নিঃশব্দে এগোল ওটার দিকে।

ঝোপে ঢুকে কান পেতে বসে রইল চুপচাপ। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কোন শব্দ কানে এল না দেখে নামার জন্যে তৈরি হলো কিশোর।

রবিন বলল, 'এখানে কি পাহারা দেয়ার দরকার আছে?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'এখানে থেকে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে একসঙ্গে থাকা ভাল। বিপদের সময় লোকবল বেশি হলে কাজে লাগতে পারে। পাহারার দরকার নেই, তবে সাবধান থাকতে হবে। কাউকে আসতে শুনলেই ঘুরে দেব দৌড়। সোজা বেরিয়ে আসব এখান দিয়ে। ঠিক আছে?'

ঘাড় নেড়ে সায় জানাল তার দুই সহকারী।

সুড়ঙ্গগুলোও চেনা হয়ে গেছে। চলতে কোন অসুবিধে হলো না। মূল সুড়ঙ্গটা যেখানে দু-ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে চলে এল, কোন অঘটন ঘটল না।

বাদুড়ের ব্যাপারে সাবধান রইল। গুহাটায় ঢোকার আগে টর্চ নিভিয়ে দিল।

একটা বাদুড়েরও কোন সাড়াশব্দ নেই। কৌতূহল হলো কিশোরের। টর্চ জ্বালল। নেই বাদুড়গুলো! অনেক ওপরে কয়েকটা ছানা কেবল ঝুলে রয়েছে। আলোর দিকে তাকাল জুলজুল করে। আশ্চর্য তো! গেল কোথায়? হঠাৎ মনে পড়ল, এখন রাত। খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে নিশাচর প্রাণীগুলো।

বড় গুহাটার নাম রেখেছে কিশোর 'চোরের গুহা'। সেটার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি দেখে আসি।'

কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল সে। মুখে হাসি।

'কেউ নেই। বাদুড়গুলোর মতই বেরিয়ে গেছে মানুষ-বাদুড়গুলোও।'

'নিশাচর জীব!' বিড়বিড় করল মুসা।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ওদের ফিরে আসার কোন চিহ্ন দেখেছ?'

'দেখেছি। বাক্সটা রেখে দিয়েছে আবার আগের জায়গায়।'

খবর শুনে খুশি যেমন হলো দুই সহকারী-গোয়েন্দা, ভয়ও পেল। মাল যখন ফেলে গেছে, যে কোন সময় এসে হাজির হতে পারে চোরেরা। তাহলে সর্বনাশ! উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে ওদের বুক। এতদিনে বোধহয় সফল হতে চলেছে। আগের বার পেয়েও রাখতে পারেনি, এবার জিনিসগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, আশা আছে।

কিন্তু চারজনের মধ্যে একজন মোটেও খুশি হয়নি, সে চিতা। বার বার নাক তুলে বাতাস শুঁকছে। তার আচরণটা অদ্ভুত, যেন স্বস্তি পাচ্ছে না। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিল না কিশোর। চোরেরা যাতায়াত করে, নিশ্চয় গন্ধ লেগে আছে এখানে ওখানে, বোধহয় সেটাই কুকুরটার অশান্তির কারণ।

চোরের গুহায় ঢুকল ওরা। একই ভাবে বয়ে চলেছে পাতাল-নদী। মুসা আর রবিনও দেখতে পেল বাক্সটা।

'দেরি করে লাভ কি?' রবিন বলল। 'পেয়ে যখন গেছি, চলো নিয়ে চলে যাই। এখানে তো আর কিছু দেখার নেই।'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেও চিতার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল কিশোর। অস্থির হয়ে উঠেছে কুকুরটা। বাতাস শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই সুড়ঙ্গমুখের কাছে, যেটা দিয়ে গরডন ফোর্টে ঢোকা যায়।

'চিতা এমন করছে কেন?' ব্যাপারটা মুসারও নজরে পড়েছে।

'আর কেন করবে,' রবিনও পাত্তা দিল না, 'নিশ্চয় ইঁদুরের গন্ধ পেয়েছে। ওর তো স্বভাবই এটা। আগের বারও এ রকম করেছে, এবারও একটা গোলমাল বাধাবে মনে হয়।' ধমক দিয়ে বলল, 'দেখ্ চিতা, আবার ইঁদুরের পেছনে লাগলে ভাল হবে না। পিটিয়ে হাড্ডি গুঁড়ো করব বলে দিলাম।'

কিন্তু খুঁতখুঁতানি বন্ধ হলো না কুকুরটার। আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠল।

তার দিকে আর নজর না দিয়ে গিয়ে বাক্স খোলায় মন দিল ওরা।

হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে উঠল চিতা।

চমকে গেল গোয়েন্দারা। ফিরে তাকাল।

না, এবার আর ইঁদুরের পেছনে লাগেনি কুকুরটা। ওর অস্থিরতাকে গুরুত্ব দেয়নি বলে আফসোস হতে লাগল কিশোরের। ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'চলো, পালাই!'

কিন্তু এবার আর পালানোর সুযোগ দিল না লোকগুলো। চোখের পলকে ছুটে এসে একজন জাপটে ধরল মুসাকে, আরেকজন কিশোরকে। গা থেকে কোট খুলে সেটা দিয়ে চিতার মুখ-মাথা ঢেকে, তাকে অসহায় করে চেপে ধরল।

সহজে হাল ছাড়ল না মুসা, ধস্তাধস্তি শুরু করল। কিন্তু তাকে চুপ করে থাকতে বলল কিশোর। বুঝে গেছে, এ সব করে কোন লাভ হবে না। লোকগুলোকে রাগিয়ে দিলে বরং ক্ষতি করে বসতে পারে।

দড়ি দিয়ে মুসার হাত-পা বেঁধে ফেলল ডারবি। কিশোরকেও বাঁধা হলো, বাধা দিল না সে। চিতাকে আগেই কাবু করে ফেলা হয়েছে। রবিন যখন দেখল কিছুই করার নেই, আপনাআপনি ধরা দিল।

বাঁধা শেষ করে একটা হ্যাজাক বাতি জ্বেলে দিল জুরাই।

এতক্ষণে হাসি ফুটল ডারবির মুখে। 'ধরা তাহলে পড়লে শেষ পর্যন্ত। একেবারে বিচ্ছু ছেলে! অনেক নাকানি-চুবানি খাইয়েছ আমাদের, তোমাদের বুদ্ধি আর সাহসের তারিফ না করে পারছি না। কিন্তু তোমরা জানতে না আমরা কারা, ছোট করে দেখেছিলে। বিপদে পড়লে সে জন্যেই।'

'এগুলোর সঙ্গে এত ভাল ভাল কথা বলে কি লাভ?' গোঁ গোঁ করে বলল পটার। 'আমার হাতে ছেড়ে দাও, এক এক করে দিই গলা মুচড়ে!'

'দিয়ে বাঁচতে পারবে ভেবেছ?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিশোর, ভয় যে পেয়েছে এ কথা বুঝতে দিতে চায় না লোকগুলোকে। 'আজ হোক কাল হোক, পুলিশ তোমাদের ধরবেই।'

'এহ্, কথা বলে কি ক্যাট-ক্যাট করে! শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়! ডারবি, আর সহ্য করতে পারছি না। রুমাল গুঁজে দিই মুখে?'

মাথা নাড়ল ডারবি। 'কি দরকার? বলুক না যা খুশি। ঘেউ ঘেউই করবে শুধু, কামড়াতে তো আর পারবে না।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল সে।

পটার বলল, 'কিন্তু এটাকে অহেতুক বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ?' চিতাকে দেখাল সে। গলার কলারে দড়ি বেঁধে কুকুরটাকেও আটকে ফেলা হয়েছে।

শঙ্কিত হলো গোয়েন্দারা। সত্যিই মেরে ফেলবে না তো?

মরিয়া হয়ে উঠল মুসা। চোরগুলোকে ভয় দেখানোর জন্যে বলল, 'এ সব করে পার পাবে ভেবেছ? পুলিশ আমাদের খুঁজে বের করবেই। মেসেজ রেখে এসেছি আমরা, হয়তো এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে...'

না বলার জন্যে কয়েকবার করে মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কিশোর।

মুসা দেখল, ইঙ্গিতটা বুঝলও, তবে দেরিতে। ক্ষতি যা করার করে ফেলেছে ততক্ষণে।

এক পা এগিয়ে এল ডারবি। চোখে সন্দেহ। 'কি মেসেজ?'

আসল কথাই বলে ফেলেছে, এখন আর চুপ থাকার মানে হয় না। কিশোর জবাব দিল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, সে কথা লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে এসেছি। এতক্ষণে নিশ্চয় আমার চাচার চোখে পড়ে গেছে। তাহলে পুলিশ নিয়ে রওনা হয়ে যাবে এই গুহায় আসার জন্যে।'

ভীষণ রেগে গেল পটার। বড় অস্থির স্বভাবের সে। ঝট করে রেগে যায়। ছুরি বের করল।

মাথা নেড়ে তাকে নিষেধ করল ডারবি, 'দাঁড়াও, অযথা রক্তারক্তির মধ্যে যেয়ো না। ছেলেগুলো ধাপ্পা দিচ্ছে না যে কি করে বুঝব? তবে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে, এটা সত্যি। ওরা এখন আমাদের কাছে পুলিশের চেয়ে বিপজ্জনক। এখানে যদি ফেলে যাই, না খেয়ে মরবে। আবার যদি পুলিশ এসে উদ্ধার করে, তাদের বলে দেবে আমাদের কথা। পেছনে লাগবে। ফেলে না গিয়ে বরং এক কাজ করি, সরিয়ে ফেলি এখান থেকে। সেটাই ভাল হবে। খুনখারাপির মধ্যে আপাতত যেতে চাই না।'

'তার চেয়ে শেষ করে দিলেই ভাল হত না? ঝামেলা খতম...'

'না, ঝামেলা আরও বাড়বে। মানুষ খুন করলে মরিয়া হয়ে আমাদের পেছনে লাগবে পুলিশ। না ধরে আর ছাড়বে না।'

চোদ্দ

প্রথমে মালগুলো সরিয়ে ফেলল চোরেরা। বাক্স খুলে থলে আর ব্যাগগুলো বের করে নিয়ে গেল পটার আর জুরাই. ছেলেদের পাহারায় রইল ডারবি।

ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল ওদের। এতক্ষণ কি করেছে বুঝতে পারল না গোয়েন্দারা। চিতাকে একটা বস্তায় ভরল দু-জনে। কাঁধে তুলে নিল জুরাই। পা বাঁধা, নড়তে পারল না; মুখ বাঁধা থাকায় ডাকতেও পারল না কুকুরটা, কেবল চাপাস্বরে কোঁ কোঁ করতে লাগল।

বিরক্ত হয়ে বার বার বলতে লাগল পটার, এই ঝামেলা না করলেও হত। শেষ করে দিলেই কোন যন্ত্রণা থাকত না আর। কিন্তু তার কথা কানেও তুলল না ডারবি।

কিশোর ভাবছে, কোন পথে বের করা হবে ওদের? নৌকা নেই, কাজেই পাতাল-নদী দিয়ে নয়; সাগরের দিক থেকে আরেকটা যে মুখ আছে, সেটা দিয়েও সম্ভব না, বাকি রইল আর একটা পথ। ঝোপের ভেতর দিয়ে। নাকি গরডন ফোর্টের ভেতর দিয়ে বের করবে? না, সেটা বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে। বাধ্য না হলে সে দিকে যেতে চাইবে না চোরেরা।

পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে হাঁটতে বলা হলো ওদের।

পালানোর চেষ্টা করে দেখবে নাকি একবার?—ভাবল মুসা। বাতিল করে দিল ভাবনাটা। যে ভাবে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পালানো সম্ভব নয়।

কিশোর দেখল, তার অনুমানই ঠিক। বাদুড়ের গুহা পেরিয়ে, সুড়ঙ্গ পার হয়ে মূল সুড়ঙ্গটায় বেরিয়ে এল ওরা। ঝোপের দিকে যে শাখাটা গেছে তাতে ঢুকতে বলা হলো।

শেষ হলো সুড়ঙ্গ। ঝোপের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। আরও পরিষ্কার হয়েছে চাঁদের আলো।

'এদিক দিয়ে এসো!' চাপা গলায় ডাকল পটার।

গাছপালা আর ঝোপের আড়ালে আড়ালে পাহাড় থেকে নেমে এল দলটা। রাস্তার একধারে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িগুলো নিশ্চয় কোন গ্যারেজে রাখে। এগুলো আনতে গিয়েছিল বলেই ফিরতে দেরি হয়েছিল পটার আর জুরাইর, বুঝতে পারল কিশোর।

একটা গাড়িতে উঠতে বলা হলো তাকে আর মুসাকে।

হেসে ডারবি বলল, 'তোমাদের গাড়িতে যাচ্ছে পটার। আমি থাকছি না। পটার যে কি মেজাজের লোক, সে তো দেখেছই। কাজেই কোন ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা কোরো না।'

চুপচাপ গাড়িতে উঠল কিশোর। তার মনে কি ভাবনা চলছে, কিছুই বুঝতে পারল না চোরেরা। মুসাও উঠল তাদের সঙ্গে উঠল পটার আর জুরাই।

অন্য গাড়িটার পেছনের সীটে তুলে দেয়া হয়েছে চিতাকে। তার সঙ্গে বসল রবিন। ডারবি উঠল ড্রাইভিং সীটে।

কিশোরদের গাড়িটার স্টিয়ারিঙে বসল জুরাই। তার পাশে বসল পটার। পেছনে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল, 'সামনে আছি বলে ভেবো না, তোমাদের ওপর নজর নেই। কিছু করার চেষ্টা কোরো না বলে দিলাম।'

চলতে শুরু করল দুটো গাড়ি।

কিছু করার নেই। কয়েক মাইল চলার পর ঢুলতে শুরু করল মুসা।

বার বার ফিরে তাকাচ্ছে পটার। হেসে বলল কিশোরকে, 'তোমার সঙ্গী তো মারা যাচ্ছে, তোমার কি খবর?'

জবাব দিল না কিশোর। আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

জুরাই বলল, 'তোমাকে বলেছি না পটার, এই ছেলেটা ডেঞ্জারাস। ওর ওপরই কড়া নজর রাখবে।'

হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এসে গেল কিশোরের। পাশে তাকিয়ে দেখল, ঘুমিয়ে পড়েছে মুসা। সীটের ওপর কাত হয়ে থেকে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে।

সে-ও ঢুলতে আরম্ভ করল। একবিন্দু ঘুম নেই তার চোখে, ঘুমানোর ভান করছে শুধু। আস্তে আস্তে সরে গেল জানালার কাছে।

'এটাও মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে,' পটার বলল।

'জায়গায় না যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হব না আমি,' জুরাই বলল। 'নজর সরিয়ো না। ওর কথা কিছু বলা যায় না।'

খুব সাবধানে কাজ শুরু করল কিশোর। পাহাড়ী রাস্তা, প্রচুর মোড়, জায়গায় জায়গায় উঁচুনিচু, ভীষণ দুলুনি। এই দুলুনিকেই কাজে লাগাল সে। মোচড়ামুচড়ি করে, টেনে টেনে হাতের বাঁধন ঢিল করার চেষ্টা চালাল।

অবশেষে মুক্ত করতে পারল একটা হাত। চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করে দেখল পটারের নজর কোনদিকে। সামনে তাকিয়ে আছে সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। বের করে আনল রুমালটা। অনেক সময় নিয়ে করল কাজটা, যাতে কোনভাবেই পটারের চোখে না পড়ে। আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল জানালার দিকে।

সাদা রঙের রুমাল, ভাবছে সে, রাস্তায় সহজেই পুলিশের চোখে পড়বে। এরপর ঘড়িটা ফেলব, তারপর ছুরি, তার পর মানিব্যাগ···

কিছুক্ষণ পর পর রাস্তায় এসব জিনিস পেতে থাকলে সন্দেহ হবেই পুলিশের, বুঝে ফেলবে এটা সূত্র, কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদেরকে, আন্দাজ করে ফেলবে।

জানালার কাছে হাত নিয়ে গেছে কিশোর, রুমালটা সবে ফেলতে যাবে, এই সময় ফিরে তাকাল পটার। খিকখিক করে হেসে বলল, 'খুব চালাক, না? মনে করেছ আমি কিছু টের পাইনি?' ধমকে উঠল, 'সরো, জানালার কাছ

থেকে সরো!'

'বলেছি না,' জুরাই বলল, এটাই সবচেয়ে ডেঞ্জারাস!'

'গাড়িটা রাখো তো।'

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল জুরাই।

চমকে জেগে গেল মুসা। 'কি...কি হলো...'

'কিছু না,' শান্ত করল তাকে কিশোর।

মুহূর্তে আবার ঘুমিয়ে পড়ল মুসা।

কিশোরের পাশের দরজা খুলে পেছনের সীটে উঠে বসল পটার।

আবার চলল গাড়ি।

কিশোরের হাত শক্ত করে বেঁধে দিল পটার, যাতে আর খুলতে না পারে।

শেষ হলো যাত্রা। একটা সাদা রঙের বাড়ির সামনে এসে থামল দুটো গাড়ি। বেরোতে বলা হলো গোয়েন্দাদের।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল ওরা। চাঁদের আলোয় ভালই চোখে পড়ছে সবকিছু। অচেনা জায়গা। এ কোথায় নিয়ে আসা হলো ওদের?

পিঠে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ওদেরকে এনে ঢোকানো হলো একটা ঘরে। একটা হলঘর। সিঁড়ি উঠে গেছে একধার থেকে। দোতলায় উঠে আরেক ধাপ লোহার সিঁড়ি দেখা গেল। প্রথমটার চেয়ে অনেক খাড়া এটা। সেটা বেয়ে উঠতেও বাধ্য করা হলো ওদের। একটা চিলেকোঠায় ওদেরকে ঠেলে দিয়ে হাতের বাঁধন ঢিল করে দিল পটার, যাতে ছেলেরা নিজেরাই খুলে নিতে পারে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জুরাই।

খুব অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে ঘরে। দরজা লাগিয়ে দেয়ার আগে তার সেই জঘন্য হাসি হেসে পটার বলল, 'ইচ্ছে করলে চেঁচিয়ে গলা ফাটানোর প্রতিযোগিতায় নামতে পারো। যত খুশি চেঁচাও এখানে, কেউ শুনবে না তোমাদের চিল্লানি...চলি, গুড বাই! টা-টা!'

রাগে পিত্তি জ্বলে গেল মুসার। আর চুপ থাকতে পারল না সে, 'দাঁড়াও, আমাদেরও সুযোগ আসবে! এক ঘুসিতে তোমার ওই থোঁতা নাকটা ভোঁতা না করে দিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়!'

জবাবে আরেকবার খিকখিক করে হেসে বাইরে থেকে দরজার তালা লাগিয়ে দিল পটার।

চলে গেল লোকগুলো।

কয়েক টানে হাতের বাঁধন খুলে ফেলল মুসা। কিশোর আর রবিনকে মুক্ত হতে সাহায্য করল। তিনজনে মিলে বস্তা থেকে বের করে আনল চিতাকে।

এতক্ষণ বস্তায় থেকে থেকে একেবারে মুষড়ে পড়েছে বেচারা। বেরোনোর পরও কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে এর-ওর মুখের দিকে। তবে ঘোর কাটতে সময় লাগল না। খাউ! খাউ! করে চিৎকার শুরু করল। যেন চোরগুলোকে বলতে চাইছে, বহুত

অত্যাচার করেছ মিয়ারা! দাঁড়াও, ধরে নিই আগে! তারপর দেখাব মজা!

মুক্ত হয়ে আগে ঘরটা দেখল কিশোর। আনমনে মাথা দোলাল, 'হুঁ, বেরোনোর কোন পথ নেই! থাক, এটা নিয়ে এখন মাথা না ঘামালেও চলবে। আগে ঘুম দরকার। কাল সকালে উঠে যা করার করব।'

সেই চিলেকোঠার শক্ত মেঝেতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

স্যালভিজ ইয়ার্ডে কিশোরের চাচা-চাচী তখনও জানেন না কি বিপদের মধ্যে রয়েছে ছেলেগুলো।

প্রচণ্ড মাথা ধরায় রাতের খাওয়ার পর পরই শুতে চলে গেছেন মেরিচাচী।

অনেক রাত পর্যন্ত বোরিস আর রোভারকে নিয়ে কাজ করলেন রাশেদ পাশা। তারপর তিনিও শুতে গেলেন। ডাইনিং টেবিলের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল না কারও।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই কিশোরের কথা মনে পড়ল মেরিচাচীর। সুস্থ হয়ে গেছেন তিনি তখন। মাথাধরা ছেড়েছে। রাতে কখন বাড়ি ফিরেছে ছেলেটা জানার জন্যে তার ঘরের দিকে চললেন।

কিন্তু বিছানা খালি। ওতে কেউ শোয়নি। যেমন করে চাদর পেতে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, তেমনই রয়েছে। সন্দেহ হলো তাঁর। তবু একবার বাথরুম চেক করলেন। নেই। তারমানে রাতে ফেরেনি কিশোর! এমন তো হওয়ার কথা নয়! না ফিরলে বলে যেত।

দৌড়ে নিচে নামলেন তিনি। স্বামীর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বেরোলেন বারান্দায়। কিশোর যে ফেরেনি এ কথা জানালেন।

একটুও চিন্তিত হলেন না রাশেদ পাশা। বললেন, 'মুসা আর রবিনদের বাড়িতে ফোন করে দেখো। রয়ে গেছে হয়তো কারও বাড়িতে।'

কিন্তু কারও বাড়িতেই নেই কিশোর। মুসা আর রবিনও নেই তাদের বাড়িতে। সেই যে সন্ধ্যায় বেরিয়েছে, আর ফেরেনি। ওদের আব্বা-আম্মাও চিন্তায় পড়ে গেছেন।

চিন্তায় মুখ কালো হয়ে গেল মেরিচাচীর। কোথায় যেতে পারে, ভাবছেন। পুলিশকে খবর দেয়ার কথাও চিন্তা করছেন। ভাবতে ভাবতে এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে।

তাঁর চোখেই প্রথম পড়ল চিঠিটা।

পড়ে আবার চিৎকার শুরু করলেন স্বামীর নাম ধরে।

ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলেন রাশেদ পাশা।

চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'হুঁ, এবার তো পুলিশকে খবর দিতেই হয়!'

পনেরো

খুব পরিশ্রম গেছে। তার চেয়ে অনেক বেশি গেছে উত্তেজনা। এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তিন গোয়েন্দা, চিলেকোঠার কাঠের তৈরি কঠিন মেঝেতেই ঘুমিয়েছে মরার মত।

সবার আগে ঘুম ভাঙল মুসার। চোখ মেলে প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না। কোথায় রয়েছে? বিছানাটা এত শক্ত কেন?

ধীরে ধীরে মনে পড়ল সব কথা। পড়তেই লাফিয়ে উঠে বসল। ডেকে, ধাক্কা দিয়ে জাগাল অন্য দু-জনকে।

উঠে বসল কিশোর ও রবিন।

মুসা বলল কিশোরকে, 'সকালে একটা ব্যবস্থা করবে বলেছিলে। কিছু করো।'

কিন্তু করো বললেই তো আর হয় না। অত সহজ নয় ব্যাপারটা।

কিশোর বলল, 'প্রথমে পুরো ঘরটা ভাল করে দেখতে হবে। দুর্বলতা একটা কোথাও নিশ্চয় আছে। সেটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

খুঁজতে শুরু করল তিনজনে।

ছোট্ট ঘর। কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না দেখতে। বেরোনোর দুটো পথ আছে। এক, দরজা দিয়ে; দুই, স্কাইলাইট দিয়ে। দরজায় তালা লাগানো। ওখান দিয়ে বেরোনো যাবে না। স্কাইলাইটটা রয়েছে মাথার ওপরে, একটা ঢালু চালায়।

'নাহ্, হবে না!' নিরাশ হয়ে ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল মুসা।

'আমাদের কি করতে চায় ওরা?' রবিনের প্রশ্ন।

জবাব দিতে পারল না কেউ।

কিশোর বলল, 'বসে পড়লে কেন?'

'কি করব?' ভুরু নাচাল মুসা।

'দেখি, এসো এদিকে। ওখানটায় দাঁড়াও। তোমার কাঁধে ভর দিয়ে স্কাইলাইটের কাছে উঠব।'

বার দুই চেষ্টা করেও পারল না কিশোর। তার ভর ঠিকমত রাখতে পারছে না মুসা। দেয়াল ধরে যদি দাঁড়াতে পারত, তাহলে রাখতে পারত, কিন্তু স্কাইলাইটটা দেয়ালের কাছ থেকে দূরে।

রবিন বলল, 'এক কাজ করো, তোমরা আমার ভার রাখো, আমিই বরং উঠি।'

রবিনের ওজন কিশোরের চেয়ে কম। মুসার কাঁধে চড়ল সে। তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল কিশোর।

স্কাইলাইটের ফোকরের দুই কিনার ধরে, হাতের ওপর ভর রেখে শরীরটা উঁচু করল রবিন। মাথা বের করে দিল। ওখান থেকেই বলল, 'কেউ

নেই। খালি খেতখামার আর গাছপালা দেখতে পাচ্ছি।'

'নেমে এসো,' বলল কিশোর।

আবার মেঝেতে বসে পড়ল মুসা। বলল, 'যা খিদে পেয়েছে না! বেরোতে না হয় না-ই পারলাম, কিছু খাবার পেলেও এখন হত! ওরা না বলল, না খাইয়ে রেখে মারবে না আমাদের, কই, আসছে না কেন?'

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন কান খাড়া করে ফেলল চিতা। কারও সাড়া পেয়েছে। গরগর করে উঠল।

'নিশ্চয় কেউ আসছে!' বলে উঠল মুসা।

চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। উঠে আসছে কেউ। তালায় চাবি ঢোকাল। কিট করে খুলে গেল তালা। পাল্লা সামান্য ফাঁক করে ধরল এক মহিলা। হাতের বেতের ঝুড়িটা সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিয়েই আবার লাগিয়ে দিল পাল্লা। তালা লাগিয়ে দিল। বাইরে থেকে বলল, 'খাবার দিয়ে গেলাম। কাল পর্যন্ত চলবে।'

চলে গেল মহিলা।

চোখের পলকে উদয় হয়ে, হারিয়ে গেল। মনে হলো এই আছে এই নেই। ও যে এসেছিল, তার প্রমাণ খাবারের ঝুড়িটা। এত দ্রুত ঘটে গেল পুরো ঘটনাটা, উঠে গিয়ে যে কিছু করবে, সেই সুযোগও পেল না ছেলেরা।

'বুড়িটা আসবে আগে জানলে দরজার কাছে তৈরি হয়ে থাকতাম,' আফসোস করে বলল মুসা।

'থাকিনি যখন, এখন আর ভেবে লাভ নেই,' কিশোর বলল। 'খাবার পেয়েছি, খেয়ে ফেলা দরকার। পেট ভরলে বুদ্ধিও খুলবে।'

নিচতলায় সদর দরজা লাগানোর শব্দ হলো। রবিন বলল, 'এই, তাড়াতাড়ি আমাকে তোলো! দেখি, বুড়ি কোথায় যায়?'

আবার মুসার কাঁধে চড়ে স্কাইলাইট দিয়ে মুখ বের করে দিল রবিন। দেখতে দেখতে বলল, 'চলে যাচ্ছে···গাঁয়ের দিকে··· একটা রাস্তা চলে গেছে দূরে···'

নেমে এল আবার সে। মাটিতে বসে মাথা চুলকে বলল, 'কি করা যায়, বলো তো? বাড়িটা খালি। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেও কেউ দেখতে আসবে না।'

'কে যায় চেঁচাতে। খাওয়া ফেলে অকাজ···' ঝুড়িটা তুলে নিয়ে এল মুসা। ভেতর থেকে খাবারের প্যাকেট বের করতে লাগল।

দুটো বড় বড় রুটি, কিছু পনির আর টমেটো রয়েছে। আর বড় দুই বোতল পানি। সাধারণ খাবার। কিন্তু এই ক্ষুধার মুহূর্তে ওগুলোই অসাধারণ মনে হলো ওদের কাছে।

গপগপ করে গিলতে শুরু করল মুসা।

অন্য দু-জনও বসে রইল না। তাদেরও খিদে পেয়েছে। চিতাকেও খাবার দেয়া হলো।

খেতে খেতেই কথা চলল। রবিন বলল, 'কিশোর, মেসেজটা নিশ্চয়

এতক্ষণে পেয়ে গেছেন মেরিচাচী। আমাদের খুঁজতে বেরোনোর জন্যে মাথা খারাপ করে দিয়েছেন রাশেদ আংকেলের। তাই না?'

'তা দিয়েছে,' রুটি চিবুতে চিবুতে জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু লাভ কি? পুলিশ সোজা চলে যাবে গুহায়। কিছুই পাবে না আমরা কোথায় আছি, আন্দাজও করতে পারবে না।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল মুসা। খাবার চিবানোর মাঝপথেই হাঁ হয়ে গেল মুখ। এ কথাটা ভাবেনি একবারও। একঢোক পানি দিয়ে মুখের খাবারটা গিলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি করব আমরা?'

'কিছু একটা তো করতেই হবে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। বোতল উঁচু করে ধরে মুখে পানি ঢালতে গিয়ে চোখ পড়ল তালার ফুটোটার দিকে। থেমে গেল হাত। কি যেন মনে করার চেষ্টা করল। পানি আর খেল না। বোতলটা নামিয়ে রেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'কি হলো!' একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল রবিন ও মুসা।

জবাব না দিয়ে দরজার কাছে এসে বসল কিশোর। চোখ রাখল তালার ফুটোয়। ওপাশে তাকাল। দেখা গেল না কিছু। উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। মাথা নেড়ে বলল, 'যা সন্দেহ করেছিলাম!'

'কী!' আবার একসঙ্গে জানতে চাইল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'অন্ধকার! ওপাশের কিছু দেখা যায় না!'

হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা, 'তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? বন্ধ ঘর, অন্ধকার তো হবেই…'

'না, সে জন্যে নয়!'

রবিন বুঝে ফেলল। চেঁচিয়ে উঠল, 'তারমানে ফুটোটা বন্ধ! এবং তার মানে চাবিটা লাগানো রয়েছে ফুটোতে!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে উঠে পড়ল কিশোর। ঘরের কোণে জঞ্জাল জমা হয়ে আছে। সেগুলোর মধ্যে গিয়ে খুঁজতে শুরু করল।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি খুঁজছ?'

জবাব দিল না কিশোর। একটা খাতার ছেঁড়া মলাট টেনে বের করল জঞ্জাল থেকে। আর একটুকরো তার। জিনিস দুটো নিয়ে গিয়ে বসল দরজার কাছে।

পাশে এসে বসল রবিন। সে-ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। খাওয়া ফেলে মুসাও এসে দাঁড়াল পাশে। সে কিছু বুঝতে পারছে না। তার পেছনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে চিতা।

মাথা কাত করে পাল্লার নিচেটা দেখল কিশোর। ফাঁক খুবই সামান্য। কাজ হবে কিনা বুঝতে পারছে না। ফাঁক এত কম, না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু, চেষ্টা করতে দোষ কি?

মলাটটা মেঝেতে রেখে পাল্লার নিচের ফাঁক দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল সে, তালাটার বরাবরে। তারপর সাবধানে তারের মাথা ফুটোয় ঢুকিয়ে আলতো খোঁচা দিল। দু-তিনবার দিতেই ফুটো থেকে খুলে পড়ে গেল চাবিটা।

মলাটটার ওপরে যে পড়েছে, সেটা শব্দ শুনেই বোঝা গেল। এটাই চেয়েছিল কিশোর।

মলাটের এদিকের ধার ধরে আস্তে আস্তে টেনে আনতে লাগল ভেতরে। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে তার।

কিন্তু লাভ হলো না। যা সন্দেহ করেছিল, তাই ঘটল। ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল শূন্য মলাট। চাবিটা নেই। পাল্লার নিচে ফাঁক কম। ঢুকতে পারেনি। আটকে আছে ওপাশে।

নিরাশ ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল কিশোর। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। নীরবে উঠে এসে বসল আবার ঘরের মাঝখানে। পানির বোতলটা তুলে নিয়ে গলায় ঢালল ঢকঢক করে। যেন সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই তার হাত চেটে দিল চিতা।

করুণ কণ্ঠে মুসা বলল, 'তাহলে বেরোনোর আর কোন উপায়ই নেই?'

'আছে,' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল রবিন, 'বেরিয়ে আমরা যাবই!'

চোখ তুলে তার দিকে তাকাল কিশোর। খসখসে-শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি করে?'

ওপর দিকে হাত তুলল রবিন, 'ওই স্কাইলাইট দিয়ে!'

'পারবে?'

'পারব!'

'পারলে তুমি একা যেতে পারবে,' বিশেষ ভরসা পেল না মুসা। 'আমরা বেরোব কি করে?'

'বোকার মত কথা বোলো না। আমি বেরোলেই তো হয়ে গেল। নিচে নেমে ঘুরে এসে ঘরে ঢুকব। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে দরজার তালা খুলে দেব। ব্যস।'

হাসিতে সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'বসে আছ কেন তাহলে? ওঠো, ওঠো, কাঁধে চড়ো!'

দুই হাতে ভর রেখেই দোলা দিয়ে শরীরটাকে স্কাইলাইটের বাইরে বের করে নিল রবিন। তার পাতলা শরীর বলে অনেক সুবিধে হলো। ঢালু ছাতে উঠে বসে ফোকর দিয়ে নিচে তাকাল। হেসে বলল, 'বসে থাকো। বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।'

মাথা মাটির দিকে, পা ওপর দিকে করে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল সে। ছাতটা যে রকম ঢালু, পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। একটু এদিক ওদিক হলেই মাটিতে গিয়ে পড়ে ঘাড় ভাঙবে। তাই খুব সাবধান রইল সে। ছাতের একেবারে কিনারে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচে উঁকি দিল।

কিশোরের ডাক শোনা গেল, 'রবিন, নামতে পারবে?'

জবাব দিল সে, 'চেষ্টা করছি।'

'কি ভাবে নামবে?'

'একটা ড্রেনপাইপ আছে। ওটার কাছে যেতে পারলে বেয়ে নামতে পারব।'

'দেখো, সাবধান! হাত-পা ভেঙো না! না পারলে ফিরে এসো! বেশি ঝুঁকি নিও না!'

'আচ্ছা!'

বলল বটে, কিন্তু ঝুঁকি ঠিকই নিল রবিন। হাতটা এ রকম ঢালু না হলে অসুবিধে হত না। কিন্তু নয় যখন, কি আর করা…এক হাত পাশে বাড়িয়ে দিল সে। একটা পা-ও বাড়াল। হাত আর পায়ে ভর করে সরে গেল কয়েক ইঞ্চি।

এ ভাবেই ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরে চলে এল পাইপটার কাছে। পাইপ ধরাটাও আরেক সমস্যা। উল্টো হয়ে আছে সে। এই অবস্থায় পাইপ ধরে ঝুলে পড়তে গেলে মস্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। হাত ছুটে গেলে আর রক্ষা নেই। আছড়ে পড়তে হবে নিচের কঠিন মাটিতে। তাতে কোমর ভাঙার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

আরও কয়েক ইঞ্চি সামনে বাড়ল সে। উঠে বসে নিচের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল পাইপটা। দ্বিধা করল একবার। তারপর যা হয় হবে, ভেবে, ছেড়ে দিল শরীরটা। প্রায় ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ল। দোল খেতে লাগল শরীর। পিছলে যেতে চাইল হাত। কিন্তু ছাড়ল না সে। প্রাণপণে চেপে ধরে রইল। এবারেও তাকে সহায়তা করল তার হালকা শরীর।

দেয়ালে দুই পা ঠেকিয়ে দিল। দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল। ও ভাবে থেকেই কয়েক সেকেন্ড জিরিয়ে নিয়ে বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

বিপদ এখনও আছে, তবে সবচেয়ে কঠিন কাজটা শেষ।

ধীরে ধীরে পাইপ বেয়ে নামতে লাগল সে। মাটি কয়েক ফুট ওপরে থাকতে ছেড়ে দিল হাত। ওটুকু লাফিয়ে নামল।

হাতের পেশী ব্যথা হয়ে গেছে। দরদর করে ঘামছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। তবে এ সব কেয়ার করল না। নামতে যে পেরেছে এই আনন্দেই খুশি। মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে বসল।

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে উঠল। এবার বাড়িতে ঢুকতে হবে। দরজায় তালা দেয়া থাকলেই বিপদ।

দরজা-জানালা সবই বন্ধ, একটাও খোলা পেল না। দমে গেল সে। এত কষ্ট করে নেমে এসে লাভটা কি হলো?

বাড়ির চারপাশে আরেকবার চক্কর দিয়ে ভালমত খুঁজতে লাগল।

এইবার পেয়ে গেল পথ। মাটির নিচের কয়লা রাখার ঘরের ট্র্যাপডোরটা ঠিকমত লাগানো হয়নি। জোরে জোরে কয়েকবার টানতেই খুলে গেল।

নিচে নামল সে। কয়লা নেই এখন ঘরটায়। বোধহয় কয়লার প্রয়োজন পড়ে না আর। ঘরের মাঝখানে সেন্ট্রাল বয়লারটা বাতিল হয়ে পড়ে আছে, এককালে পুরো বাড়ি গরম করা হত ওটার সাহায্যে। এখন নিশ্চয় ইলেকট্রিক হীটার বসানো হয়েছে।

যন্ত্রটার পাশ ঘুরে আসতেই সরু একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল। ওটা দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভাবল সে, 'ওপরের দরজাটা লাগানো না থাকলেই এখন বাঁচি!'

লাগানোই আছে দরজাটা, তবে সাধারণ একটা হুড়কো দিয়ে। জোরে চাপ দিতেই গেল ভেঙে। পুরানো জিনিস।

বিশাল রান্নাঘরে ঢুকল সে। মেঝে তৈরি হয়েছে পাথর দিয়ে। অনেক পুরানো আমলের বাড়ি। রান্নাঘর থেকে বেরোনোর কয়েকটা দরজা। হলঘরটা কোন দিকে অনুমানের চেষ্টা করল। প্রথম যে দরজাটা খুলল, সেটা দিয়ে ঢুকতেই পেয়ে গেল হলঘর, যেখানে রয়েছে ওপরে ওঠার সিঁড়ি।

উঠে এল দোতলায়। সেখান থেকে চিলেকোঠায়। দরজার সামনে কাঠের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল চাবিটা। তুলে নিয়ে তালার ফুটোতে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'কিশোর, আমি এসে গেছি!'

ষোলো

সময় পেয়ে একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না ওরা আর। চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এল। রবিনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল মুসা।

আনন্দে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল চিতা।

কিশোর বলল, 'যাওয়ার আগে বাড়িটা একবার দেখে যাই। তবে দেরি করা চলবে না। কে আবার কখন এসে পড়ে!'

হাতে সময় কম। দ্রুত একবার বাড়িটা ঘুরে দেখল ওরা। বেশ বড় একটা খামারবাড়ি। অনেক পুরানো। কিছু কিছু পরিবর্তন করে আধুনিক করে তোলা হয়েছে। কিন্তু কোন কারণে একেবারে নির্জন। মালিক হয়তো বেড়াতে-টেড়াতে গেছে কোথাও, কিংবা অন্য কোনখানে বাস করে। দেখাশোনা করার জন্যে রেখে গেছে মহিলাকে। তার সঙ্গে খাতির করে, টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে বশ করেছে তিন চোর। এই অঞ্চল থেকে বেরোনোর সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

'মালগুলো তো নিয়ে আসতে দেখলাম,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এনে রাখল কোথায়? গাড়িতে করে নিশ্চয় সমস্ত জায়গায় বয়ে বেড়ায় না।'

দোতলা এবং নিচতলায় ওগুলো পাওয়া গেল না। মাটির তলার ঘরে এসে নামল। কয়লা রাখার ঘরের পাশে আরেকটা ঘর আছে, তার বিশাল দরজা। বড় বড় তিনটে নতুন তালা লাগানো।

'হুঁম!' মাথা দোলাল কিশোর, 'এখানেই এনে রেখেছে। নইলে তালা লাগাত না।'

'ঠিক,' তাকে সমর্থন করল রবিন। 'যে ক-দিন থাকতে পারে থাকবে, না পারলে নিয়ে পালাবে।'

'পুলিশকে জানানো দরকার। চলো। আর কিছু দেখার নেই।'

আবার কয়লা রাখার ঘরে ফিরে এল ওরা। ট্র্যাপডোর দিয়ে উঠে চলে এল ওপরে।

'আউ!' কোমরে হাত দিয়ে শরীর মুচড়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে

বলল মুসা, 'বেরোলাম তাহলে।'

'কেন, চিলেকোঠা থেকে বেরোনোর পরেও সন্দেহ ছিল নাকি?'

'তা তো ছিলই। এখনও আছে। কোনদিক থেকে কে এসে আবার ধরে ফেলবে...'

'কে আর আসবে। বুড়িটা তো খাবার দিয়ে বলে গেল, কাল পর্যন্ত চলবে। তারমানে কালকের আগে আসছে না।'

'আমি অতটা শিওর হতে পারছি না,' রাস্তার দিকে পা বাড়াল কিশোর। 'হেঁটে গেছে সে। সুতরাং বেশি দূরে যায়নি। কোন কাজটাজ আছে, গাঁয়ে গেছে, চলে আসবে আবার। চোখ খোলা রাখতে হবে। কাউকে আসতে দেখলেই লুকিয়ে পড়ব।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। অপরিচিত জায়গা। সরু একটা রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে। এত দীর্ঘ, মনে হচ্ছে পথ আর ফুরাবে না। আসলে তাড়াহুড়া আছে বলেই এ রকম লাগছে।

দূরে একটা গির্জার চূড়া চোখে পড়ল। ওটা গ্রাম। স্কাইলাইট দিয়ে ওই গ্রামটাই চোখে পড়েছিল রবিনের।

অনেক ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। ভীষণ গরমে দরদর করে ঘামছে ওরা। লম্বা জিভ বের করে দিয়ে হাঁপাতে শুরু করেছে চিতা।

'এই গরমে হেঁটে গেলে মরে যাব,' কিশোর বলল। 'একটা গাড়ি-টাড়ি পেলে ভাল হত।'

'এখানে গাড়ি আসবে কোত্থেকে?' মুসা বলল 'আর এলেও হাত তুলে সেটাকে থামতে বলাটা রিস্কি হয়ে যাবে। চোরের গাড়ি হলে তো মরেছি।'

বলেও সারতে পারল না সে, ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে এ দিকেই।

'খাইছে!' বলেই এ দিক সে-দিক তাকিয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল মুসা।

হাত ধরে তাকে থামাল কিশোর। যে গাড়িটা আসছে, সেটা চোরদের হতে পারে না। কারণ এটা একটা স্পোর্টস কার। বডিটা লম্বা, নিচু ছাত। একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল সে। তারপর রাস্তার মাঝখানে উঠে এসে দু-হাত মাথার ওপরে তুলে নাড়তে লাগল।

কাছে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল গাড়ি। স্টিয়ারিঙে বসে আছে এক হাসিখুশি তরুণ। মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, বাস ফেল করেছ বুঝি?'

'না, স্যার,' শান্ত, ভদ্র-কণ্ঠে বলতে বলতে এগিয়ে গেল কিশোর। 'সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি আমরা। এদিকটা চিনিও না। কাছাকাছি কোন থানায় পৌঁছে দেবেন আমাদের, প্লীজ?'

'থানা?' অবাক হলো লোকটা। 'বেশ, দেব। বাড়ি থেকে পালাওনি তো?'

'না।'

গাড়িতে উঠে নিজেদের পরিচয় দিল গোয়েন্দারা। যেতে যেতে সংক্ষেপে সব জানাল তরুণকে। তার নাম জোনস রীডার। খুব আগ্রহী মনে হলো তাকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে থানায় ঢুকল। কোথায়, কি অবস্থায় পেয়েছে ওদেরকে, জানাল পুলিশকে।

বিশ্বাস করল পুলিশ। কারণ, খানিক আগে রকি বীচের তিনজন কিশোর নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছেন এখানকার অফিসার-ইন-চার্জ হিউবার্ট রাইলি।

রাশেদ পাশার কাছে খবর পেয়ে হনিভিলের গুহা আর সুড়ঙ্গ চষে ফেলেছে পুলিশ। চোর কিংবা ছেলেদের ওখানে না পেয়ে আশপাশের সমস্ত থানাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, নজর রাখতে অনুরোধ করেছে।

একটা ফোন করার অনুমতি চাইল কিশোর।

ঘাড় নেড়ে ইশারায় অনুমতি দিলেন রাইলি।

বাড়িতে ফোন করল সে। চাচাকে জানাল, ওরা কোথায় আছে। চিন্তা করতে মানা করল। মুসা আর রবিনদের বাড়িতেও খবরটা জানিয়ে দিতে অনুরোধ করল। চাচা বললেন, ভীষণ রেগে আছেন মেরিচাচী।

শুনে মুচকি হাসল কেবল কিশোর। চাচীকে নিয়ে ভাবনা নেই। সহজেই শান্ত করে ফেলতে পারবে। শুরুতে বকাঝকা খেতে হবে আরকি কিছু। তবে এবারে অনুমানে কিছুটা ভুল করে ফেলল সে। যাই হোক, সেটা পরের কথা।

যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন রাইলি। ছেলেদের বললেন, 'তোমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। চিনিয়ে দিতে হবে বাড়িটা।'

ওরা তো যাওয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া। তিনি না বললে ওরাই বরং যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করত।

জোনসেরও সঙ্গে যাওয়ার খুব ইচ্ছে। কি করে যাওয়া যায়, সেই মতলব করতে থাকল। দেখল, পুলিশের তিনটে গাড়িই মোটামুটি বোঝাই হয়ে গেছে। কুকুরটাকে সহ আরও তিনজনের তোলার জায়গা নেই। সুযোগ বুঝে বলে ফেলল, 'আমিও আসব?'

'আসতে চান?' দ্বিধা করছেন রাইলি।

'সুবিধেই হবে আপনাদের। আমার গাড়িতে করে ছেলেগুলোকে নিয়ে যেতে পারব। সবাই চলে গেলে কুত্তাটাও নিশ্চয় এখানে থাকতে চাইবে না…'

হেসে ফেললেন অফিসার। 'ঠিক আছে, আসুন। উপকারই হয় আমাদের।'

সতেরো

বাড়িটা দেখিয়ে দিল গোয়েন্দারা।

বোঝা গেল, আগের মতই নির্জন রয়েছে। সেই মহিলা কিংবা চোরেরা, কেউ ফেরেনি।

তাড়াতাড়ি গাড়িগুলোকে বাড়ির পেছনের আঙিনায় লুকিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন রাইলি। সঙ্গে যে ক-জন পুলিশ এসেছে, তাদের অর্ধেককে বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড়ে আর গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বললেন, বাকি অর্ধেক বাড়ির ভেতরে ঢুকবে তাঁর সঙ্গে। একজন লক এক্সপার্টকে নিয়ে এসেছেন। তাকে দরজার তালা খোলার নির্দেশ দিলেন।

তালা খুলতে একটা মিনিটও লাগল না লোকটার।

'তোমরা আমার সঙ্গে এসো,' গোয়েন্দাদের বললেন রাইলি। 'মিস্টার রীডার, আপনিও আসুন। ছেলেদের নিয়ে দোতলায় লুকিয়ে থাকবেন। আমরা থাকব নিচতলায়। কেউ এলেই ধরব। না ডাকলে আপনারা নিচে নামবেন না কিন্তু।'

দলবল নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন তিনি। সদর দরজার তালাটা আবার লাগিয়ে দিতে বললেন এক্সপার্টকে। সব আগের মত করে রাখতে চান, চোরেরা এলে যাতে কিছু সন্দেহ করতে না পারে।

দোতলায় উঠে এল গোয়েন্দারা।

সিঁড়ির মাথায় লুকানোর একটা জায়গা আবিষ্কার করে ফেলল মুসা। এখান থেকে উঁকি দিয়ে সদর দরজা আর হলঘরের অনেকখানি চোখে পড়ে।

হলঘরে ছড়িয়ে পড়েছে পুলিশ। একটা সোফায় বসেছেন রাইলি। একজন পুলিশম্যান দূরবীন চোখে লাগিয়ে নজর রাখছে রাস্তার দিকে।

'আমার মনে হয় না চোরেরা আজ আসবে,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'তবে বুড়িটা আসবেই,' রবিন বলল। 'এই বাড়ি তার পাহারাতেই রেখে গেছে বাড়ির মালিক।'

'ভাল মানুষের কাছেই রেখেছে···চোরের কাছে মুরগী-পাহারা···'

থেমে গেল রবিন। জানালার কাছ থেকে বলে উঠল পুলিশম্যান, 'স্যার, একজন মহিলা আসছে!'

সোফা থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন রাইলি। দূরবীন দিয়ে দেখলেন। হাসি ফুটল মুখে। ওপর দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় আসতে বললেন কিশোরকে।

নেমে এল কিশোর।

দূরবীনটা তার হাতে দিয়ে রাইলি বললেন, 'দেখো।'

পলকের জন্যে মাত্র একবার দেখেছে মহিলাকে কিশোর। তবু চেহারাটা গেঁথে রয়েছে মনে। বলে উঠল, 'হ্যাঁ, স্যার, এই মহিলাই!'

'গুড। যাও, ওপরে চলে যাও। শব্দ করবে না।'

রবিনের কথাই ঠিক হলো। বুড়িটাই আসছে, বুঝতে পারল গোয়েন্দারা।

সবাই চুপ। নিচের হলঘরে পিনপতন নীরবতা। ওপরেও কথা বলছে না কেউ। কুকুরটাও চুপ। উল্টোপাল্টা কিছু করলে পিটিয়ে হাড্ডি ভাঙার হুমকি দিয়েছে তাকে মুসা।

কিন্তু সে নিজেই হুমকির সম্মুখীন হয়ে গেল। সুড়সুড় করে উঠল নাকের ভেতরটা। প্রচণ্ড একটা হাঁচি পাকিয়ে উঠছে। নাক টিপে ধরে ফিসফিস করে

বলল, 'কিশোর, হাঁচি!'

'আ, মরেছে! জলদি চিলেকোঠায় চলে যাও! যাও, যাও!'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই দৌড় দিল মুসা। উঠে গেল ওপরে। ভোঁতা একটা শব্দ হলো। বেশি জোরে নয়। বুড়ি শুনবে বলে মনে হয় না। আর শুনলেও কিছু হবে না। ভাববে ছেলেরা ওখানেই আছে। সে জন্যেই মুসাকে ওখানে চলে যেতে বলেছে কিশোর।

আবার নিচে নেমে এল মুসা।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল কিশোর, 'আর নেই তো?'

লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা।

পুলিশদের কাউকে চোখে পড়ছে না। লুকিয়ে পড়েছে সোফা, আলমারি আর দরজার পাল্লার আড়ালে।

বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। এগিয়ে এসে থামল দরজার সামনে। তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ। খুলে গেল পাল্লা। রোদ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেতরে, হলদে আলোর বন্যায় ভেসে গেল প্রায় অন্ধকার ঘরটা।

কিছুই সন্দেহ করল না মহিলা। ঘরে ঢুকল। এগিয়ে এল কয়েক পা।

চোখের পলকে দু-দিক থেকে দু-জন পুলিশম্যান বেরিয়ে এসে চেপে ধরল মহিলার দুই হাত। ভীষণ চমকে গেল মহিলা। বোকা হয়ে তাকিয়ে রইল পুলিশের দিকে।

বিমূঢ় অবস্থাটা কাটতেই ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। চিৎকার করে উঠল, 'কে আপনারা? কি চাই?'

হাসিমুখে আলমারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন রাইলি। 'আমরা কে পোশাক দেখেই বুঝতে পারছেন, ম্যা'ম। কি চাই জিজ্ঞেস করছেন? জানতে চাই আপনি কে?'

'আমি কোন জবাব দেব না!' ফুঁসে উঠল মহিলা। 'একটা শব্দও না! এ সব করার কোন অধিকার নেই আপনাদের?'

'তাই নাকি? বেফাঁস কিছু বলে বসবেন না যেন, আদালতে আপনার বিপক্ষে চলে যেতে পারে সে-সব। চোরের সহযোগিতা এবং তিনটে ছেলেকে আটকে রাখার অপরাধে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করলাম।'

'কি বলছেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' চিৎকার করে বলল মহিলা। 'সব মিথ্যে কথা!'

'মিথ্যে, না? দেখুন তো এদের চিনতে পারেন কিনা? এই ছেলেরা, তোমরা বেরিয়ে এসো।'

সিঁড়ির মাথায় শব্দ শুনে ঝট করে সে দিকে তাকাল মহিলা। ছেলেদের দেখে জ্বলে উঠল চোখ। সামলে নিল সহজেই। মাথা নেড়ে বলল, 'জীবনেও দেখিনি। ওরা কারা?'

'আপনার শয়তানির সাক্ষি। আদালতে গেলেই বুঝতে পারবেন সব...'

জানালার কাছ থেকে বলে উঠল পুলিশম্যান, 'স্যার, গাড়ি আসছে!' মহিলাকে ধরার পর পরই দূরবীন নিয়ে আবার গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়েছে সে।

ইঞ্জিনের শব্দ কাছে আসতে লাগল।

আবার বলল সে, 'গাড়িতে তিনজন লোক। একজন লম্বা, অন্য দু-জন খাটো। তাদের একজনের দাড়ি আছে।'

'তিন চোর!' বলে উঠল কিশোর, 'ডারবি, জুরাই আর পটার!'

'জলদি ওপরে যাও!' তিন গোয়েন্দাকে বললেন রাইলি। মহিলাকে বললেন, 'টুঁ শব্দ করবেন না বলে দিলাম! ভাল হবে না তাহলে!'

আগের বারের মত লুকিয়ে পড়ল পুলিশেরা। মহিলাকে বসিয়ে দেয়া হলো সোফার পেছনে। আবার ঘরে পিনপতন নীরবতা। সিঁড়ির মাথায় ছেলেদের সঙ্গে চুপচাপ বসে আছে জোনস। নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হতে চলেছে যেন।

বাড়ির বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো। আঙিনায় ঢোকেনি গাড়িটা, সীমানার বাইরে রয়েছে। ডারবির ডাক শোনা গেল, 'মিস ডেনটন, আপনি আছেন?...দরজা খুলুন। কথা আছে।'

জবাব না পেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল ডারবি। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা।

হঠাৎ এক ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মিস ডেনটন। 'জলদি ভাগো! পুলিশ!'

ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল ডারবি। তারপর ঘুরে দিল দৌড়।

আলমারির আড়াল থেকে ছুটে বেরোলেন রাইলি। মহিলার দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফুঁ দিলেন বাঁশিতে।

হঠাৎ এই বাঁশি শুনে দ্বিধায় পড়ে গেল বাইরে লুকানো পুলিশেরা। বেরোবে কিনা বুঝতে পারল না। ঘরে যারা ছিল তারা দৌড় দিল দরজার দিকে। লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা, চিতা আর জোনস।

সবার আগে দরজার কাছে পৌঁছল মুসা এবং চিতা। দেখল, গাড়ির কাছে দৌড়ে যাচ্ছে তিন চোর। তাদের ধরতে পারবে না পুলিশ, তার আগেই গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যাবে চোরেরা।

চিন্তা করার সময় নেই। চিতাকে আদেশ দিল মুসা, 'চিতা, ধর্ ব্যাটাদের, ধর্! কামড়ে দে!'

এই আদেশের অপেক্ষাতেই যেন ছিল কুকুরটা। স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে ঘাউ! ঘাউ! করতে করতে ছুটল।

ফিরে তাকাল ডারবি। থমকে গেল। বুঝে গেছে, কুকুরটার সঙ্গে দৌড়ে পারবে না।

তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল চিতা।

বিশাল কুকুরটার ধাক্কা সামলাতে না পেরে চিত হয়ে পড়ে গেল ডারবি। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। চকিতে হাত চলে গেল গলার কাছে। তার ধারণা, কণ্ঠনালি কামড়ে ধরবে কুকুরটা।

কিন্তু গলায় কামড় দিল না চিতা। বুকের ওপর চেপে থেকে হাত কামড়ে

ধরল। আটকে ফেলল লোকটাকে।

পুলিশেরা তার কাছে ছুটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর ডারবির ওপর থেকে নেমে আবার চিৎকার করতে করতে ছুটল অন্য দু-জনকে ধরতে।

ফিরে তাকিয়ে ডারবির অবস্থা দেখেছে জুরাই। আবার কুকুরটাকে আসতে দেখে দৌড় দিতে গিয়েও দিল না, পা আটকে গেছে যেন। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে চিতার হাঁ করা মুখ, ধারাল দাঁত, আর লাল টকটকে জিভের দিকে।

গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকেও মাটিতে ফেলে দিল চিতা। কামড় বসাতে গেল গলায়। খাটো লোক দুটোর ওপর বিশেষ রাগ আছে তার। বস্তায় ভরে তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে।

দৌড়ে আসছে মুসা। চিৎকার করে বলল, 'না, চিতা না!'

দ্বিধায় পড়ে গেল কুকুরটা। ফিরে তাকাল।

হাত নেড়ে আবার বলল, 'গলায় কামড় দিস্‌নে!'

ততক্ষণে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে পটার। একটানে দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। তাড়াহুড়োয় দরজা লাগানোর কথাও ভুলে গেল। পাগলের মত হাত বাড়াল ইগনিশন কী-র দিকে।

'গেল তো পালিয়ে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'চিতা, ধর্!'

গর্জে উঠল ইঞ্জিন। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল পটার। চলতে শুরু করল গাড়ি।

কিন্তু গাড়ির নাক পুরোপুরি ঘুরে সারার আগেই ঝাঁপ দিল চিতা। খোলা দরজা দিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল ভেতরে। এইবার একজনের টুঁটি কামড়ানোর সুযোগ পেল সে। ভাগ্য ভাল পটারের, মোটা জিনসের শার্ট আছে গায়ে, কলারে আটকে গেল কুকুরটার দাঁত। চামড়ায় ঠিকমত বিঁধল না।

বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল পটার। হাত সরে গেল স্টিয়ারিং থেকে। গলা বাঁচানোর চেষ্টা করল। কিন্তু একসিলারেটরে পায়ের চাপ রয়েই গেছে। ধ্রাম করে গিয়ে একটা গাছে গুঁতো দিল গাড়ি। বেঁকেচুরে ভেতর দিকে বসে গেল নাক। খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ল সে আর চিতা। কামড় ছাড়েনি কুকুরটা। জোঁকের মত লেগে আছে।

গড়াতে শুরু করল পটার। কুকুরটাকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

পৌঁছে গেল মুসা। তার সঙ্গে পুলিশ।

কলার ধরে চিতাকে সরিয়ে আনল মুসা।

পটারকে ধরে তুলল পুলিশ। থরথর করে কাঁপছে চোরটা। গলার চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। ভালমতই প্রতিশোধ নিয়েছে চিতা।

কিছুক্ষণ পর। হাতকড়া পরিয়ে হলঘরের মেঝেতে বসিয়ে দেয়া হয়েছে তিন চোর আর ওদের সহযোগী মিস ডেনটনকে।

তিন গোয়েন্দাকে বার বার ধন্যবাদ দিলেন অফিসার রাইলি। বললেন,

'একটা কাজের কাজই করলে তোমরা। চলো, এখানে আর কিছু করার নেই।' অপরাধীদের দেখিয়ে বললেন, 'এদেরকে নিয়ে চলে যাবে আমার লোক। আমি তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেব।'

'একটু দাঁড়ান, স্যার,' হাত তুলে বলল কিশোর। 'চোরাই মালগুলো কোথায় আছে, বুঝতে পেরেছি। আসুন আমার সঙ্গে।' লক এক্সপার্টের দিকে হাত নেড়ে বলল, 'আপনিও আসুন।'

মাটির তলার ঘরে তাঁদেরকে নিয়ে এল কিশোর। সঙ্গে এল মুসা, রবিন, চিতা, আর অবশ্যই জোনস; ভীষণ কৌতূহল তার, সবখানেই যেতে চায়।

দরজার তালাগুলো খুলতে সময় লাগল না লক এক্সপার্টের।

ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর। ওই ঘরেই পাওয়া গেল চোরাই মাল।

রাইলির কাছ থেকে আরেক প্রস্থ ধন্যবাদ গ্রহণের পালা গোয়েন্দাদের। পুলিশ যেমন খুশি, ওরাও তেমনি খুশি। কেসটার পুরোপুরি সমাধান করতে পেরেছে।

গোয়েন্দাদেরকে পুলিশের পৌঁছে দিতে হলো না, জোনসই আগ বাড়িয়ে পৌঁছে দেয়ার কথা বলল। একজন নতুন বন্ধু পেয়ে গেছে। কিশোরদেরও আপত্তি নেই।

বাড়ির দিকে চলল গাড়ি।

মুসা বলল, 'এইবার আসল ঠ্যালা সামলাতে হবে।'

'কিসের ঠ্যালা?' রবিনের প্রশ্ন।

'মেরিচাচীর। কিশোর, ভয় লাগছে না?'

'লাগছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

সব কাজকর্ম বাদ দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন মেরিচাচী। ওদেরকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন। কোন ভূমিকা নেই, অন্য কোন কথাও নেই, প্রথমেই ধমকে উঠলেন, 'না বলে গেলি কেন!'

'চাচী, শোনো...' বলতে গেল কিশোর।

'কোন কথাই শুনতে চাই না আমি! গেলি কেন?'

'আমার কথা না শুনলে...'

'গেলি কেন না বলে!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন মেরিচাচী। 'আমি এদিকে চিন্তায় বাঁচি না...'

'চাচী, সরি...' এবার যে এতটা রেগে যাবেন চাচী, কল্পনাই করেনি কিশোর। নিশ্চয় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, বেশি দুশ্চিন্তা করেছেন, সে জন্যেই মেজাজ এতটা চড়ে গেছে। নইলে এ রকম করেন না তিনি, দু-চারটা বকা, আর শাস্তি হিসেবে কিছু কাজ চাপিয়ে দিয়েই শান্ত হয়ে যান।

'ও সব সরি-ফরি বুঝি না! একটাই শাস্তি তোদের, কাজ! ইয়ার্ডে থাকবি আর কাজ করবি! যে করবে না, সে আর কোনদিন ইয়ার্ডে ঢুকতে পারবে না! এই আমার শেষ কথা!' ঘুরে এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলেন আবার চাচী। 'আজই তোর চাচা মাল কিনতে যাচ্ছে। তোরাও সঙ্গে যাবি।...খাবার

দিচ্ছি। হাতমুখ ধুয়ে খেতে আয়।'

গটমট করে চলে গেলেন চাচী।

সে দিকে একবার তাকিয়ে আবার কিশোরের দিকে ফিরলেন রাশেদ পাশা, 'আমাকে অন্তত বলে যেতে পারতি?'

'চাচা, ভুল হয়ে গেছে, মাপ করে দাও,' হাতজোড় করে বলল কিশোর।

দেখাদেখি মুসা আর রবিনও হাতজোড় করে দাঁড়াল।

হেসে ফেললেন রাশেদ পাশা। 'থাক, আর মাপ চাইতে হবে না। আমি রাগিনি। আয়, দেরি করলে আমাকেও আজ আস্ত রাখবে না তোর চাচী।'

জোনসের কথা এতক্ষণে মনে পড়ল কিশোরের। তাকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে ঘুরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল। গাড়িটা নেই। জোনস ভেবেছিল, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারটা দেখেই যাবে, সে জন্যেই এসেছিল। কিন্তু মেরিচাচীর মারমুখো মূর্তি দেখে আর থাকার সাহস পায়নি। ভেগেছে। একটা কৌতূহল অন্তত মেটানো হলো না তার।

সে দিন বিকেলে, কাজ করতে করতে গলদঘর্ম হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। ওদের শাস্তির পরিমাণ বাড়ানোর জন্যে বোরিস আর রোভারকে অন্য কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন মেরিচাচী। নতুন মালগুলো সামলানোর ভার পড়েছে তিন গোয়েন্দার ওপর। রবিন আর মুসার আম্মার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন চাচী, এই শাস্তিতে তাঁদেরও কোন অমত নেই। বরং *বেয়াড়া* ছেলেগুলোকে কিছুটা টাইট দেয়ার একটা উপায় পেয়ে গিয়ে খুশিই হয়েছেন।

একটা সময় ধপ করে বসে পড়ল মুসা। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'কিশোর, দোহাই লাগে তোমার, কিছু একটা ব্যবস্থা করো! আর তো পারি না!'

মুখ কালো করে কিশোর বলল, 'কি করব? বুদ্ধি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়! ফাঁকি যে দেব, তারও উপায় নেই, যে চোখের চোখ, একেবারে ঈগল...'

গেটে গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে থেমে গেল সে। ফিরে তাকাল তিনজনেই। পুরানো একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

উঠে এগিয়ে গেল ওরা। দেখল, গাড়িতে বসে আছেন মিস্টার গরডন। ওদেরকে দেখেই বললেন, 'অ্যাই যে, আছ তোমরা... দাওয়াত দিতে এলাম।' গাড়ি থেকে নামলেন তিনি। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তারপর কেমন আছ সব? কাজ তো একটা করে দিলে...'

'ভাল না, স্যার,' করুণ কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'আপনার কাজ করতে গিয়েই আজ আমাদের এই দুরবস্থা...'

'কেন, কেন?'

কেন, সেটা জানাল তিন গোয়েন্দা।

'ও, এটা একটা ব্যাপার হলো। দাঁড়াও, সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

'কি করে, স্যার?' রবিন বলল। 'মেরিচাচীকে একমাত্র কিশোর পটাতে

পারে। আজ সে-ই যখন পারেনি...'

'আমি পারব!' প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন গরডন। 'মানুষকে কি করে নরম করতে হয়, জানি আমি। পথ দেখাও। তাঁর কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

মেরিচাচীর অফিসে গরডনকে পৌঁছে দিয়ে আবার কাজ করতে চলে গেল তিন গোয়েন্দা। একটা চোখ রাখল অফিসের দিকে।

আধঘণ্টা পর হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন গরডন। হাত নেড়ে ডাকলেন গোয়েন্দাদের।

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। দৌড়ে গেল।

গরডন বললেন, 'হয়ে গেছে। তোমাদের শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে দেবেন তিনি। বোরিস ও রোভার তোমাদের কাজে সাহায্য করবে। আর তোমরা সবাই কাল আমার ফোর্টে বেড়াতে যাবে। তোমার চাচা-চাচীকেও দাওয়াত করে গেলাম। এবার যাব মুসা ও রবিনদের বাড়িতে।'

'কিসের দাওয়াত, স্যার?'

'আমার ঘড়িগুলো আবার মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখা নিয়ে একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করব। তোমরা আমার সম্মানিত অতিথি।'

'কিন্তু চাচীকে ম্যানেজ করলেন কি করে?'

'সেটা আর না-ই বা জানলে,' হেসে বললেন গরডন। 'এই একটা রহস্য রহস্যই থেকে যাক না তোমাদের কাছে।'

হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

'ও হ্যাঁ, ভাল কথা,' বললেন তিনি, 'তোমাদের কুকুরটা কোথায়? কি যেন নাম...'

'চিতা, স্যার,' মুসা জানাল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চিতা...'

মুসাকে আর বলতে হলো না, নিজের নাম শুনেই ওঅর্কশপ থেকে ঘাউ ঘাউ করে ডেকে উঠল কুকুরটা।

'বাহ্, কান তো খুব খাড়া!' গরডন বললেন, 'চলো, ওর সঙ্গেও দেখা করে যাই। পুলিশের কাছে যা শুনলাম, আসল কাজটা সে-ই করে দিয়েছে। ও না থাকলে নাকি চোরগুলোকে ধরা কঠিন হত। খুব ভাল একটা গোয়েন্দা-কুকুর পেয়েছ।'

'তা বলতে পারেন, স্যার,' মাথা দোলাল মুসা।

গরডনকে ওঅর্কশপে নিয়ে গেল গোয়েন্দারা। সহজেই তাঁকে চিনতে পারল চিতা। থাবা বাড়িয়ে দিল হাত মেলানোর জন্যে।
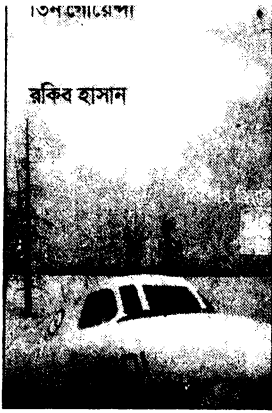
রাতের আঁধারে

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

সেদিন ভোরবেলাতেই রেডিও হাউসে একটা মেসেজ এল। শোনার পর অস্থির হয়ে উঠল দ্বীপের উনিশজন মানুষ। যদিও হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সাদাসিধে খবর। দক্ষিণ মেরুর গিজেল উপসাগরের ঘাঁটি থেকে একটা বিমান আসছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিছু যন্ত্রপাতি আর কয়েকজন যাত্রী নিয়ে আমেরিকায় ফিরে চলেছে ওটা। এ ছাড়া রয়েছে পাঁচটা পেঙ্গুইন, ওঅর্ম-লেক থেকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে জোগাড় করা নতুন ধরনের কিছু উদ্ভিদের নমুনা, আর কুমেরুর আশেপাশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ঘাঁটিতে যেসব গবেষণা চলছে তার মূল্যবান নথিপত্র।

বিমানটা গাউ আইল্যান্ডে নামবে।

দূর থেকে দেখলে দ্বীপ মনে হয় না। যেন কতগুলো কালো পাথর মাথা তুলে রেখেছে সমুদ্রের বুকে। দিনরাত দামাল হাওয়া হু-হু করে বয়ে যায়, উত্তাল ঢেউ ক্ষুব্ধ আক্রোশে আছড়ে পড়ে পাথুরে উপকূলে। দিনভর আশেপাশের আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় সী-গাল আর অন্যান্য সামুদ্রিক পাখি।

নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন থেকে গাউ আইল্যান্ডের দূরত্ব তিন হাজার চারশো সত্তর মাইল, চিলির ভ্যালপারাইসো থেকে এক হাজার নয়শো নিরানব্বই, আর কুমেরুর তুহিন বরফ অঞ্চল থেকে মাত্র ছয়শো মাইল।

একটা রিসার্চ স্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে এখানে। বাড়িঘর বলতে আছে করুগেটেড টিনে তৈরি কতগুলো ছোট ছোট ছাউনি আর প্রয়োজনীয় মালপত্র রাখার জন্যে বড় গুদাম। ছাউনিগুলোর কোনটাতে রেডিও হাউজ, কোনটা আবহাওয়া কেন্দ্র, কোনটা ওঅর্কশপ, কোনটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আবার কোনটা বা বিনোদন কক্ষ। বাকিগুলোতে ঘুমানোর জায়গা। আবহাওয়া কেন্দ্রের ওপরে উড়ছে এয়ার-বেলুন, রেডিও হাউজের পাশের উঁচু টাওয়ারে বিশাল এয়ারিয়াল এবং তার পাশে বসানো ঘূর্ণায়মান রেডার।

চিলির উপকূলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে সাগরে। আকাশে এয়ার-পকেট এত বেশি উড়তেই পারছে না বিমানটা। তাই বাধ্য হয়েই নামতে হচ্ছে গাউ আইল্যান্ডে। সাতজন যাত্রী আর তিনজন কর্মী এখানে রাত কাটিয়ে নিম্নচাপটাকে পার করে দিয়ে আবার উড়াল দেবে। সাতজন যাত্রীর মধ্যে রয়েছেন বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান আর ডাক্তার। আট মাস বরফের রাজ্যে কাটিয়ে দেশে ফিরে চলেছেন তাঁরা।

গাউ আইল্যান্ডে যারা আছে তাদের উত্তেজিত হবার কারণ, এই বিজন দ্বীপে তারাও প্রায় নির্বাসিতের মত বাস করছে। দু'মাস আগে রকি বীচ থেকে এসে হাজির হয়েছে এখানে। স্কুল ছুটি। ঘরে বসে না থেকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সফরে বেরিয়েছিল আঠারোজন ছেলেমেয়ে। এখানে এসেছে মেরুঅঞ্চলের পাখি, উদ্ভিদ আর পাথর নিয়ে গবেষণা করতে। তাদের দলপতি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডক্টর উইনার বেঞ্জামিন।

দ্বীপের একঘেয়ে জীবনে দু'মাসেই হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। ওরা ছাড়া এখানে আর কোন মানুষ নেই। জাহাজ আসে না। আমেরিকা থেকে হপ্তায় একটা করে বিমান আসে রসদ নিয়ে। কুমেরুর ঘাঁটিগুলোতে যায় বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে। কখনও গাউ আইল্যান্ডে নামে, কখনও নামে না।

কুমেরুর বিজ্ঞানীদের জরুরী-রসদ সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয় গাউ আইল্যান্ড। তাড়াহুড়ো করে কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এখানে বিমান পাঠান বিজ্ঞানীরা। মেরুর এত কাছে থেকেও কখনও বরফ জমে না এখানকার সমুদ্রে। যখন খুশি জাহাজ নিয়ে চলে আসা যায়। তবে এখানে দিন কাটানো বড় কঠিন। এর ইতিহাস দুশো বছরেরও বেশি পুরানো। আশেপাশের সমুদ্র পরিষ্কার হলেও দ্বীপটার যেন একটা বড় রকমের দুর্ভাগ্য আছে। সরবরাহ কেন্দ্র তৈরি হওয়ার আগে এখানে যত মানুষ এসেছিল তাদের কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি।

দ্বীপের একধারে একটা প্রাচীন তিমি শিকারির নৌকা আর গোটা চারেক নরকঙ্কাল আবিষ্কার করেছে তিন গোয়েন্দা। তিমি শিকার করতে এসে নিশ্চয় পথ হারিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এখানে উঠেছিল হতভাগ্য মানুষগুলো। আর ফিরে যেতে পারেনি।

যাই হোক, বিমান আসার মেসেজ পাওয়ার পর পৌনে চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আর পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে দ্বীপে ল্যান্ড করবে ওটা। রেডিও হাউজে কানে হেডফোন লাগিয়ে বসে আছে অস্থায়ী রেডিওম্যান রবিন মিলফোর্ড। ওর বয়েসী আরও চারটে ছেলে রয়েছে কামরাটায়। একজন তাকিয়ে আছে রবিনের দিকে, বাকি তিনজনের চোখ রেডারের পর্দার দিকে। সবাই ওরা এই ঘাঁটির অস্থায়ী কর্মী। গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে কেন্দ্রটা চালানোর দায়িত্বও এখন ওদের। রেডিও, জেনারেটর, এসব ঠিক রাখতে না পারলে এখানে টিকতেই পারবে না, ভীষণ বিপদে পড়বে। স্থায়ী কর্মচারীরা দু'মাস আগেই দেশে চলে গেছে। শীতকালে কোন কাজ হয় না কুমেরুতে। ভয়াবহ মেরুরাত্রি শুরু হলে গবেষণা বন্ধ থাকে। কর্মীদেরও ছুটি। ফিরে আসবে আবার বসন্তের শুরুতে।

খড়খড় করে উঠল রেডিও। কথা বোঝা যাচ্ছে না। নব ঘুরিয়ে শব্দ বাড়িয়ে দিল রবিন। মৃদু একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'পেছনের লোকগুলো...'

তার কথা শেষ না হতেই দ্বিতীয় আরেকটা কণ্ঠ বলল, 'আজ রাতে কি খাওয়া জুটবে কে জানে। আছে তো কেবল কয়েকটা ছেলেমেয়ে। ওরা

রান্নাই বা করবে কি আর খাওয়াবেই কি। কিন্তু হচ্ছেটা কি ওখানে? অত চেঁচামেচি করছে কেন পেছনের...'

কথা শেষ হলো না তারও। আচমকা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, আর্তনাদের মত। প্রথম কণ্ঠটা বলে উঠল, 'সর্বনাশ! এ কোন দানব...ভূত নাকি?'

বেড়ে গেল বিমানের ভেতরের কোলাহল। শব্দ আর কথা শুনে মনে হলো পাইলট রুম এবং পেছনের যাত্রীবাহী অংশের মাঝের দরজাটা খুলে দেয়া হয়েছে। একজনের অসংলগ্ন প্রলাপ শোনা গেল। আরেকজনের ভয়ার্ত আর্তনাদ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অন্য আরেকজন, 'পিস্তলটা দাও! শিগগির!...' দূর থেকে শোনা গেল চতুর্থ আরেকটা কণ্ঠ, 'আরে, দরজাটা লাগাও না! ঢুকে পড়ল তো!'

গুলির আওয়াজ হলো। পর পর কয়েকবার।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল স্পীকার।

রেডিওর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন। ঘরের সবার নজর এখন রেডিওটার দিকে। সবাই অবাক।

মাইক্রোফোনে মুখ রেখে চিৎকার করে বিমানটাকে ডাকল রবিন, 'আইস রিসার্চ! আইস রিসার্স! গাউ আইল্যান্ড বলছি। কি হয়েছে আপনাদের?'

জবাব নেই।

যোগাযোগের চেষ্টা করে চলল রবিন।

একটা ছেলে বলল, 'মনে হয় ওদের রেডিওটা গেছে।'

আরেকটা ছেলে হতবুদ্ধির মত রেডারের পর্দার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। একেবারে কিনারে একটা ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এগিয়ে আসছে ধীরগতিতে।

'তারমানে প্লেনটা উড়ছে এখনও!' বলল ছেলেটা।

রেডিও হাউজ নিস্তব্ধ। কারও মুখে কথা নেই।

দরজা খুলে উঁকি দিল কিশোর পাশা। দলের সে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। দ্বীপের দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব এখন তার। ডক্টর বেঞ্জামিন দলপতি হলেও গবেষণা করা ছাড়া তাঁর আর তেমন কোন কাজ নেই।

'কি খবর?' জিজ্ঞেস করল সে।

একসঙ্গে কলরব করে উঠল ঘরের সবাই।

রবিন জবাব দিল, 'অদ্ভুত কোন কাণ্ড ঘটেছে মনে হয় প্লেনের মধ্যে!'

'বাঁক নিয়েছে,' বলল রেডার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা একটা ছেলে। 'নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে গেছে অনেকখানি।'

'ক্যাপ্টেনকে জানাও সেকথা,' কিশোর বলল। 'বলো যে...'

'কি করে জানাব?' রবিন বলল। 'ওদের রেডিও তো খারাপ...'

'সাময়িক খারাপও হতে পারে। হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। চুপ করে না থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাও। জানানোর চেষ্টা করো ক্যাপ্টেনকে।'

আবার মাইক্রোফোনের দিকে ঝুঁকল রবিন। 'আইস রিসার্চ! আইস

রিসার্চ! গাউ আইল্যান্ডের পথ থেকে সরে গেছেন আপনারা। তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি ধরে এগোচ্ছেন। তিনশো পনেরো হবে ওটা। শুধরে নিন।'

বার বার একই কথা বলে গেল সে। কিন্তু জবাব পেল না।

রেডারের পর্দার চলমান আলোক বিন্দুটার গতি অত্যন্ত ধীর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে রবিনকে বলল কিশোর, 'অনেকটা সরে এসেছে। আরও সরতে হবে। তুমি নির্দেশ দিতে থাকো ক্যাপ্টেনকে।' অন্য চারটে ছেলের একজনের দিকে তাকাল সে। 'এবার বলো তো আমাকে, ঘটনাটা কি?'

বলার সুযোগ পেয়ে গড়গড় করে সব যেন উগড়ে দিল ছেলেটা।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বরফের রাজ্যে থাকতে থাকতে নানা কারণে পাগল হয়ে যায় লোকে। একঘেয়ে কাজ আর পরিবেশ স্নায়ুতে ভয়াবহ চাপ দিতে থাকে। এখানে আসার আগে থাকে সাংঘাতিক অ্যাডভেঞ্চার ও রোমাঞ্চের মোহ। সেটা কেটে যাওয়ার পর টেপ করা গান-বাজনা শুনে, ভিডিওতে সিনেমা দেখে, বই আর পুরানো পত্রপত্রিকা পড়ে কাটায় কিছুদিন, তারপরই বাড়ির জন্যে মন অস্থির হতে থাকে। উতলা হয়ে ওঠে ফিরে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু ফেরা অত সহজ হয় না। মনের ওপর চাপ পড়ে, স্নায়ুর অসুখে ভুগতে ভুগতে পাগল হয়ে যায় অনেকে। বিমানের যাত্রীদের বেলায়ও ওরকম কিছু ঘটল না তো?

'গুলি হয়েছে, তাই না?' আনমনে বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'জখম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করে রাখতে হয়।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে রেডিও-রুম থেকে বেরিয়ে এল সে।

আকাশের রঙ ধূসর। পাহাড়ের ওধারে সাগর ধূসর। নিচু চালাওয়ালা খুপরির মত কেবিনগুলোর দেয়াল ধূসর। ওঅর্কশপ আর অফিসঘরগুলোর দেয়ালও একই রঙের। কোন রকম বৈচিত্র্য বা অলঙ্করণ নেই। কিশোরের মনে হলো এ মুহূর্তে পৃথিবীর সব রঙ আটকে আছে যেন শুধু বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের শেষে মিনারের মাথায় উড়ন্ত টকটকে লাল বেলুনটাতে।

জিনা আর টেরিয়ার ডয়েলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর। কোমরে হাত দিয়ে কিছু বলছে জিনা। নিঃসন্দেহে ঝগড়া করছে। এগিয়ে গেল কিশোর। 'কি হয়েছে?'

'কিছু না। শুঁটকির যা কাজ, দুর্গন্ধ ছড়ানো…' ফুঁসে উঠল জিনা।

খিকখিক করে হাসল টেরি। 'সবগুলোর এক স্বভাব, অহেতুক রেগে ওঠা। এই যে আমাকে এত বাজে কথা বলো, রাগি কখনও?'

'মরা মাছ রাগবে কি?'

হাসি এতটুকু মলিন হলো না টেরির। 'বড় গোয়েন্দাদের সঙ্গে তুলনা করলে কেন যে এত খেপো তোমরা, বুঝি না…'

'কি হয়েছে?' গম্ভীর মুখে জানতে চাইল কিশোর।

'কিছু না,' মাথা নাড়ল টেরি। 'আমি শুধু ওকে বললাম, আগাথা ক্রিস্টির বিখ্যাত মহিলা গোয়েন্দা মিস ম্যাপল তো বসে বসেই অনেক ধাঁধা আর

রহস্যের সমাধান করে দেয়। তুমিও তো নিজেকে গোয়েন্দা বলে জাহির করো। একটা ধাঁধা বলি, বলো তো কি হবে? প্রথমে রাজি হলো। কিন্তু যেই ধাঁধাটা বললাম, অমনি রেগে উঠল...'

'নিশ্চয় কোন শয়তানি করেছ!'

'মোটেও শয়তানি করিনি,' নিরীহ মুখভঙ্গি করে বলল টেরি। 'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না।'

জিনার দিকে তাকাল একবার কিশোর। টেরির দিকে ফিরল, 'ধাঁধাটা কি?'

আবার দাঁত বের করে হাসল টেরি। 'একটা পুরানো ছড়া বললাম। জিনা, ঘিনা, জিনার মুখে ছাই, দাঁড়কাকে ঠুকরে দিলে আর রক্ষা নাই!—এই ছড়াটা কে ওকে রাগানোর জন্যে বলেছিল, কবে?'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। শাসিয়ে বলল, 'দেখো, টেরি, তুমি জিনাকে খেপানোর জন্যে ইচ্ছে করে ছড়াটা বলেছ। কার কাছে, কিভাবে তুমি জানলে এটা জিজ্ঞেস করতে চাই না। ওসব ছেলেমানুষী করার বয়েসও নেই আমাদের। আর এখন তো সময়ই নেই। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর যদি এরকম করো, আমি স্যারের কাছে রিপোর্ট করব।' জিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমিই বা এসব কথায় খেপ কেন? খেপ বলেই তো খেপায়।'

ঝাঝিয়ে উঠতে যাচ্ছিল জিনা। সামলে নিল। হাত সরাল কোমর থেকে। শীতল কণ্ঠে বলল, 'না, আর খেপব না। তবে এরপর যদি আমাকে রাগাতে আসে...' কি করবে কথাটা আর ফাঁস করল না সে। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে বলল, 'মরুকগে ও!...তা প্লেনের খবর কি? কখন আসছে?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'ভাল না। মনে হয় কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। প্লেনের মধ্যে গোলাগুলি চলেছে। নিজের রাস্তা থেকে সরে গেছে প্লেনটা। রেডিও হাউজ থেকে রবিন বলে বলে ওটাকে ঠিক পথে আনার চেষ্টা করছে। জিনা, তুমি ওখানে চলে যাও। তোমার সাহায্যের দরকার হতে পারে ওর। অনেকক্ষণ থেকে ডিউটি করছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।' টেরিয়ারের দিকে তাকাল সে। 'টেরি, তোমারও কাজ আছে। ফার্স্ট এইড রেডি রাখতে হবে। স্ট্রেচার, ওষুধ, ব্যান্ডেজ বের করে রাখো। জখমী লোক তো বটেই, কে জানে, প্লেন থেকে পাগল-টাগলও নামানো লাগতে পারে।'

রেডিও হাউজের দিকে চলে গেল জিনা।

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল টেরি। মুখ দেখে মনে হলো বলে দেবে, 'পারব না! তুমি হুকুম করার কে?' কিন্তু বলল না। দ্বিধা করল একবার। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রওনা হয়ে গেল গুদামের দিকে।

তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু সে, এখনও শত্রুই রয়ে গেছে। সুযোগ পেলেই খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করে। তবে ওদের কোন ক্ষতি করতে পারছে না ডক্টর বেঞ্জামিনের ভয়ে। দ্বীপে নামার পর যার যার কাজ ঠিক করে দিয়েছেন তিনি।

দায়িত্ব পালনে কেউ গাফিলতি করলে কিংবা ভুল করলে এই নির্জন মেরু অঞ্চলে বেঘোরে মরতে হবে, একথাটা বুঝিয়ে দিয়েছেন ভালমত। কিশোরের যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের ডান হাত বানিয়েছেন তাকে, সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। প্রথম প্রথম মেনে নিতে চায়নি টেরি, বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছেন ডক্টর বেঞ্জামিন। এখন তিনি থাকেন তাঁর গবেষণা নিয়ে। দ্বীপের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দায়িত্ব পালন করে কিশোর।

যাই হোক, টেরিকে হাতের কাছে পেয়ে যাওয়ায় সময় বাঁচল। তাকে গুদামে পাঠিয়ে দিয়ে আবার রেডিও হাউজে ফিরে চলল কিশোর। ঘরে ঢুকে দেখল বিমানটার উদ্দেশে চেঁচিয়ে চলেছে রবিন, 'কি ব্যাপার, ক্যাপ্টেন, কিছু বুঝতে পারছেন না নাকি? আফ্রিকার দিকে চলে যাচ্ছেন তো! বাঁ দিকে ঘুরুন…বাঁ দিকে!'

কিশোরের দিকে ফিরে তাকাল সে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'শিওর, পাইলটের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একটু আগে শুধু শুধু চক্কর মারছিল। তারপর সোজা চলতে শুরু করেছে পশ্চিমে।'

জিনার দিকে তাকাল কিশোর। 'জিনা, রবিনকে একটু রিলিফ দাও।'

মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে বলতে শুরু করল জিনা, 'আইস রিসার্চ! আইস রিসার্চ! গাউ আইল্যান্ড থেকে বলছি। আমাদের রেডারে দেখছি আপনারা দ্বীপের দিকে না এসে অন্য দিকে সরে যাচ্ছেন। কম্পাস খারাপ নাকি? যাই হয়ে থাকুক, আমরা যেভাবে বলব সেভাবে এসে দেখুন, ঠিক জায়গায় নামতে পারবেন। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

রেডিওতে জবাব এল না। তবে রেডারের পর্দায় বিন্দুটাকে সরতে দেখা গেল। কয়েক সেকেন্ড দেখে বলে উঠল জিনা, 'হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে, ঠিক পথে এগোচ্ছেন এবার। আসতে থাকুন।'

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার বাইরে এসে দাঁড়াল কিশোর। দক্ষিণ আকাশের দিকে তাকাল। বিমানের কোন চিহ্ন নেই। দ্বীপের শেষ মাথার আকাশে একঝাঁক পাখি উড়ছে।

দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। ওর এখন অনেক কাজ। বিমানটাতে কি ঘটেছে জানা নেই। নামার পর যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আগুন লাগতে পারে। সেজন্যে তৈরি থাকা দরকার।

কেবিনগুলোর দিকে ছুটল সে। এই সকালবেলা শীতের মধ্যে অনেকেই এখনও বিছানা ছাড়েনি। চার-পাঁচটা ছেলেকে ডেকে তুলল কিশোর। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পোশাক পরে বেরিয়ে আসতে বলল। ওরা এলে ওদের নিয়ে গুদামে ছুটল।

যা যা লাগবে সব বের করে এনে আবার তাকাল আকাশের দিকে। বিমানটার কি অবস্থা রেডিও হাউজে গিয়ে দেখে আসার কথা ভাবছে এই সময় পশ্চিম আকাশে বিন্দুর মত দেখা দিল ওটা। বড় হতে লাগল। এগিয়ে আসছে দ্রুত।

দেখতে দেখতে মাথার ওপর চলে এল ওটা। চক্কর দিতে দিতে নিচে

নামছে। বিকট গর্জন। বাইরে যারা রয়েছে, সবার চোখ এখন আকাশের দিকে। খবর পেয়ে গবেষণা ফেলে বেরিয়ে এসেছেন ডক্টর বেঞ্জামিন। তাঁর চোখও আকাশের দিকে।

পাঁচশো ফুট নেমে পুব দিকে নাক ঘোরাল বিমান। শাঁ করে উড়ে চলে গেল প্রায় দৃষ্টিসীমার বাইরে। তারপর আবার ঘুরল। আবার চলে গেল মাথার দিকে। কিছুদূর গিয়ে আবার ঘুরল এদিকে। দেখে মনে হলো হয় পাইলটের মাথা বিগড়ে গেছে, নয়তো দ্বিধায় ভুগছে।

মুসা বলল, 'কিশোর, দমকল নিয়ে তৈরি থাকা উচিত। যা অবস্থা দেখছি, ক্র্যাশল্যান্ড করলেও অবাক হব না।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর।

সব কিছু রেডি করে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

ফিরে আসছে বিমানটা। রানওয়ের ওপরে এসে নাক নিচু করে ফেলল। এবার নামবে মনে হচ্ছে। পেছনের মাল তোলার দরজা খুলে হাঁ হয়ে আছে। চাকাগুলো গোটানো।

সর্বনাশ! খুলছে না কেন এখনও? চাকা জ্যাম হয়ে গেল নাকি?

মাটি ছুঁই ছুঁই করছে বিমান। কিন্তু চাকা খুলছে না। তারপর যে ঘটনাটা ঘটল, বহুদিন ভুলতে পারবে না ওরা। বুকে ঘষে এগোনোর ভয়াবহ ধাতব শব্দ, ধুলোর ঝড় আর আরও নানা রকম বিদঘুটে শব্দ তুলে কিছুদূর ছুটে গেল বিমানটা। কাত হয়ে উল্টে যেতে যেতে সোজা হলো। এঁকেবেঁকে পিছলে গেল আরও কিছুদূর। তারপর থামল। ধুলোর ঝড়ে ডুবে রইল।

দমকলের গাড়ি নিয়ে ছুটল মুসা। আগুন ধরছে না বিমানে। এতক্ষণে ধরে যাওয়ার কথা। ট্যাংকে বোধহয় তেল নেই। এরকম কোন অঘটন ঘটতে পারে এটা হয়তো আগেই আঁচ করে নিয়েছেন ক্যাপ্টেন, নামার আগে সব তেল ফেলে দিয়ে এসেছেন সাগরে। কিংবা অহেতুক উড়ে উড়ে তেল পুড়িয়ে এসেছেন।

বিমানের এঞ্জিন থেমে গেছে। আরও কিছুটা এগোনোর পর একটা গুলির শব্দ শোনা গেল।

আগুন ধরল না বিমানটাতে। ধরবে না নিশ্চিত হওয়ার পর দলবল নিয়ে তাতে উঠে পড়ল কিশোর। প্রথমেই উঁকি দিল পাইলটের কেবিনে। চমকে গেল। সীটে বসে আছেন পাইলট। মাথাটা ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। একপাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

এগিয়ে গেল সে। পাইলটের পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা পিস্তল। মাথার রক্তাক্ত ক্ষতটার দিকে তাকাল আবার সে। আত্মহত্যা করেছেন? নাকি খুন করেছে তাঁকে কেউ?

কিন্তু অনুসন্ধানে মনে হলো, আত্মহত্যাই করেছেন তিনি। কারণ বিমানে কাউকে পাওয়া গেল না যে গুলি করে মারতে পারে। পাইলট বাদে আর কোন লোকই নেই ভেতরে, এমনকি কোন লাশও নেই। নয়জন লোক বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। বিমানের দেয়ালে বিভিন্ন জায়গায় আটটা গুলির

ফুটো পাওয়া গেল। গুলিতে নষ্ট হয়ে গেছে অয়্যারলেস সেট। পাইলটের হেডফোনটা শুধু কাজ করছে, তা-ও কেবল শ্রবণযন্ত্রটা ঠিক আছে, প্রেরকযন্ত্রটা বাতিল।

কি করে ঘটল এই ঘটনা, তার কোন জবাব পাওয়া গেল না। অনুমানও করা গেল না কিছু। অদ্ভুত এক রহস্য।

দুই

মন্থরগতিতে গড়িয়ে চলল দিনটা।

বিমান দুর্ঘটনা, সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেনের অপমৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই গভীর দাগ কেটেছে ছেলেমেয়েদের মনে। জনাকীর্ণ শহরে হলে কোন লাশের দিকে হয়তো তেমন করে তাকাত না ওরা। কিন্তু সভ্যজগৎ থেকে বহুদূরে একটা দ্বীপ, যেখানে অধিবাসী বলতে উনিশজন মানুষ—তাদের মধ্যে আঠারোজনই কিশোর, চারটে কুকুর আর কিছু পাখি, সেখানে এরকম একটা লাশের উপস্থিতি রীতিমত পীড়াদায়ক।

লাশটা বিমান থেকে নামিয়ে গুদামে নিয়ে রাখা হয়েছে। সেটাকে ঘিরে সবার মনেই নানা প্রশ্ন। কি ঘটেছিল বিমানে? কি করে উধাও হয়ে গেল নয়জন মানুষ? একসঙ্গে সবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আর খোলা দরজা দিয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না।

রেডিওতে বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে খবর পাঠানো হয়েছে ভ্যালপারাইসোতে। ওখানকার কর্তাব্যক্তিরাও কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবছে গাউ আইল্যান্ডের নির্জনতা সহ্য করতে পারেনি কিশোর রেডিওম্যান, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। উল্টোপাল্টা খবর পাঠাচ্ছে তাই।

কোন্ নিরুদ্দেশ থেকে এসে মাতাল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে দ্বীপের ওপর দিয়ে। সমুদ্র ছুটে আসছে কোন সে দূরের পথ পেরিয়ে। ডানার শব্দ তুলে পাহাড়ের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে সামুদ্রিক পাখির দল। কর্কশ স্বরে চিৎকার করছে অনবরত। বাতাসে ঢেউয়ের গর্জন। মাথার ওপর ম্লান আকাশ, ধূসর গাঢ় ছায়া ফেলেছে সাগরের বুকে।

রানওয়ের মাঝামাঝি জায়গায় ডানা ছড়িয়ে পড়ে আছে বিধ্বস্ত বিমানটা। ওটার স্টোরে মালপত্রের একটা তালিকা পাওয়া গেছে। কিশোর আর তার কয়েকজন সহকারী সেখানে পাওয়া সমস্ত মালপত্র নামিয়ে রাখছে বিমান থেকে। কর্তৃপক্ষ এলে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে সেসব জিনিস। ঠিকমত দিতে না পারলে কৈফিয়ত দিতে হতে পারে। ঝুঁকির মধ্যে গেলেন না ডক্টর। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিলিয়ে নিচ্ছেন যাতে কোন ভুল না হয়। বিমানের দরজার কাছে নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। একেকটা করে মাল নামানো হচ্ছে, আর তালিকায় দাগ দিচ্ছেন তিনি।

'বিজ্ঞান পরিষদের ঠিকানা লেখা তিন বাক্স কাগজপত্র, না?' তালিকা

থেকে মুখ তুলে বাক্সগুলোর দিকে তাকালেন তিনি। 'পেয়েছ। গুড। এরপর আছে খাঁচায় ভরা পাঁচটা পেঙ্গুইন। কোথায় ওগুলো?...পাওনি এখনও? ঠিক আছে, পেলে নামিয়ে এনো।... এরপর আছে চটে মোড়ানো বারোটা গাছ।...কয়টা পেয়েছ?'

'এগারোটা, স্যার,' জবাব দিল দরজায় দাঁড়ানো কিশোর। 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার, গাছগুলো সব স্টোর-রুমে থাকার কথা। কিন্তু পড়ে আছে সারা প্লেনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দেখে মনে হয় কেউ বের করে নেয়ার চেষ্টা করেছিল। তাড়াহুড়োর মধ্যে পারেনি। বাধ্য হয়ে ফেলে রেখে গেছে।'

'তাই নাকি?' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন, 'হুঁ! রহস্যটা বেশ জটিলই।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'ভালই তো হলো। একঘেয়েমী কাটল তোমার। সমাধানের জন্যে সাংঘাতিক একটা রহস্য পেয়ে গেলে।...কিন্তু আরেকটা গাছ গেল কোথায়? খোঁজো, খোঁজো, ভাল করে খুঁজতে বলো। নিশ্চয় আছে কোনখানে।'

গাছগুলো নামাতে গিয়ে দেখা গেল চটও ছিঁড়ে গেছে কয়েকটার। আগাগোড়া চট মুড়ে সেলাই করা হয়েছিল। গোড়া আর মাথার কাছের সেলাই ছিঁড়ে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে গোড়া আর মাথার দিকটা। কিশোরের গোয়েন্দা-মন সতর্ক হয়ে উঠল। আনমনে বিড়বিড় করল, 'এভাবে ছিঁড়ল কি করে? দেখে তো মনে হচ্ছে টেনে টেনে সেলাইগুলো ছিঁড়েছে কেউ...'

ডক্টর বেঞ্জামিনের কথায় ফিরে এল ভাবনার জগৎ থেকে। 'আরে এত তাড়াহুড়ো করছ কেন! সাবধানে নামাও। নষ্ট করবে তো এত দামী নমুনাগুলো! যে সে গাছ নয় এগুলো, বুঝেছ? ওঅর্ম-লেকে যে কি করে টিকে আছে এখনও সেটাই বুঝতে পারছি না! বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে এই গাছ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে...কিন্তু...' ছেঁড়া চটের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন, 'ছিঁড়ল কি করে?'

'জানি না, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'এই অবস্থায়ই পেয়েছি।'

'ও। যে ভাবে আছে রেখে দাও। পরে দরকার হলে নতুন করে মোড়ানো যাবে।'

মোড়ক ছেঁড়া একটা গাছ বাইরে বের করে মাটিতে নামিয়ে রাখলে সেটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর। ফুট ছয়েক লম্বা হবে গাছটা। বেশ মোটা কাণ্ড। গোড়ায় লম্বা লম্বা শেকড়। শুঁয়াপোকার লোমের মত লোম। মাথাটা অদ্ভুত। সাধারণ গাছের মত নয়। শীতের পাতাঝরা ডালের মত পাতাশূন্য, আঁকাবাঁকা, অনেকটা শেকড়গুলোরই প্রতিচ্ছবি। সেই ডালগুলোতে অনেকটা কলার মোচার মত, আকারে ছোট একধরনের গোটা। ফলও বলা যেতে পারে। শেকড়ের মতই রোমশ।

প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদের জ্যান্ত নমুনা চোখের সামনে দেখে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। গাছগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছেটা আপাতত দমন করলেন অনেক কষ্টে। পরে হবে। এখন সময় নেই।

মেরু অঞ্চলে গবেষণার মূল্যবান দলিল আর ফাইলভরা আরও কয়েকটা

বাক্স পাওয়া গেল। পেঙ্গুইনের খাঁচাগুলোও আছে। চারটে খাঁচা ঠিক আছে, কিন্তু একটা খাঁচা ভাঙা। ভেতরের পাখিটা নেই।

'গেল কোথায়?' ডক্টর বললেন। 'কোনও মালপত্রের মধ্যে ঢুকে বসে আছে হয়তো। দেখো ভাল করে খুঁজে···হ্যাঁ, এরপর কি? ব্যাক্তিগত মালপত্র নাকি?'

নয়জন উধাও হয়ে যাওয়া বিমানযাত্রী আর মৃত পাইলটের মালপত্রও সব ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে আসা হলো। নামানোর মত আর কিছু পাওয়া গেল না।

পাহাড়ের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তবু কপালে ঘাম জমেছে ডক্টর বেঞ্জামিনের। হাত দিয়ে মুছে নিলেন। 'তাহলে একটা গাছ আর একটা পেঙ্গুইন পাওয়া গেল না, তাই না?' আনমনে বিড়বিড় করলেন, 'প্লেনের মানুষগুলোর মতই গায়েব!' মুখ তুলে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যাক, একটা জরুরী কাজ শেষ হলো। বড় কাজটাই বাকি এখনও।' রানওয়ে জুড়ে পড়ে থাকা বিমানটা দেখিয়ে বললেন তিনি, 'এটাকে সরাতে না পারলে ভ্যালপারাইসো থেকেই আসুক, কিংবা যেখান থেকেই আসুক, কোন প্লেনই আর নামতে পারবে না।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। 'কাল সকাল থেকেই মুসাকে লাগিয়ে দিতে হবে। দলবল নিয়ে কাজে লেগে পড়বে ও।'

'হুঁ,' পাহাড়টার দিকে তাকালেন একবার বেঞ্জামিন। তারপর আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'প্লেনের মধ্যে কোথাও রক্ত-টক্ত দেখেছ?'

ভুরু কুঁচকে তাঁর দিকে তাকাল কিশোর। মাথা নেড়ে বলল, 'না। শুধু পাইলটের কেবিনে। ক্যাপ্টেনের নিজের রক্ত। কেন, স্যার?'

'আর কেউ খুন হলো কিনা বুঝতে চাইছিলাম। গোলাগুলি তো অনেক হয়েছে···' হাত নেড়ে ভাবনাটাকে উড়িয়ে দিলেন ডক্টর। 'আচ্ছা, পেঙ্গুইনগুলোকে নিয়ে কি করা যায় বলো তো? খাঁচার মধ্যে বেশিক্ষণ রাখা ঠিক নয়। এ রকম বদ্ধ জায়গায় থাকার তো অভ্যাস নেই, অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া গাছগুলো নিয়েও আমার ভাবনা হচ্ছে। আগ্নেয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। ওখানকার মাটি অনেকটা আমাদের এই দ্বীপে উষ্ণ জলের যে ঝর্নাটা আছে, তার মত। প্লেনে তোলার সময় নিশ্চয় ভাবা হয়েছিল বেশিক্ষণ তো আর বস্তাবন্দি থাকবে না, জায়গায় পৌঁছেই মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। এভাবে যে প্লেনসহ আটকা পড়বে, কল্পনাও করতে পারেনি নিশ্চয়। শেকড় উপড়ানো অবস্থায় এভাবে ফেলে রাখলে কতক্ষণ বাঁচবে গাছগুলো, বলা যায় না।'

'ছেড়ে দিলে পেঙ্গুইনগুলোকে ধরা আবার মুশকিল হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'বরং একটা খোঁয়াড় বানিয়ে তাতে ভরে রাখতে পারি। আর গাছগুলোকে আপনি যা করতে বলবেন তাই করব।'

'এক কাজ করা যায়। মাটি যেহেতু এক রকম, ঝর্নাটার কাছে পুঁতে দিতে পারি। মাটি থেকে রস খেয়ে বেঁচে থাকুক যতদিন ওগুলোকে নেয়ার

ব্যবস্থা না করা যায়। বিজ্ঞান পরিষদের কাছে এ ব্যাপারে আমি অনুমতি চাইব। ওরা না করবে বলে মনে হয় না।'

রেডিও হাউজ থেকে বেরিয়ে এল জিনা। ওর দিকে তাকাল কিশোর, 'রবিন কোথায়?'

'রেডিওর সামনে।'

'আর কোন খবর আছে?'

মাথা নাড়ল জিনা। 'না।'

বিমানটা দেখাল কিশোর। 'ভেতরে আরেকবার দেখব ভালমত। রহস্যটার সমাধান না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। ইচ্ছে করলে আসতে পারো। নোটবুক আর কলম আছে?'

পকেটে চাপড় দিল জিনা। হেসে বলল, 'রেডিওম্যানের কাজ করে এলাম। থাকবে না মানে?'

তালিকাটা পকেটে ভরে রাখতে রাখতে ডক্টর বেঞ্জামিন বললেন, 'ঠিক আছে তোমরা যাও। আমার তো নিশ্চয় আর কোন কাজ নেই এখানে?'

কিশোর বলল, 'না, নেই।'

'তাহলে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। আমি যাই।' ল্যাবরেটরির দিকে রওনা হয়ে গেলেন ডক্টর।

মুসা আর তার কয়েক সঙ্গী মিলে বিমান থেকে নামানো জিনিসপত্রগুলো গুদামে নেয়া শুরু করল। সেগুলোর দিকে একপলক তাকাল আবার কিশোর। কাগজ আর ফাইল ভরা একটা বাক্সের কোণা ভেঙে গেছে। পেঙ্গুইনের খালি খাঁচাটা দোমড়ানো। ভেতরে কয়েকটা পালক পড়ে আছে। ছেঁড়া বস্তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে বামন গাছটার কয়েকটা রোমশ শেকড়।

বিমানে ওঠার জন্যে জিনাকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল কিশোর। এই সময় রেডিও হাউজের দরজায় বেরিয়ে এল রবিন। চিৎকার করে ডেকে বলল, 'কিশোর, একদল মেকানিক প্লেনে করে ভ্যালপারাইসো হয়ে এখানে আসছে।'

'আসতে মানা করে দাও। বলো, আমরা না বলা পর্যন্ত যেন না আসে। নামতে পারবে না।'

'আচ্ছা,' ভেতরে চলে গেল রবিন।

সিঁড়ি বেয়ে দরজায় উঠল কিশোর। ঢুকতে যাবে, এই সময় চেঁচামেচি শুরু করল খাঁচায় বন্দি পেঙ্গুইনগুলো। ফিরে তাকাল সে। গুদামে নেয়ার জন্যে ওগুলোকে তোলাতে চেঁচানো শুরু করেছে।

চারটে পেঙ্গুইন! আরেকটা কোথায়? একটা গাছই বা কম কেন? হঠাৎ করেই মাথায় এল ভাবনাটা—বিমানের নয়জন যাত্রী গায়েব হওয়ার সঙ্গে একটা পেঙ্গুইন আর একটা গাছ উধাও হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই তো?

তিন

বিমানের স্টোর রুমটা পাইলটের কেবিনের পেছনে। সেদিকে এগোল কিশোর। একদিকে হেলে কাত হয়ে আছে বিমানটা। পেটের কাছে মাল নামানোর চৌকোনা গর্তটা খোলা। পাল্লাটা ঝুলে রয়েছে। বাইরের আলো আসছে ওই গর্ত দিয়ে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস।

বিমানের ভেতরে প্রচুর জায়গা। মাল আর যাত্রী দুটোই বহন করার মত যথেষ্ট বড়। মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার। এখানে ওখানে কেবল দু'এক টুকরো গাছের বাকল পড়ে আছে। এই পরিচ্ছন্নতার মাঝে ঝট করে চোখে পড়ে। পড়ল কি করে এগুলো? নিশ্চয় বিমানে গাছগুলো তোলার সময়। কিন্তু তাই বা কি করে পড়বে? চটে মোড়ানো রয়েছে ওগুলোর কাণ্ড। যে ভাবেই হোক পড়েছে, ভেবে, আপাতত ভুলে গেল ছালগুলোর কথা।

পেঙ্গুইনের খাঁচার আশেপাশে কিছু বাতিল জিনিস ছড়িয়ে আছে। কোনটাই কাজের নয়। সেজন্যে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়নি। বিমানটা ক্র্যাশল্যান্ড করার সময় ঝাঁকুনিতে ওগুলো পড়ে গিয়েছে সম্ভবত।

আগুন লাগল না কেন, সেটা জানতে গিয়ে দেখা গেল ট্যাংক একদম খালি। সাগরে ফেলা হয়নি। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ ধরে অহেতুক ঘোরাঘুরির ফলেই শেষ হয়ে গেছে তেল। মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি ক্যাপ্টেনের? নাকি বুঝতে পেরেছিলেন ক্র্যাশল্যান্ড করতে হবে, সেজন্যে ইচ্ছে করেই তেল পুড়িয়ে শেষ করেছেন? প্রশ্নটার জবাব জানা গেলে হয়তো রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেত।

গুলির ফুটোগুলো আরেকবার ভালমত দেখল সে। যাত্রীদের কেবিন আর পাইলটের ককপিটের দেয়ালে লেগেছে মোট সাতটা, আর একটা লেগেছে রেডিওতে। নষ্ট করে দিয়েছে রেডিওর প্রেরক যন্ত্রটা। রক্তের কোন চিহ্ন নেই। তারমানে গুলিও কারও গায়ে লাগেনি। কিন্তু কে, কাকে গুলি করল? আর ক্যাপ্টেনই বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন কেন?

আপাতত আর কিছু দেখার নেই এখানে। জিনাকে নিয়ে নিচে নেমে এল কিশোর।

মালপত্রগুলো সরানো শেষ হয়নি এখনও। মুসাকে ইশারায় ডাকল কিশোর। মুসা এগিয়ে এল ওর দিকে। বর্তমানে দ্বীপের অস্থায়ী চীফ এঞ্জিনিয়ার সে। সহকারী নিয়েছে ডোনাল্ড নামে হাসিখুশি একটা ছেলেকে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'প্লেনটা কিভাবে সরাবে কিছু ভেবেছ? কত তাড়াতাড়ি পারবে মনে করো?'

'সময় লাগবে।' বিমানটার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

চুপ করে শোনার অপেক্ষায় রইল কিশোর।

মুসা বলল আবার, 'খুব মজবুত করে বানানো প্লেনটা। নইলে এ রকম

ধকল সয়ে আস্ত থাকতে পারত না। চাকাগুলো সোজা করা গেলে টেনে সরানো যাবে হয়তো। জ্যাক লাগিয়ে উঁচু করার চেষ্টা করব। তারপর চাকা সোজা করব।'

'ওড়ানো যাবে আবার?'

'দেখি। যথাসাধ্য চেষ্টা তো করবই।'

বিমানটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ডানা দুটো অক্ষত। একটা প্রপেলার ভেঙেছে গুদামে অন্য বিমানের একটা প্রপেলার পড়ে আছে। সেটা লাগানো যেতে পারে। কুমেরুর মত দুর্গম অঞ্চলে অভিযানে পাঠানোর জন্যে তৈরি হয়েছে এটা। সুতরাং মজবুত করে তো বানাবেই।

'দেখো ভালমত,' মুসাকে বলল কিশোর। 'হিসেব করো। তারপর আমাকে জানিয়ো কবে নাগাদ সরাতে পারবে। তোমার জবাব শুনে তারপর ভ্যালপারাইসোকে জানাব।'

থুক করে থুথু ফেলল মুসা। 'প্লেনে কি দেখে এলে? পাইলট কেন আত্মহত্যা করল কিছু বুঝেছ?'

'নাহ্। কারণটা জানা গেলে অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতাম। ভাবছি, লাশটা একবার দেখে আসব।'

জিনাকে বিদায় করে দিয়ে গুদামের দিকে এগোল কিশোর। ভাবতে ভাবতে চলেছে। কি দেখে অমন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল বিমানের যাত্রীরা? কাকে গুলি করতে চেয়েছিল? এতগুলো লোক গায়েব হলো কি করে? অন্য কোন আকাশযান মধ্য আকাশে একটা বিমানকে আক্রমণ করে তাতে ঢুকে সবাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে, এটা বিশ্বাস করা যায় না। অন্য কিছু ঘটেছে। সেটা কি?

গুদামের একধারে তক্তার ওপর চিত করে শুইয়ে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে লাশটা। কাপড় তুলে দেখতে লাগল কিশোর। মাথার একপাশে গুলির ছোট একটা ফুটো। কয়েক ফোঁটা রক্ত লেগে আছে। পকেটগুলো হাতড়ে দেখল সে। কিছু জরুরী কাগজপত্র, কলম, চাবির গোছা, মানিব্যাগ, চিরুনি ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। রহস্যের সমাধান করার মত কোন সূত্র নেই।

লাশটা আবার আগের মত ঢেকে দিয়ে দরজায় বেরিয়ে এল সে। বিশাল টিনের ছাউনিটার গায়ে মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন দামাল হাওয়া।

ঘরঘর আওয়াজ কানে এল। লোহার ঠেলাগাড়ির চাকার শব্দ। বিমান থেকে নামানো মালপত্রগুলো বয়ে আনা হচ্ছে গুদামে রাখার জন্যে।

কিশোর বাইরে বেরোতেই কোথা থেকে ছুটে এল চারটে কুকুরের একটা। ওকে দেখে এগিয়ে এসে লেজ নাড়তে লাগল। আদর করে ওটার মাথা চাপড়ে দিল সে। ওর সঙ্গে এগিয়ে গেল ঘাঁটির অফিস পর্যন্ত। দরজার কাছ থেকে ওটাকে বিদায় করে দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

খটাখট টাইপ করে চলেছে জিনা। বিমান দুর্ঘটনার একটা প্রতিবেদন তৈরি করছে, ভ্যালপারাইসোর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর জন্যে।

কিশোরের সাড়া পেয়ে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল সে।

চার

টেরিয়ার এসে ঢুকল ঘরে। উত্তেজিত।

ভুরু নাচাল কিশোর, 'কি ব্যাপার?'

'রহস্যটার সমাধান আমি করে ফেলেছি!'

'কোন রহস্য?'

'প্লেনের মধ্যে যা ঘটেছিল।'

'তাই নাকি?'

'হ্যা।' একটা চেয়ার টেনে কিশোরের মুখোমুখি বসল টেরি। 'শুনতে চাও?'

'বলো, শুনি,' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে অসংখ্য প্লেন আর জাহাজ রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশ থেকেও বহু প্লেন নিখোঁজ হয়েছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্লেন সার্ভিস শুরু হওয়ার পর। এর কোন সঠিক জবাব কেউ দিতে পারেনি। কারও কারও ধারণা বেশি নিচু দিয়ে ওড়ার সময় লাফিয়ে ওঠা ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে পানিতে পড়ে গিয়েছিল প্লেনগুলো...'

'এসব কথা জানি আমি।'

'জানো বলেই তো বলছি। মাস দুয়েক আগেও প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর থেকে...'

'একটা যাত্রীবাহী বিমান হারিয়ে যায়,' টেরির কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। 'হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিমানটার। সার্চ পার্টির লোকেরা কতগুলো লাইফবেল্ট খুঁজে পায়। কিন্তু কোন মানুষ পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা খুব রহস্যময়।'

'ঠিক,' আঙুল তুলল টেরি। 'আমাদের এই প্লেনটাও সেরকমই কোন দুর্ঘটনায় পড়ে উধাও হতে হতে বেঁচে যায়। প্রাণ বাঁচিয়ে কোনমতে পাইলট এসে ল্যান্ড করে। এখন আমাদের প্রশ্ন, আকাশে কি দেখে এত ভয় পেয়েছিল লোকগুলো?'

'তুমিই বলো?'

'এমন কোন কিছুকে প্লেন আক্রমণ করতে দেখেছে ওরা, যে ভয়ে দিশেহারা হয়ে গুলি চালাতে শুরু করে। লোকগুলোকে হয় ঠেলে বাইরে ফেলে দিয়েছে ওটা, নয়তো আর কোন উপায় না দেখে নিজেরাই পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে। ওটা এতই ভয়ঙ্কর, বিমানে থাকার চেয়ে সাগরের উত্তাল পানিকেই বরং নিরাপদ মনে করেছিল যাত্রীরা। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যায় পাইলট। নিচে নেমে পিস্তলের গুলিতে শেষ করে দেয়

নিজেকে।'

রকি বীচে হলে এসব কথার অন্য রকম জবাব দিত কিশোর। কিন্তু এখানে সে একটা বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত। টেরির প্রলাপকেও সহ্য করে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, 'তোমার কি ধারণা সিন্দবাদের রকপাখির মত কোন বিশাল পাখি প্লেনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে?'

গম্ভীর হয়ে গেল টেরি। 'না, রক পাখির কথা আমি বলছি না। আরব্য উপন্যাসের কোন গল্পকেই আমি সত্যি বলে মনে করি না। আমি বলছি বর্তমানের কথা। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের কথা বাদই দিলাম। আমাদের চোখের সামনেই একটা প্লেন পড়ে আছে এখন। নয়জন যাত্রী রহস্যজনকভাবে গায়েব। কিছু একটা না ঘটলে ওরা গায়েব হত না। আমি বলতে চাইছি, রক পাখি না হলেও আকাশে এমন কোন জানোয়ার আক্রমণ করেছিল প্লেনটাকে, যেটা আমাদের অচেনা। মানুষগুলোকে খেয়ে চলে গেছে। একটা পেঙ্গুইন আর গাছকেও সাবাড় করে দিয়ে গেছে। তারমানে প্রাণীটা সর্বভুক।'

'পৃথিবীতে এমন কোন জানোয়ার বা পাখি আছে বলে জানা নেই বিজ্ঞানীদের। তোমার কি ধারণা মহাকাশ থেকে এসেছে ওটা?'

ভুরু কোঁচকাল টেরি। 'ঠাট্টা করছ? তা করো। তবে আমার যুক্তি থেকে আমি নড়ছি না। কোত্থেকে এসেছিল ওটা বলতে পারব না। তবে এসেছিল। আজকের ঘটনাটা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আমার সন্দেহ, মানুষ খেয়ে মানুষখেকো বাঘের মত লোভী হয়ে উঠবে ওটা। দ্বীপে এসে হামলা চালালেও অবাক হব না।'

'অবাক হতাম না যদি ওরকম কোন জীবের অস্তিত্বের কথা আমাদের জানা থাকত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নেই। তা ছাড়া একটা কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি। তোমার রহস্যময় জীবটা বাইরে থেকে এসে আক্রমণ করেনি। করলে প্লেনে ঢোকার জন্যে দরজা-জানালা ভাঙতে হত, কিংবা প্লেনের পেট ফুটো করে ঢুকতে হত। সেরকম কিছু ঘটেনি। মাল নামানোর দরজাটা খোলা ছিল। কজা ভাঙেনি। কোথাও সামান্যতম আঁচড়ও লাগেনি। পরিষ্কার বোঝা যায় ভেতর থেকে কেউ খুলেছিল ওটা। কোন জিনিস ঠেলে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিংবা অদ্ভুত কোন কারণে পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যার জন্যে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্যাপ্টেন যেমন আত্মহত্যা করেছেন।'

'কি জিনিস ঠেলে ফেলার চেষ্টা করেছিল ওরা? আর সেই অদ্ভুত কারণটা কি?'

'সেটাই জানতে হবে আমাদের।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপচাপ কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল টেরি। তারপর চেয়ারটা পেছনে ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না। কিশোরকে বোঝাতে না পেরেই বোধহয় মুখ কালো করে বেরিয়ে গেল।

টাইপ থামিয়ে টেরি আর কিশোরের কথা শুনছিল এতক্ষণ জিনা। টেরি বেরিয়ে যেতেই বলল, 'যাই বলো, শুঁটকির কথায় কিন্তু যুক্তি আছে। আকাশে যে কোন কিছুর আক্রমণের শিকার হয়েছিল লোকগুলো, তাতে

কোন সন্দেহ নেই।'

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর। তারপর বলল 'সেটা মেনে নিলে আরও একটা কথা মানতে হয়, ভূতে আক্রমণ করেছিল যেটা প্লেনের দেয়াল ভেদ করে অবলীলায় ঢুকে পড়তে পারে, তার জন্যে দরজা-জানালা কোন কিছুর প্রয়োজন পড়ে না···দেখো, এর সহজ কোন ব্যাখ্যা আছে। মুসার ভূত-প্রেত, আর টেরির রক পাখির চিন্তা মাথায় ঢোকালে এই রহস্যের সমাধান করতে পারব না কোনদিন। দেখা যাক, কি হয়!···তোমার লেখাটা শেষ হয়েছে?'

'না। এই আর একটু। সামান্য কয়েক লাইন।' আবার কাজে মন দিল জিনা।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রহস্যটা নিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকল ব্রুক। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। রান্নাঘরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে।

'কি, ব্রুক?' জানতে চাইল কিশোর, 'কোন সমস্যা?'

'রান্নাঘরের কিছু নয়,' জবাব দিল ব্রুক। 'কিশোর, টেরিকে উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। ঝগড়া করল নাকি?'

'ও, এই ব্যাপার,' হেসে ফেলল কিশোর। টেরিকে ভয় পায় সবাই। ওর ঝগড়া করা আর অঘটন ঘটানোর ভয়। 'না, ঝগড়া করেনি। উত্তেজিত হয়েছে অন্য কারণে। প্লেনে কি ঘটেছে, সেই রহস্যের সমাধান করে ফেলে বলতে এসেছিল আমাকে। আমি সেটা মানতে পারিনি বলে বোধহয় রেগে গেছে।'

অবাক হলো ব্রুক। 'ওর কি ধারণা?'

'আকাশচারী কোন দানব আক্রমণ করেছিল প্লেনটাকে। ওটাই সবগুলো মানুষকে ধরে খেয়ে ফেলেছে।'

'এই না হলে শুঁটকির বুদ্ধি,' নাক সিঁটকাল ব্রুক। টেরিকে দুচোখে দেখতে পারে না সে। 'এই রূপকথা বলতে এসেছিল। আর আমি তো ভাবলাম না জানি কি?···ঠিক আছে। যাই।'

নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ব্রুক।

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'একটু ঘুরে আসি।'

'চলো, আমিও যাব।'

'তোমার লেখা শেষ?'

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'ঠিক আছে, এসো।'

'একটু দাঁড়াও। কাগজগুলো গুছিয়ে নিই।'

পাঁচ

চারদিকে তখন উচ্চ অক্ষাংশের দীর্ঘ ধূসর গোধূলি প্রায় নেমে এসেছে। সূর্যাস্তের কোমল আলোও প্রায় বিলীন। পশ্চিম দিগন্তের শেষ সীমানা পর্যন্ত ঘন মেঘের কুটিল স্তব্ধতা। শুধু একদিকে নিষ্কলঙ্ক আকাশ, তাতেও নীলের চিহ্ন নেই। গাঢ় মেঘে আড়াল করা সূর্যের আভায় সেখানকার রঙ লালে লাল। সমুদ্রের গর্জন আগের মতই প্রচণ্ড। তেমনি গম্ভীর আর ক্রুদ্ধ আক্রোশে ভরা।

জিনাকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোল কিশোর। হঠাৎ অস্তগামী সূর্যের মুখ থেকে সরে গেল মেঘের ঢাকনা। বিচিত্র লালচে আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা দ্বীপে। কেমন অপার্থিব রঙ। পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে গেল যেন সেই লালের নেশা। জ্বলজ্বল করছে চূড়াগুলো। বাতাসের সঙ্গে অবিরাম যুঝতে থাকা নুয়ে পড়া পরিশ্রান্ত গাছগুলোও যেন সে আলোর আভায় উৎসবের সাজে সেজে উঠল। দ্বীপের দিকে ছুটে আসা রাক্ষুসে ঢেউগুলোর গায়ে ছলকে উঠছে যেন লাল রঙের আগুন। ঢেউয়ের ছায়াভরা দিকটায় ময়ূর-পাখা রঙের খেলা।

মাছের আশায় ঢেউ ছুঁয়ে উড়তে থাকা পাখির দল বাতাসের দাপটে পাহাড়ের দিকে সরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। বরফের মত হিমেল নোনা পানির কণা ছিটকে এসে গায়ে লাগছে ওগুলোর। চতুর্দিকে শুধু গর্জন আর গর্জন, একটানা, অবিরত। পাখির প্রচণ্ড কর্কশ চিৎকার কিছুই না ওই শব্দের কাছে।

'কিশোর, আমার ভয় করছে,' আচমকা বলে উঠল জিনা। 'যেন অন্য কোন জগতে চলে এসেছি। এতদিন ধরে আছি, কখনও এমন লাগেনি। মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে। ভয়ঙ্কর কিছু।'

জবাব দিল না কিশোর। চুপচাপ তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে। সূর্য এখন দিগন্তের সূক্ষ্ম রেখাটা পেরিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। আবছা হয়ে উঠছে গোধূলির আলো। উজ্জ্বলতা হারিয়ে মলিন হয়ে গেছে বাতাসের গতি-নির্দেশক বেলুনটার রঙ। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে এখন আর কিছুই নেই এখানে, শুধু সমুদ্রের গর্জন ছাড়া।

বাড়িঘরগুলোর এমনিতেই কোন সৌন্দর্য নেই, এখন লাগছে রীতিমত কুৎসিত। গুদামের দিক থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল মুসাকে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ডক্টর বেঞ্জামিন রাতের বেলা ক্যাপ্টেনের লাশটাকে পাহারা দিতে বলেছিলেন। একটা চেয়ার নিয়ে তাই গুদামে বসেছিলাম। ভেতরটা অন্ধকার। আলো জ্বালিনি। হঠাৎ মনে হলো কি যেন নড়ছে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, কে? সাড়া দিল না। এক সেকেন্ড দেরি না করে বেরিয়ে দিলাম দৌড়।'

পুরুষদের ছাউনির একটা জানালায় আলো জ্বলল। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে আলোটা স্পষ্ট। ওই একটা ছাড়া আর কোথাও কোন আলোর চিহ্ন নেই।

'চলো তো দেখি,' বলে গুদামের দিকে পা বাড়াল কিশোর। কিছুদূর এগিয়ে জিনাকে বলল, 'তোমার আসার দরকার নেই। বরং গিয়ে অন্য মেয়েদের একত্র করে বসে বসে পাহারা দাও।'

'কিছু ঘটার আশঙ্কা করছ নাকি?'

'একটু আগে তুমিও তো করছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। কিশোরের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করল না।

মুসাকে বলল কিশোর, 'তোমারও আসার দরকার নেই। সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছ। বিশ্রাম নাওগে। ঘরে যাওয়ার আগে ফিমেল্ল কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে যাও জিনাকে।'

'না না, আমি একাই...' প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল জিনা।

ওকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'যা বলছি, করো।'

দুজনকে বিদায় করে দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল কিশোর। একটা অস্ত্র নেবে কিনা ভাবল। বন্দুক রাখার ঘর আছে। তাতে কিছু পিস্তল-বন্দুক আছে। এখানে যারা কাজ করে, তাদের কারোরই তেমন প্রয়োজন পড়ে না ওগুলো। মেরুভালুক কিংবা অন্য কোন হিংস্র জানোয়ার নেই দ্বীপে। মাঝেসাঝে একঘেয়েমী কাটানোর জন্যে পাখি শিকার করে এখানকার স্থায়ী কর্মচারীদের কেউ কেউ।

আপাতত পিস্তল সঙ্গে নেবার প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। কার সঙ্গে লাগতে যাচ্ছে জানে না। তা ছাড়া মুসার ভুলও হতে পারে।

নিঃশব্দে গুদামের কাছে এসে দাঁড়াল সে। কুমেরুর তুষার-ঘাঁটিগুলোতে সরবরাহের জন্যে প্রয়োজনীয় সব জিনিসই মজুদ থাকে এখানে। জানালা নেই। রাখার দরকার মনে করেনি বলেই রাখেনি। মানুষ-সমান উঁচু দরজাটা খোলা। মুসা খুলে দৌড় দেয়ার সময় বন্ধ করার কথা মনে ছিল না নিশ্চয়।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। একপাশে সুইচ বোর্ড আর ফিউজবক্স, জানা আছে ওর, হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবে। পা রাখল ভেতরে। কান পাতল। বাইরে সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের শব্দ। খুট করে কি যেন পড়ল ঘরের মধ্যে। অন্ধকারে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে কিছু।

ভুল শোনেনি তাহলে মুসা। ভূতের ভয়ে কাবু হয়নি। সত্যি সত্যি আছে কিছু। কানে এল বিচিত্র শব্দ। মাটি ঘষটে ঘষটে এগোনোর মত।

অন্ধকারে একটা বাক্স পড়ে গেল। নাড়া লেগে পড়েছে। গুদামে কি নিশাচর কোন প্রাণী ঢুকে বসে আছে?

বাইরের আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে কোলাহল শোনা গেল। টর্চ হাতে এগিয়ে আসছে কয়েকজন মানুষ। তাদের মধ্যে টেরির গলাও শোনা গেল।

আলোর সুইচটা টিপে দিল কিশোর। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল গুদামের ভেতরটা। দরজা দিয়ে খানিকটা হলদে আলো বাইরে গিয়ে পড়ল। সেখানে এসে দাঁড়াল টেরিসহ চার-পাঁচটা ছেলে। টেরির হাতে পিস্তল। গানর্যাক

থেকে নিয়ে এসেছে।

টেরি বলল, 'মুসার কাছে শুনলাম, এখানে নাকি কিছু আছে। অন্ধকারে শব্দ শুনেছে সে। তোমার দেখতে আসার কথাও বলল।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'আমিও শুনলাম শব্দটা।'

'দেখা দরকার।'

'এসো।'

স্টোরের ভেতর দিকে এগোল কিশোর। এখন একেবারে নিস্তব্ধ, কোন সাড়াশব্দ নেই। চারদিকে নানা জিনিসের বাক্স, বস্তা আর বান্ডিল থরে থরে সাজানো রয়েছে। একপাশে কতগুলো পিপে আর ঝুড়ি। কংক্রীটের মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার। নিয়মিত সব সাফসুতরো করে রাখে দ্বীপের অস্থায়ী অধিবাসীরা।

খানিক আগে এখানেই কিছু একটা নড়ে বেড়াচ্ছিল। বিস্কুটের একটা টিন পড়ে আছে মেঝেতে। যেটা ওখানে থাকার কথা নয়। এর মানে ধাক্কা দিয়ে কিংবা ঠেলে ফেলা হয়েছে। বিমান থেকে নামিয়ে আনা জিনিসগুলো সব রাখা আছে একধারে। গাছগুলোকে ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ। বাকি জিনিসপত্র যেভাবে রেখে যাওয়া হয়েছিল সেভাবেই আছে। আশ্চর্য! বিমানেও এরকম ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এগুলোকে—মনে পড়ল কিশোরের। এই গাছের ওপর কারও লোভ নেই তো? কোন মানুষ? ওঅর্ম-লেক থেকে লুকিয়ে উঠে পড়েছিল বিমানে। গাছগুলোকে দামী ভেবে চুরি করতে চায়। দানব বা অন্য কিছু সেজে ভয় দেখিয়ে পানিতে পড়তে বাধ্য করেছে মানুষগুলোকে, কিংবা রেডিও খারাপ হওয়ার পর ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ক্যাপ্টেনকে গুলি করে মেরেছে। আত্মহত্যার মত করে সাজিয়েছে কেসটা। তারপর দ্বীপের সবার অলক্ষে কোনভাবে নেমে পড়েছে বিমান থেকে। কিংবা এমনও হতে পারে ওদের অচেনা সাংঘাতিক কোন জানোয়ার বিমানে করে চলে এসেছে, ল্যান্ড করার পর মাল নামানোর দরজাটা দিয়ে পালিয়েছে। হতে পারে না এরকম তা নয়, তবে এর মধ্যে অনেকগুলো 'যদি' আর 'কিন্তু' আছে···

সবাই মিলে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল ঘরটা। পড়ে থাকা টিন আর গাছগুলোর ছড়িয়ে থাকা বাদে অস্বাভাবিক অন্য কোন কিছু দেখল না। বড় কোন জানোয়ার তো দূরের কথা, একটা ছুঁচো কিংবা ইঁদুরেরও দেখা মিলল না। কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে কিশোর ঘষটে ঘষটে চলার শব্দ। সারাক্ষণ দরজার কাছেই ছিল সে। কিছুই বেরিয়ে যেতে দেখেনি।

এই সময় আবিষ্কার করল টেরি, ক্যাপ্টেনের লাশটা নেই। যে চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল সেটা কেবল পড়ে আছে তক্তাগুলোর একপাশে।

ছয়

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। নিকষ কালো আকাশ। চাঁদ তো নেইই, তারার

আলোও নেই। সব মেঘে ঢাকা। সমস্ত দ্বীপটাকে যেন মুড়ে রেখেছে অন্ধকারের কালো চাদর। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে আসা ঢেউ ভীমবেগে পাথুরে তীরে আছড়ে পড়ে বজ্রের গর্জন তুলছে। পশ্চিমা বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে শিস কেটে যাচ্ছে কারও করুণ বিলাপের মত।

দ্বীপের একটিমাত্র অংশে কয়েকটা আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। বিনোদন কক্ষের আলো। ভারি অবাস্তব মনে হয় বিন্দুগুলোকে। ওখানে সমবেত হয়েছে ছেলেমেয়েরা সব। রেডিও হাউজ আর কাছাকাছি ছাউনিগুলোতেও আলো জ্বলছে।

বিনোদন কক্ষ থেকে দুটো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। রেডিও হাউজের দিকে এগোল। তিনজনের হাতেই টর্চ। গাউ আইল্যান্ডে আসার পর রাতে চলাচলের সময় আজকের মত এত সতর্ক আর হয়নি।

রেডিও হাউজের কাছে জেনারেটর হাউজ। বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের দাপটে কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘরটা। দুটো জেনারেটর আছে। একটা চলছে এখন। গাউ আইল্যান্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে একটা জেনারেটরই যথেষ্ট। আরেকটা রাখা হয়েছে বাড়তি। যদি কোন কারণে একটা বন্ধ রাখতে হয়, দ্বিতীয়টা চালু করা হয় তখন।

রেডিও হাউজে ঢুকল কিশোর। রেডারের পর্দার সামনে বসে আছে রবিন। তাকে সাহায্য করছে দুটো ছেলে। একজন রেডিও খুলে রেখেছে।

'কোন খবর আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল রবিন। শুকনো হাসি হেসে বলল, 'নাহ্।' রেডিওর সামনে বসা ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল, 'ভ্যালপারাইসো ধরে বসে আছে ও। কিছুক্ষণ থেকে শুধু অর্কেস্ট্রা বাজছে। রেডারের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল আমার। এখন বসে মহাকাশের নানা রকম দানবের চেহারা কল্পনা করছি।'

'করো, করতে থাকো,' হাসিমুখে বলল কিশোর। 'তবে হালকা ভাবে দেখো না ব্যাপারটাকে। রেডারে চোখ রাখো। যা-ই উড়ে আসুক, কিছুই যেন চোখ না এড়ায়। আচ্ছা, পাখিগুলো দ্বীপের যে দিকে থাকে, পর্দায় তো দিনের বেলা সেদিকে ছায়া ছায়া বিন্দু দেখা যায়, তাই না? ঠিক কোনখানে, বলো তো?'

রেডারের পর্দায় আঙুল রেখে দেখাল রবিন, 'এখানে। সকাল আর সন্ধ্যায় তো একেবারে ঢেকে ফেলে। ওগুলোর জন্যে ওই সময় প্লেনের ঝাঁক এলেও দেখে কিছু বোঝা যাবে না। এখন পরিষ্কার, দেখতে পাচ্ছ? তারমানে পাখিগুলো সব মাটিতে নেমে পড়েছে।'

'তারমানে রাতে নজর রাখতে সুবিধে। কোনও দিক দিয়ে কিছু এলে দেখা যাবেই। তাকিয়ে থাকো।'

রেডিওর সামনে বসে আছে যে ছেলেটা, তার নাম নিমর। জিজ্ঞেস করল, 'কি আসবে আশা করছ তুমি, কিশোর?'

'জানি না। এমন কিছু, যেটা ভয়ানক শক্তিশালী। উড়ন্ত প্লেনের মধ্যে নয়জন যাত্রীকে গায়েব করে দিতে পারে। তেমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে আমাকে।'

খানিক আগে গুদামের রহস্যজনক ঘটনাটার কথা রবিনকে জানাল কিশোর।

'সর্বনাশ!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। 'এতদিন তো এমন কোন কিছু দেখা যায়নি এখানে। হঠাৎ করে কোত্থেকে উদয় হলো ওটা?'

'বুঝতে পারছি না।'

'তুমি কি এই অন্ধকারে একা একাই ফিরে যাবে?' জানতে চাইল রবিন।

'না, বাইরে ডিক আর হ্যামার দাঁড়িয়ে আছে। ওদের নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি।'

'কি কাজ?'

'বাড়তি আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে যাতে ক্যাপ্টেনের লাশের মত কাউকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে না পারে ওটা। দরকার হলে দ্বিতীয় জেনারেটরটাও চালু করে দেব।'

'সাবধানে যেয়ো। আমার ভয় করছে।'

'আমারও,' মনে মনে বলল কিশোর। বেরিয়ে এল রেডিও হাউজ থেকে।

ঘরটাকে পেছন করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কড়া নজর রেখেছে ডিক আর হ্যামার। কিশোর বেরোতেই জিজ্ঞেস করল ডিক, 'কিছু দেখেছ?'

'না।'

টর্চ জেলে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। তার দুপাশ ঘেঁষে এগোল অন্য দুজন। ভয় পাচ্ছে তিনজনেই। কিসের কবলে পড়েছে ওরা, যদি জানা থাকত, আক্রমণের ধরন বুঝতে পারত, ভয়টা হয়তো কম লাগত।

চারদিকে নিঃসীম ঘন অন্ধকার। ঢেউয়ের অশান্ত গর্জন। জেনারেটরের মাটি কাঁপানো গুমগুম শব্দ। মাথার ওপর কয়লা-কালো আকাশ। সাঁই সাঁই বয়ে যাওয়া হিমেল বাতাস। তার ওপর অদৃশ্য এক অজানা জীবের আশঙ্কা। ভয় করাটা স্বাভাবিক। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল হ্যামার। আলো ঘুরিয়ে দেখে নিল একপাশ আর পেছনটা। যতটা সম্ভব সতর্ক রয়েছে তিনজনেই। কোনদিক থেকেই যাতে ওদের অলক্ষে এসে আক্রমণ করে বসতে না পারে ওটা।

আগের মতই আলো জ্বলছে গুদামে। ভেতরে ঢুকল কিশোর। পেছনে তার দুই সহকারী। কোন পরিবর্তন নেই। জিনিসপত্র সব তেমনি সাজানো রয়েছে। উল্টে পড়ে আছে টিনটা। কুমেরু থেকে আনা জিনিসের নমুনা, অর্থাৎ গাছগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। জানে বৃথা, তবু একবার ফিরে তাকাল কিশোর—যেন দেখতে পাবে অলৌকিক ভাবে লাশটা আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। কিন্তু আসেনি। সেভাবেই পড়ে রয়েছে শূন্য তক্তা। একপাশে এলোমেলো হয়ে আছে লাশ ঢাকার চাদরটা।

দেরি না করে কাজে লেগে পড়ল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে স্টোরের বাইরে

একটা জোরাল আলো জ্বালার ব্যবস্থা করে ফেলল। গুদাম আর দ্বীপের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিসের সামনের একশো গজ জায়গা আলোকিত করে দিল উজ্জ্বল আলো।

কাজ সেরে বিনোদন কক্ষে ফেরার পথে ভয়টা আর আগের মত রইল না ওদের। আলো এমনই জিনিস। দ্রুত পা চালাতে চালাতে ডিক বলল, 'জানালা দিয়ে তার বের করে আঙিনায় গোটা ছয়েক আর অফিসের বাইরে দু'তিনটা বাল্ব লাগিয়ে দিলেই একেবারে ঝলমল করে উঠবে। কোন জীবেরই সাধ্য থাকবে না আর লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। পাহারা দিলে তখন দেখতে পাবই।'

'পাহারা তো দিতেই হবে,' কিশোর বলল। 'নইলে এই আলো লাগানোর দরকারটা কি?'

'কিন্তু কার বিরুদ্ধে এই পাহারার ব্যবস্থা করছি আমরা?' হ্যামারের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'অন্তত বারোটা সম্ভাবনার কথা মাথায় আসছে আমার,' কিশোর বলল। 'কিন্তু কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না নিজের কাছেই। তোমাদের কি বলব।'

বিনোদন কক্ষের সামনে এসে টোকা দিতে যাবে কিশোর, এই সময় খুলে গেল দরজা। ডক্টর বেঞ্জামিন দাঁড়িয়ে আছেন। 'এত দেরি করলে? আমার তো চিন্তাই হচ্ছিল। দেখতে যাচ্ছিলাম তোমাদের কিছু হলো কিনা।'

'না, ভালই আছি আমরা। রেডিও হাউজে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। তারপর গেলাম গুদামে। আলোর ব্যবস্থা করতে করতে দেরি হয়ে গেল।'

'আলোর ব্যবস্থা তাহলে হলো।'

'হ্যাঁ।'

'চলো, দেখে আসি। আরও একটা কাজ আছে।'

ডক্টর বেঞ্জামিনের সঙ্গে চলল আবার কিশোর। প্রায় জোর করে জিনাও ওদের সঙ্গী হলো। হ্যামার আর ডিক ঢুকে গেল বিনোদন কক্ষে।

হাঁটতে হাঁটতে ডক্টর বেঞ্জামিন বললেন, 'গাছগুলো দেখেছ? কেমন অদ্ভুত না? একটা ডাল কেটে অণুবীক্ষণের নিচে রেখে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'ডাল আনতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

গুদামে ঢুকে গাছগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর। কিশোর পেছনে দাঁড়িয়ে রইল। যে রকম রোমশ আর কুৎসিত দেখতে, বলা যায় না বিষাক্ত হতে পারে। হাতে রবারের দস্তানা পরে সাবধানে চট ছেঁড়া গাছগুলোর মধ্য থেকে একটা ডালের ডগা কেটে নিলেন। ফল ধরলেন না। আগে ডাল পরীক্ষা করবেন। তারপর আগ্রহ লাগলে ফল।

হাতে নিয়ে ডালটা নেড়েচেড়ে দেখছেন ডক্টর, জিনা বলল, 'একটা কথা, স্যার।'

ফিরে তাকালেন তিনি। 'কি?'

'বইতে পড়েছি, বিষুব অঞ্চল থেকে যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে কলা আনা হয়, মাঝে মাঝে সেগুলোর কাঁদির ফাঁকে বিষাক্ত বড় বড় মাকড়সা লুকিয়ে থাকে। গাছ থেকে কেটে নামানোর সময় কিংবা জাহাজে তোলার সময় চোখে পড়ে না ওগুলো। মাঝে মাঝে সাপও চলে আসে কাঁদির সঙ্গে। আমি ভাবছি, এই গাছগুলোর সঙ্গে কোন জীব চলে আসেনি তো ওঅর্ম-লেক থেকে? ওখানে এখন দিন চলছে। প্রাণীটা নিশাচর, তাই গাছের মধ্যে লুকিয়ে থাকার সময় ওটা ঘুমিয়ে ছিল। প্লেনের মধ্যে অন্ধকার পেয়ে জেগে উঠেছে। হতে পারে না ওরকম?'

'কুমেরুতে বিষাক্ত মাকড়সা?'

'না, স্যার, আমি অন্য প্রাণীর কথা বলছি। আমাদের অজানা কোন প্রাণী।'

'গাছের মধ্যে সেটা লুকিয়ে আসতে পারে যদি মাকড়সার মত ছোট কোন জীব হয়। কিন্তু জিনা, ওরকম ছোট হলে যত বিষাক্তই হোক, এত ভয় পেত না কেউ। দেখলে বড়জোর পিষে মারার চেষ্টা করত, গুলি করতে যেত না ওরা। মাল তোলার দরজা খুলে সেটাকে ঠেলে ফেলারও চেষ্টা করত না।' একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন ডক্টর বেঞ্জামিন, 'তা ছাড়া প্লেন থেকে নামানোর পর চটছেঁড়া জায়গাগুলোতে উঁকি দিয়ে দেখেছি আমি। একটা পিঁপড়ে কিংবা মাছির সমান জীবও ছিল না।'

'কিন্তু, স্যার, সেটা যদি গাছের রঙের হয়? যদি ডালপালা কিংবা রোমশ শেকড়গুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে থাকে? চোখ এড়াতেও তো পারে, কি বলেন?'

একটু চিন্তা করে মাথা নাড়লেন ডক্টর, 'তা হয়তো পারে। তবে শেকড়ের সঙ্গে মিশে থাকার মত একটা প্রাণীই আছে, সাপ।'

'কিন্তু সেই সাপটাকেও ছোট হতে হবে,' কিশোর বলল। 'মাকড়সার মতই ওটাকে ফেলার জন্যেও উড়ন্ত প্লেনের দরজা খুলতে যেত না কেউ। পিটিয়ে মারার চেষ্টা করত।'

'যদি বড় কোন সাপ হয়? অজগরের মত?'

'অসম্ভব। অতবড় সাপ গাছের সঙ্গে এক বস্তায় জায়গাই হবে না। বস্তাগুলো যারা প্যাক করেছে তাদের চোখ এড়িয়ে খুব ছোট একটা সাপ হয়তো চলে আসতে পারে, কিন্তু অজগরের মত বড়? ইমপসিবল। তা ছাড়া ঘষটে ঘষটে চলার যে শব্দটা আমি পেয়েছি, সেটা সাপের নয়...'

'তাহলে কিসের?' ভুরু নাচালেন ডক্টর।

'জানি না, স্যার। ওরকম অদ্ভুত শব্দ জীবনেও শুনিনি আমি!'

সাত

সারারাত পালা করে পাহারা দিল কিশোর, মুসা, টেরিয়ার এবং আরও পাঁচ-

ছয়টা ছেলে। মেয়েদের কাউকে থাকতে দিল না। একাও থাকল না কেউ তিনজন করে একসঙ্গে রইল. সেই সঙ্গে রাখল কুকুর। আর অবশ্যই শটগান। কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে গেল না।

নিরাপদেই কাটল রাতটা। নতুন কোন অঘটন ঘটল না। সকালে নাস্তার পর জীবটাকে খুঁজতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো কিশোর। রাতের বেশির ভাগটাই জেগে থেকেছে। ক্লান্ত লাগছে এখন। কিন্তু ক্লান্তিকে গুরুত্ব দিল না কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল. 'নয়টা মানুষকে যে খুন করেছে. ক্যাপ্টেনের লাশটাকে টেনে নিয়ে গেছে. সে মোটেও ছোট জীব নয় যথেষ্ট বড়। যাওয়ার পথে নিশ্চয় কোন দাগ বা চিহ্ন রেখে গেছে। সেটাই খুঁজে বের করব আমরা। একসঙ্গে সবাই না গিয়ে দুটো দলে ভাগ হয়ে দুদিক থেকে যাব। সঙ্গে কুকুর নেব অবশ্যই।'

জিনাকে রেডারের সামনে বসিয়ে দিয়ে এসে রবিনও সঙ্গে যেতে তৈরি হলো। এই অ্যাডভেঞ্চার মিস করতে কোনমতেই রাজি নয় সে। জিনাও রাজি হত না, যদি রেডারের সামনে বসার মত আর কাউকে পাওয়া যেত। গত একটা দিন আর প্রায় রাতের অর্ধেকটা ঠায় বসে থেকেছে রবিন। হাত-পাগুলো একটু খেলানো দরকার ওর। সেটা বুঝল জিনা।

যেটাকে খুঁজতে যাচ্ছে. সেটা জন্তু কিনা এখনও নিশ্চিত নয় কিশোর. তবু ধরে নিল ওটা কোন ধরনের জন্তুই হবে। জন্তুরা যে ধরনের চিহ্ন রেখে যায়. সে রকম চিহ্নের দিকে নজর রাখতে বলল সবাইকে।

আলোচনা করে ঠিক হলো, প্রথমে ঝর্নাটার দিকে যাবে ওরা। কারণ ওঅর্ম-লেক থেকে যদি এসে থাকে জানোয়ারটা, তাহলে তার পরিচিত পরিবেশের দিকেই ছুটবে। ওরা শুনেছে ওখানেও গাউ আইল্যান্ডের মত গরম জলের ঝর্না আছে। হয়তো ভূরিভোজনের পর গরম পানিতে গা ডুবিয়ে আরাম করে বসে থাকবে ওটা।

বিশাল এলাকা। দুই দলে ভাগ হয়ে দুদিক থেকে খুঁজলে অনেক বেশি জায়গায় খোঁজা যাবে। ঝর্নার দিকে খোঁজা হয়ে গেলে যাবে পাখির পাহাড়ে। বলা যায় না, ক্যাপ্টেনের লাশটাকে সাবাড় করার পরেও পাখির গন্ধ পেয়ে লোভে লোভে ওদের আস্তানায় গিয়ে হাজির হতে পারে ওটা। অন্ধকারে পাখি ধরা সহজ বলে। খাওয়ার পর পাহাড়ের কোন গুহা কিংবা ফাটলে লুকিয়ে থেকে হয়তো বিশ্রাম নেবে। দিনটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে রাতের বেলা জেগে উঠবে আবার। যদি সত্যিই নিশাচর হয়ে থাকে।

প্রায় সবাই যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেও হেডকোয়ার্টার ছেড়ে এভাবে বেরিয়ে পড়াটা উচিত মনে হলো না কিশোরের কাছে। কিসের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছে ওরা, জানে না। এমনও হতে পারে, ওদের সমস্ত ধারণা ভুল প্রমাণিত করে এদিকেই এসে হাজির হবে ওটা, মানুষের লোভে ছাউনি আক্রমণ করে বসবে আবার। বাধা দেয়ার জন্যে তখন লোক থাকা দরকার এখানে। তাই মোট আটজন খুঁজতে যাবে ঠিক করল। একেক দলে চারজন করে থাকবে। সঙ্গে থাকবে দুটো করে কুকুর। মেয়েদের কাউকেই নেয়া

হবে না।

বেরিয়ে পড়ল ওরা একদলে রইল তিন গোয়েন্দা আর ডিক। অন্য দলে টেরিয়ার এবং আরও তিনটে ছেলে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে থাকলে কখন কোন গোলমাল বাধায় টেরি, এই ভয়ে অন্য দলটার নেতা বানিয়ে দিল তাকে কিশোর। তাতে টেরিয়ারও খুশি। মাতব্বরি করতে করতে কিশোরদের উল্টো দিকে ঘুরে তিন সহকারীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে

কিশোররাও রওনা হলো। দুটো দল দুদিক থেকে ঘুরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে মিলিত হবে একটা বিশেষ জায়গায়।

কুকুরগুলো চলেছে মনের আনন্দে। কখনও পাশাপাশি হাঁটছে, কখনও লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে দূরে। ডাকাডাকি করে ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে। অনুকূল দিক থেকে বাতাস বইছে। তাতে একটা অসুবিধে আছে। বাতাস ওদের গন্ধ বয়ে নিয়ে যাবে জন্তুটার নাকে। সতর্ক হয়ে যাবে ওটা। লুকিয়ে পড়তে পারে। অবশ্য ওটার ঘ্রাণশক্তি যদি ততটা প্রখর হয়। মাঝে মাঝে ছোটবড় পাহাড়। খাড়াই কম। জমিতে অজস্র ভাঙচুর। কোথাও ছোট ছোট জলা, কোথাও বা পাথরের স্তূপ। এখানে ওখানে স্থানীয় গাছগাছড়ার জঙ্গল। এ অঞ্চলের অধিকাংশ গাছই চার থেকে ছয় ফুট উঁচু। বড়ও আছে। তবে খুব বেশি না। দশ ফুট কোনটা দেখা গেলে তাকে নিঃসন্দেহে মহীরুহ বলা যেতে পারে। উপ-কুমেরু অঞ্চলের নানা ধরনের ঘাস, ফার্ন, ডেইজির মত ফুল প্রচুর জন্মে আছে। ওগুলোর আড়ালে-আবডালে মুখ লুকিয়ে থাকতে চাইছে যেন আরেক ধরনের সোনালি রঙের ফুল, অনেকটা আমাদের ঝুমকালতার ফুলের মত।

পাথুরে অঞ্চলে পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা বৃথা। ভরসা একমাত্র কুকুর দুটো। একটা কুকুর একেবারেই অপদার্থ। দারুণ উৎসাহে ছুটতে ছুটতে একেকবার কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। খানিক পর ফিরে আসছে জিভ বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে। যেন দেখতে চাইছে মানুষগুলোও তার পেছনে ছুটে আসছে কিনা। অন্য কুকুরটার অবশ্য এধরনের অভিযানের অভিজ্ঞতা আছে। বোঝা যায়। নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে গেল না। নির্দেশ পালন করে চলল।

জলা-ডোবার ধারগুলো আতিপাতি করে খুঁজেও বড় কোন জানোয়ারের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল না। বড় তো দূরের কথা, এতদিনে ছোট কোন জানোয়ারও এখানে চোখে পড়েনি ওদের। আজও পড়ল না। একমাত্র পাখি ছাড়া আর কোন প্রাণীই নেই যেন।

দ্বীপের আগ্নেয় অঞ্চলে এসে পৌঁছল ওরা। মাটির রঙ পাল্টে গেল হঠাৎ করে। একজায়গায় কতগুলো পাতাবাহার জন্মে আছে। মাটির রঙ ফ্যাকাসে হলুদ, ভেজা ভেজা। বাষ্প উঠছে। খানিক দূরে একটা জলা জায়গা সবুজ শ্যাওলায় ভরা। গজ তিরিশেক দূরে লালচে পানির একটা পুকুর থেকে বুদ্বুদ উঠছে ক্রমাগত, গন্ধকের বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে। এত বেশি বাষ্প উঠছে সবকিছু থেকে, বেশিদূর নজর চলে না। ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী কিংবা হালকা মেঘরাশির মত হয়ে যাচ্ছে এই বাষ্প, তারপর আচমকা বাতাসের ঝাপটায় সরে চলে

যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে।

গন্ধকের দুর্গন্ধ সহ্য করা যাচ্ছে না। নাকে রুমাল চাপা দিতে বাধ্য হলো কিশোর। এগিয়ে চলল আরও সামনে। এরকম জায়গায় আর আসেনি কুকুরগুলো। ছোটাছুটি বন্ধ হলো আনাড়ি কুকুরটারও। চারদিকে ছোট-বড় নানা আকারের প্রাকৃতিক পুকুর। কোনটার পানি নীল, কোনটাতে ইঁটের মত লাল। মাঝে মাঝে বয়ে চলেছে দুর্গন্ধে ভরা গরম পানির স্রোত খানিক দূরে একটা ফোয়ারা। একটু পর পর আকাশের দিকে অনেকটা করে গরম পানি ছুঁড়ে দিয়ে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একেবারে চুপ, যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি। বড় একটা ঝর্না দেখা গেল বাষ্প উঠছে পানি থেকে ছোটখাট একটা জলপ্রপাতও রয়েছে। ডোবাগুলোতে লাল, নীল, সবুজ রঙের কাদা। এক বিচিত্র দৃশ্য।

এখানেই দুটো দলের মিলিত হবার কথা।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই হই-চই করতে করতে এসে হাজির হলো টেরিয়ারের দল। জানাল, কোন জানোয়ারের পায়ের ছাপ বা অন্য কোন চিহ্ন দেখতে পায়নি।

কিশোররাও পায়নি। সুতরাং এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। দুটো দল মিলে পাখির পাহাড়ের দিকে রওনা হলো। কিছুদূর এগোনোর পর বেশি জায়গায় খোঁজার জন্যে আবার দুই দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা।

দুই মাইলের বেশি হাঁটতে হবে। শেষদিকটা পুরোপুরি পাথুরে। পাখির আস্তানায় পৌঁছার অনেক আগে থেকেই উচ্চকিত চিৎকার কানে এল ওদের। হাজার হাজার পাখি। মাটিতে, আকাশে, পানিতে, সবখানে আছে। কোন কোনটা এত ওপরে উঠে গেছে, বিন্দুর মত লাগছে। বাতাসে পচা গন্ধ। শুঁকতে শুঁকতে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ঝর্নার কাছে তো পেলাম গন্ধকের গন্ধ। এটা আবার কিসের?'

'নাইট্রেট,' জবাব দিল রবিন।

পাখির পাহাড়ে পৌঁছে গেল ওরা। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে বাসা আর বাসা। পাহাড়ের ফাঁকফোকর, সঙ্কীর্ণ শৈলশিরা, খসে পড়া পাথরের স্তূপ, যেখানেই সামান্যতম জায়গা পেয়েছে সেখানেই বানিয়ে ফেলেছে বাসস্থান। মানুষ দেখে কর্কশ চিৎকার আরও বেড়ে গেল ওগুলোর। কাছাকাছি হতেই উড়াল দিতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে। কলরব করে উড়তে থাকল মাথার ওপর। একজায়গায় এত পাখি সচরাচর দেখা যায় না। এর একটাই কারণ, এখানে এদের কোন শত্রু নেই, যারা ডিম আর ছানা খেয়ে এদের ধ্বংস করবে, কমিয়ে রাখবে। তবে এখন বোধহয় এসে হাজির হয়েছে এমন এক শত্রু, যে শুধু কমাবে না, সময়মত ওটাকে ঠেকাতে না পারলে খেয়ে খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। পাখি বলেই আর কিছু থাকবে না গাউ আইল্যান্ডে।'

সাবধানে এগোনোর চেষ্টা করল ওরা। বাসা না মাড়িয়ে এক পা এগোনোরও যেন জো নেই। একটুখানি জায়গা নেই, যেখানে পা রাখা যায়। হলুদ, বাদামী, সবুজ আর সাদা রঙের শৈবাল এবং ছত্রাকে ভরে আছে

জায়গাটা। পাথরের মধ্যে যেখানে কোন রসই নেই সেখানেও কি করে বেঁচে আছে গুল্মগুলো, চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না।

'পাখির পালক, মলমূত্র, এসব পচে পচে তৈরি হয় নাইট্রেট, ভেসে বেড়ায় বাতাসে,' বই-পড়া বিদ্যা ঝাড়তে আরম্ভ করল রবিন। 'বাতাস থেকে নাইট্রেট শুষে খেয়ে বেঁচে থাকে এসব গুল্ম। পাথরে বাস, অথচ দেখো কি রকম কোমল। এরকম অদ্ভুত খাবার খেয়ে যে বাঁচতে পারে কোন প্রাণী, বিশ্বাস হয়? পচা বাতাসে আমাদের শ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে, আর ওরা কেমন ফনফনিয়ে বেড়ে উঠছে। পাখিগুলোরও অসুবিধে হয় না। ভাবলে কেমন অবাক লাগে না?'

টেরিরাও এসে হাজির হলো। এবারেও জন্তুটার কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি কেউ।

আপাতত আর কিছু করার নেই। হেডকোয়ার্টারে ফিরে চলল সবাই।

বিফল হলো সকালের অভিযানটা।

আট

আস্তানায় পৌঁছে কোন খবর আছে কিনা জানার জন্যে রেডিও হাউজে ঢুকল কিশোর।

ওকে দেখেই উঠে এল জিনা। হাতে একটা কাগজ। খবর জানানোর জন্যে যেন অস্থির হয়ে আছে। 'ভ্যালপারাইসো থেকে জানিয়েছে, এখানকার অবস্থা দেখার জন্যে একটা প্লেন পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা। বললাম, রানওয়েতে নামার জায়গা নেই। ওরা বলল, ওরা আসতে আসতে রানওয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বলতে গেলাম, হবে কি হবে না সেটা তো আমাদের জানার কথা, ওরা জানল কিভাবে? পাত্তাই দিল না আমার কথায়। মনে হলো, আমার কথা বিশ্বাস করেনি ওরা। পাগল-টাগল ভেবেছে নাকি কে জানে!'

'ভাবতেও পারে,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'দীর্ঘদিন এসব নির্জন জায়গায় থাকলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। আসুক। এসে ওদেরই মাথা গরম হবে যখন দেখবে নামতে পারছে না। প্লেনের লোকগুলো যে সত্যি গায়েব হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন আত্মহত্যা করেছেন, বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে তখন। কখন আসবে?'

'রওনা তো হয়ে গেছে বলল অনেকক্ষণ আগে। এতক্ষণে চলে আসার কথা...'

'কিশোর,' রেডারের পর্দার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল হেমিং নামে একটা ছেলে, 'মনে হয় চলে এসেছে।'

রেডারের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর জিনা। পর্দায় একটা বিন্দু ফুটেছে। বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। প্লেনই। কোন সন্দেহ নেই। খড়খড় করে উঠল রেডিওর স্পীকার। শোনা গেল একটা কণ্ঠ, 'গাউ আইল্যান্ড! গাউ

আইল্যান্ড! শুনতে পাচ্ছ? আমি ক্যাপ্টেন ব্রড।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হেমিং, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি। বলে যান। ভ্যালপারাইসো থেকে আসছেন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ।'

হেমিঙের হাত থেকে মাইক্রোফোনটা প্রায় ছিনিয়ে নিল কিশোর। 'ক্যাপ্টেন ব্রড, আমি কিশোর পাশা বলছি। গাউ আইল্যান্ডে নামতে পারবেন না। রানওয়ে জুড়ে পড়ে আছে ওঅর্ম-লেক থেকে আসা প্লেনটা...'

'ঠিকই নামব আমি, কোন অসুবিধে হবে না।...দুশ্চিন্তা কোরো না। আমরা নামলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সঙ্গে ডাক্তার নিয়ে এসেছি আমরা

লোকটার কথা শুনে রাগ লাগল কিশোরের। ঠিকই পাগল ভেবে বসে আছে ওদের। কিছুটা রুক্ষ কণ্ঠেই জবাব দিল, 'অহেতুক আসবেন। নামতে পারবেন না।'

মাইক্রোফোনটা আবার হেমিঙের হাতে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর। বিমানটা কি করে দেখার জন্যে বেরিয়ে এল।

বিমান আসার খবর পেয়ে অনেকেই এসে জড়ো হলো খোলা মাঠটায়। তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। দূর দিগন্তে প্রথমে বিন্দুর মত চোখে পড়ল প্লেনটা। বড় হতে লাগল ক্রমশ। আরও কাছে এলে চেনা গেল। রানওয়েতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বিমানটার মত একই গোত্রের। দুর্গম অভিযানে বেরোনোর উপযোগী দূর পাল্লার বিমান। দেখতে দেখতে দ্বীপের ওপর চলে এল ওটা। চক্কর দিতে দিতে নিচে নামতে শুরু করল। অনেকখানি নিচে নেমে বিকট গর্জন করে দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। সাগরের ওপরে গিয়ে ঘুরল। এগিয়ে আসতে শুরু করল আবার। রানওয়েতে পড়ে থাকা বিমানটা দেখতে পেয়েছে পাইলট। আবার চলে গেল ওপর দিয়ে। আবার ফিরে এল। আবার গেল। ওড়ার ধরন দেখেই বোঝা গেল, দ্বিধায় পড়ে গেছে। মনে মনে হাসল কিশোর। 'বোঝো ব্যাটা এখন। বলেছিলাম, বিশ্বাস করোনি। আমাদের পাগল ভেবেছ। এখন নামো পারলে।' পাইলট কি বলে শোনার জন্যে আবার রেডিও হাউজের দিকে ছুটল সে।

ঢুকেই শুনল পাইলট বলছে, 'নাহ্, ঠিকই বলেছিলে তোমরা। এখানে নামা সম্ভব নয়। আমরা ফিরে যাচ্ছি। গিয়ে একটা জাহাজ পাঠাতে বলব।' একটিবারের জন্যে 'সরি' বলল না পাইলট। নানা রকম উপদেশ দিতে লাগল—বিমানটা যেভাবে পড়ে আছে, থাক, কেউ যেন কোন জিনিস না ধরে। তদন্তের খাতিরে সেটা বিশেষ জরুরী। আরও নানা পরামর্শ। শুনতে ইচ্ছে করল না কিশোরের। বেরিয়ে চলে এল।

দ্বীপের ওপর মিনিটখানেক ওড়াওড়ি করে আবার দক্ষিণে নাক ঘোরাল বিমানটা। ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

এর কয়েক মিনিট পরেই ঘটল একটা বিচিত্র ঘটনা। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা দেখল কোন একটা জীবের পিছু লেগেছে একটা কুকুর। কৌতূহল হওয়ায় দেখতে গেল টেরি। খুব ছোট একটা জীব। ইঞ্চি চারেক

লম্বা। জীবটার পিছু নিয়ে মজা পাচ্ছে কুকুরটা। টেরিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উৎসাহ প্রকাশ করল আরও। নখ বাড়িয়ে খোঁচা মারতে গেল ওটাকে।

কুকুরটার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যেই যেন অদ্ভুত কায়দায় তিনটে দাড়া জাতীয় অঙ্গ উঁচু করে ফেলল জীবটা। দাড়াগুলো দেখতে কাঁটাওয়ালা পাতার মত।

ধরতে গিয়েও ধরল না কুকুরটা। যেন তার সহজাত প্রবৃত্তি সাবধান করে দিল তাকে। শেষ মুহূর্তে থাবা ফিরিয়ে আনল। চলতে শুরু করল আবার জীবটা। গুড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে যেন অতিকষ্টে।

ছাড়ল না কুকুরটা। লাফালাফি আর ঘেউ ঘেউ করতে করতে জীবটার পিছু নিল। টেরিও হাঁটতে লাগল পেছনে। অবাক হয়ে দেখছে। এ রকম জীব আর কোনদিন দেখেনি। ওটা যে কি চিনতে পারল না।

কুকুরটার চেঁচামেচিতেই বোধহয় বিরক্ত হয়ে, কিংবা অন্য কোন কারণে একটা গর্ত দেখে তাতে ঢুকে পড়ল জীবটা। আর বেরোল না।

নয়

সন্ধ্যায় ছাউনির বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে কিশোর দেখতে পেল, উঁচু-নিচু প্রান্তর আর ছোট ছোট গাছের আঁড়াল-আবডাল পেরিয়ে দলবল নিয়ে ফিরে আসছেন ডক্টর বেঞ্জামিন। ঝর্নার কাছে গাছ লাগাতে গিয়েছিলেন। ওঅর্ম-লেক থেকে আনা গাছগুলো গুদামে রাখলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে পুঁতে রেখে এসেছেন। নতুন মাটিতে ঠিকমত শেকড় গাড়তে পারবে কিনা সন্দেহ আছে তাঁর। তবু গুদামের মাটিতে বস্তাবন্দী করে ফেলে রাখার চেয়ে তো ভাল।

ক্যাপ্টেন ব্রডের নির্দেশ—বিমানের জিনিস যা যেখানে যেভাবে আছে, রেখে দিতে হবে, এটা মেনে নিতে পারেননি তিনি। কিসের তদন্ত করবে ওরা? দ্বীপের সবাই পাগল হয়ে গেছে কিনা? বিমানটাকে পড়ে থাকতে দেখেও বিশ্বাস হলো না? নাকি ওরা ভেবেছে ফুসমন্তর-জাদু করে আকাশ থেকে বিমানটাকে টেনে নামিয়ে মানুষগুলোকে গায়েব করে দিয়েছেন তাঁরা? পাইলটের বাগাড়ম্বরের কথা শুনে কিশোরের মতই রেগে গেছেন তিনিও। কিশোর আর আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে রানওয়েতে পড়ে থাকা বিমানটা সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাতে বিমান অবতরণের পথ সুগম হবে। জাহাজ কবে আসতে পারবে না পারবে তার ঠিক নেই। বিমান আসাটাই সহজ। ভয়ানক কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলে তখন রেডিওতে খবর পাঠানো যাবে। ভ্যালপারাইসো থেকে বিমান এসে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবে।

ছাউনিতে সারাদিন ধরে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার ঠুকুর-ঠাকুর শব্দ হচ্ছে। কয়েকজন সহকারী নিয়ে কোন ধরনের একটা কাঠামো বানানোর চেষ্টা করছে মুসা। জ্যাকের সাহায্যে বিমানটাকে উঁচু করে ওই কাঠামোর

ওপর বসাবে, চাকাগুলো খোলার চেষ্টা করবে। তারপর বিমানের নিজের এঞ্জিনের সাহায্যেই সরিয়ে নিতে পারবে ওটাকে।

ব্রুকের সঙ্গে বল খেলছে টেরি। একজন আরেকজনের দিকে ছুঁড়ে মারছে। শূন্যে থাকতেই সেটা লুফে নেয়ার চেষ্টা করছে প্রতিপক্ষ। ছেলেমানুষী খেলা। কোনমতে সময় কাটানো।

পাখির পাহাড়ের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে খণ্ড খণ্ড মেঘ। পাখিরাও উড়ছে। পানিতে ডাইভ দিয়ে দিয়ে মাছ শিকার করছে। সমুদ্রের ঢেউ বাতাসের সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্ষোভে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের বুকে। মজার ব্যাপার হলো, প্রাকৃতিক শব্দ একটানা হলেও সেটা সওয়া যায়, কিন্তু যন্ত্রের শব্দ প্রায়ই বড় বিরক্তিকর লাগে। এই যেমন জেনারেটরটা। একটানা চলছে। ওটার একঘেয়ে শব্দ কান পেতে শুনতে গেলে নিজের অজান্তেই চোখমুখ কুঁচকে আসে কিন্তু সমুদ্র কিংবা বাতাসের শব্দে সেটা হয় না।

আস্তানার কাছে এসে যার যার ঘরের দিকে চলে গেল ডক্টর বেঞ্জামিনের সঙ্গে ঝর্নায় যাওয়া লোকজন। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এগিয়ে গেল কিশোর। 'পুঁতে এলেন?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'হ্যাঁ। তবে কতদিন বাঁচবে বলতে পারছি না। রোজ গিয়ে দেখে আসতে হবে।'

'আমার বিশ্বাস বেঁচে যাবে। না বাঁচলেও কেউ আপনাকে দোষ দিতে পারবে না। প্লেনটা তো আর আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করেননি। বরং নমুনাগুলো বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।'

'দোষের তোয়াক্কা আমি করি না। আমি বিজ্ঞানী। গবেষণায় সফল হতে পারলে আমার ভাল লাগে। গাছগুলো বাঁচলে ভাল লাগবে. না বাঁচলে কষ্ট পাব। কে কি বলল না বলল তাতে আমার কি এসে যায়?' ধূসর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন ডক্টর বেঞ্জামিন। আবার ফিরলেন কিশোরের দিকে। 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে এলাম।'

'কি?' কান খাড়া করল কিশোর।

'নিরামিষভোজী প্রাণী আছে এই দ্বীপে। গাছের শক্ত ডালসহ পাতা খেয়ে ফেলে। হাতি আর গণ্ডারের মত।'

এইটা একটা খবর বটে। চমকে গেল কিশোর। 'তাই নাকি?'

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর। 'গাছগুলো লাগানোর জন্যে জায়গা খুঁজতে গিয়ে দেখি কিছু কিছু গাছের ডাল ভাঙা। প্রথমে ভাবলাম ঝড়ে ভেঙেছে। কিন্তু নিচে পড়ে থাকতে দেখলাম না ওগুলো। তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো, ঝড়ে তো এভাবে ভাঙতে পারে না। হাতি শুঁড় দিয়ে যে ভাবে মুচড়ে ভেঙে মুখে পোরে, অনেকটা সেই রকম।'

'বলেন কি, স্যার! হাতির মত বড় জীব এই দ্বীপে রয়েছে, অথচ এতদিনে তার কোন হদিসই আমরা পেলাম না? আজ সকালেও তো অনেক খোঁজাখুঁজি করে এলাম। কোন জানোয়ারের একটা পায়ের ছাপও চোখে পড়েনি। দেখে কি রকম মনে হলো? নতুন ভাঙা?'

আরেকবার মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর। 'হ্যাঁ। চিন্তাটা সেজন্যেই বেশি হচ্ছে। গাছগুলোকে লাগিয়ে তো রেখে এলাম। রাতের বেলা এসে ওই জানোয়ারটা যদি নতুন ধরনের গাছ দেখে লোভে পড়ে খেয়ে সাফ করে দেয়? যাবে এত কষ্ট করে আনা নমুনাগুলো! লোহার তারের জাল দিয়ে ওগুলোর ওপর ঘর বানিয়ে দিতে পারলে হয়তো বাঁচানো যেত...' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। 'ডাল আর পাতা খাওয়া দেখে একটা প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি। তোমাকে বলিনি। গুদাম থেকে গাছগুলো বের করার সময় রীতিমত অবাক লেগেছিল।'

ভুরু কোঁচকাল কিশোর, 'কেন?'

'গাছ পেয়েছি দশটা, একটা কম। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেই গাছটা আর পাইনি। শেষে যে দশটা পেয়েছি, লাগিয়ে রেখে এসেছি। ভেবেছিলাম, মুসাকে জিজ্ঞেস করব ঠিকমত নিয়ে রেখেছিল কিনা। কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, গুদামে ঢুকে ক্যাপ্টেনের লাশের সঙ্গে ওই গাছটাকেও খেয়ে ফেলেনি তো দানবটা?'

'বলেনি কি, স্যার! প্লেনেও তো একটা গাছ গায়েব হয়েছে। তবে কি...'

'তবে-টবে কিছু না। আমার ধারণাটাই সত্যি,' পেছন থেকে কথা বলে উঠল টেরি।

ফিরে তাকাল কিশোর। ডক্টরের সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখে খেলা থামিয়ে কখন যে এসে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকেছে, লক্ষ করেনি। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কি বলতে চাও?'

'বলতে চাইছি, কোন একটা দানব নেমে পড়েছে এই দ্বীপে। আগে থেকেই যদি থাকত, তাহলে অনেক আগেই গাছপালা সব সাবাড় করে দিত। আমরাও এতদিন নিরাপদে থাকতে পারতাম না। বহু আগেই ওটার আক্রমণের শিকার হতাম। প্লেনটা নামার পর কালই প্রথম একজন মানুষ রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে গেল এই দ্বীপ থেকে। হোক না সেটা লাশ।'

মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল কিশোর, 'হুঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এতবড় একটা জন্তু কি করে প্লেনে চেপে বসল, আর আমাদের সবার চোখ এড়িয়ে ওটা কেটেই বা পড়ল কিভাবে, বুঝতে পারছি না।'

'এমন হতে পারে, ওটা অদৃশ্য কোন জীব।'

'দূর!' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিতে চাইল, 'তা কি করে হয়?'

'কিন্তু হচ্ছে তো। অঘটন তো ঘটছে। কিছু যে একটা রয়েছে, তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। জোরাল প্রমাণ। তুমি নিজেও গুদামে বড় কিছু নড়াচড়ার শব্দ শুনেছ। অথচ দেখতে পাওনি। অস্বীকার করতে পারবে? অদৃশ্য জীব বলেই আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরাও ওটাকে আবিষ্কার করতে পারেননি।' ডক্টর বেঞ্জামিনের দিকে তাকাল সে।

জবাব দিলেন না ডক্টর। টেরির কথাটা কিশোরের মত করে উড়িয়েও দিতে পারলেন না। সত্যিই তো, কত জিনিস এখনও মানুষের অনাবিষ্কৃত,

অজানা রয়ে গেছে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, কে বলতে পারে? যা আবিষ্কৃত হয়নি সেটা নেই, এমন কথা জোর দিয়ে বলা উচিত হবে না। তবে এসব তর্কাতর্কির মধ্যেও থাকলেন না তিনি। 'তোমরা কথা বলো, আমার কাজ আছে,' বলে ল্যাবরেটরির দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

কিশোরের দিকে ফিরল টেরি, 'আমি বলি কি, শোনো ফাঁদ পেতে ওটাকে ধরার ব্যবস্থা করি, এসো।'

'টোপ হিসেবে কে থাকবে? তুমি?'

'দেখো, টেরা কথা বোলো না। তোমার চেয়ে বুদ্ধি আমার কম নেই যে সব যুক্তি দিচ্ছি খণ্ডাতে তো পারছ না।'

'রাগ করো কেন? ঠাট্টা করার জন্যে বলিনি। জন্তু হোক বা জানোয়ার হোক, বোঝা যাচ্ছে ওটা সর্বভুক। মানুষ থেকে শুরু করে পাখি, গাছপালা, কোন কিছুই বাদ দেয় না। খাবার না দিলে ফাঁদের মধ্যে ওটা কিসের লোভে আসবে? কে রাজি হবে ওটার খাদ্য হওয়ার জন্যে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল টেরি, 'মানুষ দেয়ার দরকার কি? পাখি আর গাছও যখন খায়, ওসব কিছু দিয়ে দিলেই তো হয়। বন্দুক আছে। যদি বলো, পাখির পাহাড় থেকে গিয়ে পাখি মেরে নিয়ে আসতে পারি।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। তারপর বলল, 'ফাঁদ যে পাতবে, কোন ধরনের ফাঁদ? কতখানি শক্ত? কিরকম জন্তুর জন্যে পাততে যাচ্ছি? স্যারের কথা থেকে মনে হলো, হাতি কিংবা গণ্ডারের মত শক্তিশালী প্রাণী ওটা। ওই রকম জন্তু ধরার মত ফাঁদ এখানে পাবে কোথায়?'

চুপ হয়ে গেল টেরি। মাথা চুলকাল। জবাব দিতে পারল না।

'আর যা-ই করি না কেন, তোমার অদৃশ্য জন্তুর কথা মানতে পারছি না আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে-ই এসব অকাজগুলো করছে, সে দৃশ্যমান। আমাদের চোখের সামনেই হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না।' আবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। তারপর বলল, 'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক। সকালে গিয়ে দেখে আসব নতুন পোঁতা গাছগুলোর কোন ক্ষতি করেছে কিনা দানবটা। যদি করে, তাহলে তো পেয়ে গেলাম টোপ। ওগুলোর আশেপাশে বড় বড় গর্ত করে রেখে দেব। আমাজনের জঙ্গলে তাপির আর জাগুয়ার ধরার জন্যে যেরকম গভীর গর্ত করে ওপরে ঘাসপাতা বিছিয়ে রাখে, সেরকম। খেতে এলেই যাতে ফাঁদে পড়ে দানবটা।'

কিশোরের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল টেরি। বল খেলা বাদ দিয়ে অনেক আগেই চলে গেছে ব্রুক। টেরিও গেল বিনোদন কক্ষের দিকে। ডিনারের আগের সময়টা ওর দু'চারজন ভক্তের সঙ্গে তাস খেলে, সেই সঙ্গে অদৃশ্য জন্তুর আইডিয়ার কথা বলে কিভাবে ডক্টর বেঞ্জামিন ও কিশোর পাশার মুখ 'বন্ধ' করে দিয়েছে, এসব গালগল্প করে ভালই কাটবে ওর।

চিন্তিত ভঙ্গিতে পাখির পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। আকাশে এখনও উড়ছে পাখির দল। ডাইভ দিয়ে দিয়ে মাছ শিকার করছে।

দশ

গাঢ় হয়ে আসে গোধূলির ছায়া। দ্বীপের আকাশ ছাড়িয়ে বিলীন হয়ে যায় দিগন্তের কিনারায় পুব প্রান্ত থেকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সমস্ত আকাশে পশ্চিম দিগন্তের কোলে এখন কেবল একমুঠো মলিন আলোর আভা।

রবিনকে দায়িত্ব দিয়ে রেডিও হাউজ থেকে বেরিয়ে এল জিনা চত্বরে কিশোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল। 'কি করছ?'

'উঁম্!' ফিরে তাকাল কিশোর. 'না, কিছু না।'

পড়ে থাকা বিমানটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আবছাভাবে ওটাকে দেখা যাওয়ার মত আলো এখনও রয়েছে। পেছনে জেনারেটরের বিকট শব্দ। বাতাসে ডিজেল পোড়া গন্ধ। খানিক দূরে লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে কি যেন একটা জিনিস সরিয়ে দিচ্ছে হেমিং।

বাইরের বাড়তি আলোগুলো ওকে জ্বেলে দিতে বলল কিশোর।

জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। দূর করে দিল অন্ধকার।

একটা কুকুরকে মাটি আঁচড়াতে দেখল কিশোর। ভাবল প্রাকৃতিক কাজ সারার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওটা। কারখানার দরজা বন্ধ করে দুজন সহকারীকে নিয়ে এগিয়ে এল মুসা জেনারেটর হাউজ থেকে বেরিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল হ্যামার আলোগুলো সব ঠিকমত জ্বলছে কিনা।

আলোতে এখন জায়গাটার চেহারাই বদলে গেছে। খানিক আগে অন্ধকার থাকার সময়কার গা ছমছমে ভাবটা আর নেই। গুদামের সামনেটাও দেখা যাচ্ছে। কিছুই পড়ে নেই। একেবারে পরিষ্কার।

মুসার দিকে এগোনোর আগে কুকুরটার দিকে তাকাল কিশোর। মাটি আঁচড়ানো বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বসে আছে একটা বিশেষ ভঙ্গিমায়। কান খাড়া। নজর সামনে আলোর সীমানার বাইরে অন্ধকারের দিকে। কিছু দেখল নাকি?

'কালকের মধ্যেই প্লেনের লেজটা উঁচু করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে,' মুসা জানাল। 'আরও তাড়াতাড়ি পারতাম। কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাচ্ছি না। সেজন্যেই দেরি হচ্ছে।'

'লেজ তোলার পর সামনেটা তুলতে হবে, সেটা তো আরও ভারি কাজ,' কিশোর বলল। 'পরশুর মধ্যে সরাতে পারবে?'

'চেষ্টা করব। না পারলেও তার পরদিন হয়েই যাবে। যদি চাকাগুলো নামানো যায়। যাবে বলেই আশা করছি। প্লেনটার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। ল্যান্ড করার সময় ভার কম ছিল। স্টোর-রূমে জায়গার তুলনায় মালপত্র ছিল কম। যাত্রী ছিল না। তেলও সবটাই খরচ করে ফেলেছিলেন ক্যাপ্টেন।'

'এতবড় প্লেন তো আর চালাওনি কখনও। সরাতে পারবে?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি? এঞ্জিন চালু হলে ঠিকই পারব। চাই কি, ওড়াতেও পারব বলে মনে করি।'

'থাক, সে-চেষ্টা না করাই ভাল। শেষে যত দোষ নন্দ ঘোষের মত সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করবে ভ্যালপারাইসোর কর্তৃপক্ষ। বড় একটা ভাল শিক্ষা দিয়ে গেছে। কোন ঝুঁকির মধ্যে আর নেই আমরা। প্লেনটাও সরাতে যেতাম না, যদি না সরিয়ে অন্য প্লেন নামার জায়গা করে দিতে পারতাম।'

'ঠিক আছে, করব না ওড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু সরানোর জন্যে অত তাড়াহুড়ো করছ কেন? ভ্যালপারাইসোর প্লেন নামতে না পারলে আমাদের কি?'

অহেতুক নাক চুলকাল কিশোর। জিনার দিকে তাকাল একবার। মুসার দিকে ফিরে দ্বিধা করে বলল, 'এতদিন নিরাপদেই ছিলাম, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি এই দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারা যায় ততই মঙ্গল।'

'কেন?' সতর্ক হয়ে উঠল মুসা।

'মন বলছে। দেখছ না কি সব কাণ্ড ঘটছে? ভাল মনে হচ্ছে না আমার। নয়জন মানুষকে গাপ করে দিল, সেই সঙ্গে একটা পেঙ্গুইন আর একটা গাছ…একটা লাশকে গায়েব করল। একটু আগে ডক্টর বেঞ্জামিন বলে গেলেন, গুদামে রাখা আরও একটা গাছ নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি…'

'কিন্তু আমি তো গুণে গুণে এগারোটাই রেখেছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে…'

'সেজন্যেই তো বলছি। ভবিষ্যতে আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার আলামত এসব। হয় আমাদের তাড়াতাড়ি পালাতে হবে এখান থেকে, নয়তো যে এসবের হোতা, বড় কোন ক্ষতি করে ফেলার আগেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে…'

ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা। মনে হলো যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল কাউকে। উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে ডাকতে চলে গেল অন্ধকারের দিকে।

জিনা বলল, 'কি হলো? অমন করছে কেন?'

তার কথা শেষও হলো না, শোনা গেল কুকুরটার আর্ত চিৎকার। ঘন অন্ধকারে ডুবে থাকা জঙ্গলের ধার থেকে এল লোম খাড়া করা, বীভৎস সে-শব্দ। দৌড় দিতে গেল মুসা। খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'আলো ছাড়া যেয়ো না!…দাঁড়াও, বন্দুক নিয়ে আসি! আমি আসার আগে এক পা নড়বে না এখান থেকে।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা শটগান আর দুটো টর্চ নিয়ে দৌড়ে ফিরে এল সে। হ্যামারও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে মুসাদের কাছে। জিনাকে বলল কিশোর, 'জলদি ঘরে গিয়ে ঢোকো। দরজা লাগিয়ে দাও। আমরা ফিরে আসার আগে বেরোবে না। সবাইকে সাবধান থাকতে বলবে। কেউ যেন না বেরোয়।'

সঙ্গে যাওয়ার জন্যে আবদার ধরতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল জিনা। সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে কিশোর যে কাজ দিয়েছে সেটা করাই এখন বেশি জরুরী। বিনোদন কক্ষের দিকে দৌড় দিল সে।

কুকুরটার চিৎকার থেমে গেছে। মুসাদের নিয়ে সেদিকে ছুটল কিশোর। পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল, টেরি ছুটে আসছে। তার এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে আরেকটা কি যেন? আজও পিস্তল নিয়ে আসছে নাকি?

আসে, আসুক। মানা করল না কিশোর। করলে না-ও শুনতে পারে। তা ছাড়া সঙ্গে বেশি লোক থাকাই ভাল।

জঙ্গলের ধারে এসে কুকুরটাকে দেখা গেল না। টর্চের আলোয় বামন গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গলটাকে কেমন উদ্ভট লাগছে। গোড়ায় শেকড়ের কাছে জন্মে আছে রাশি রাশি ফার্ন। অসংখ্য লতা গজিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরেছে ডালপালাকে। শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চাইছে যেন।

টর্চের আলো পড়তেই কি যেন নড়ে উঠল জঙ্গলের মধ্যে। মৃদু খসখস শব্দ শোনা গেল।

জঙ্গলে টর্চ তাক করে কিছু দেখতে পেল না. মাটিতে আলো ফেলে দেখতে দেখতে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'কিশোর, দেখো!'

মাটিতে কতগুলো আঁচড়ের দাগ। কুকুরটার নখের। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় মাটি আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। ফার্ন আর সবুজ শ্যাওলা দেবে গেছে ভারি কোন কিছুর চাপে। ছিঁড়ে গেছে কোথাও কোথাও।

দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'আমি জঙ্গলে ঢুকছি। কুকুরটার কি হয়েছে দেখতে চাই।' এক হাতে টর্চ অন্য হাতে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে গিয়ে চোখ পড়ল টেরির হাতের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'টেরি, কি ওটা?'

অন্ধকার থেকে জিনিসটা আলোয় তুলে ধরল টেরিয়ার। একটা বোতল। চিনতে পারল কিশোর। মলোটভ ককটেল বানিয়েছে টেরি। বোতলের মধ্যে পেট্রল ভরে এই বোমা বানাতে হয়। মুখের মধ্যে কাপড়ের সলতে গুঁজে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারলে বোতল ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে পেট্রল। মুহূর্তে আগুন ধরে যায়।

'এটা এনেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'টোয়েন্টি নাইন মনস্টারস ছবিটা দেখোনি? আর কোন উপায় না দেখে দানব মারার জন্যে হিরো শেষে এই বোমা ছুঁড়েছিল। কোন কিছুকেই পরোয়া করত না ওগুলো। কেবল আগুনকে ভয় পেত...'

'হুঁ। কিন্তু দেখো আবার, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দানবের গায়ে না ছুঁড়ে আমাদের ওপরই মেরে বোসো না।'

জঙ্গলে ঢুকতে তৈরি হলো কিশোর।

অন্ধকার এই অচেনা জঙ্গলে অজানা শত্রুর পিছু নেয়াটা রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার। কিশোরের জন্যে শঙ্কিত হলো মুসা। 'কিশোর, আমি আসি?'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। ঠোঁট কামড়াল। বন্দুকটা মুসার দিকে

বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ধরো এটা।'

টেরি বলল, 'আমিও আসছি। দানবের ওপর তোমার ওই শটগানের চেয়ে বেশি কাজ দেবে মলোটভ ককটেল। না মরলেও গায়ে আগুন লাগলে ভড়কে যাবে। আগুনকে ইবলিসেও ভয় পায়।'

'তুমি পাও? তোমার চেয়ে বড় ইবলিস আর কে আছে?' জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না মুসা। এখানে কারও সঙ্গে কারও লাগতে মানা। পুরানো শত্রুতা থাকলেও সেটা প্রকাশ করা যাবে না—ডক্টর বেঞ্জামিনের কঠোর নির্দেশ। কেউ করলে এবং কোনমতে সেটা তাঁর কানে গেলে সাংঘাতিক রেগে যাবেন তিনি।

'বেশ, এসো।' টেরিকে বলে দুটো টর্চের একটা হ্যামারের হাতে দিয়ে বলল কিশোর, 'তোমরা এখানেই থাকো চারদিকে নজর রাখো। অচেনা কিছু আসতে দেখলেই ডাকবে আমাদের।

কিশোর নিজেও ভয় পাচ্ছে। জঙ্গলে ঢুকতেই ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল। কিন্তু ভয়ের কোন অনুভূতিকে আমল না দিয়ে টর্চ হাতে এগিয়ে চলল সে। একপাশে বন্দুক হাতে এগোল মুসা। অন্যপাশে টেরি। দেশলাইটা বুক পকেটে রেখেছে। প্রয়োজন পড়লেই যাতে চট করে আগুন জ্বেলে বোমা ফাটাতে পারে।

বনটা বড় নয়। চওড়ায় পঞ্চাশ ফুট, লম্বায় ষাট। গাছ এত ঘন হয়ে জন্মেছে, দুহাতে ডালপালা না সরিয়ে ঢোকা যায় না। হাতের টর্চ সামনে বাড়িয়ে রেখে এক হাতে ডালপালা সরাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল সে।

হঠাৎ পেছনে অদ্ভুত একটা শব্দ হলো।

'বাবাগো, খেয়ে ফেলল!' বলে হাত থেকে টর্চ ছেড়ে দিল টেরি। মুহূর্তে সলতেয় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারল শব্দ লক্ষ্য করে। বিকট শব্দ করে ফাটল বোমাটা। আগুন লাফিয়ে উঠল দশ ফুট ওপরে। অনেকখানি জায়গা আলোকিত হয়ে গেল।

'কাকে মারলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কিসে যেন শব্দ করল...'

'ও, না দেখেই মেরেছ! জ্বালা!...দিলে তো সব ভণ্ডুল করে। আমাদের পিছু নিয়ে থাকলেও এখন পালাবে ওটা। না দেখে কে মারতে বলেছিল তোমাকে?'

জবাব দিল না টেরি। নিচু হয়ে টর্চটা তুলে নিল।

আগুনের আলোয় যতদূর দেখা যায়, ভালমত দেখল ওরা। বড় একটা মাকড়সা ছাড়া অন্য কোন প্রাণী চোখে পড়ল না।

আর খুঁজে লাভ নেই। আগুন দেখে নিশ্চয় সতর্ক হয়ে গেছে রহস্যময় জীবটা। ওদের এগোতে দেখলেই সরে পড়বে। মনে মনে টেরির মুণ্ডুপাত করতে করতে দুজনকে নিয়ে ফিরে চলল কিশোর।

জঙ্গলের বাইরে উত্তেজিত হয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সবাই। ওদের দেখেই একসঙ্গে জানতে চাইল: 'কি হয়েছে? কাকে মারলে?

দানবটার দেখা পেলে নাকি? কুকুরটা কোথায়?'

এক এক করে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল কিশোর কোন কিছু না দেখে শব্দ শুনেই ঘাবড়ে গিয়ে বোমা ফাটিয়ে দিয়েছে টেরি. শুনে হাসাহাসি শুরু করল হ্যামার আর অন্য দুজন। মুখ গোমড়া করে রইল টেরি জানে, আস্তানায় ফিরলে আরও হাসাহাসি আছে কপালে। শুনবে আর হাসবে সকলে।

ফেরার পথে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মুসাকে বলল কিশোর. 'ভেতরে কিছু একটা নড়তে দেখেছি আমি। আলো পড়তেই সরে গেল। আমরা জঙ্গলে ঢুকলে আমাদের পিছু নিয়েছিল। শব্দ শুনে তখুনি বোমাটা না ফাটালে হয়তো দেখতে পেতাম ওটাকে। আগুন দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছে।'

'তারমানে একটা ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল. আগুনকে ভয় পায় ওটা।'

'আগুনকে কে না ভয় পায়? কিন্তু আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে কুকুরটার এ ভাবে গায়েব হওয়া দেখে। কোন চিহ্নই রাখেনি ওটার। চিতাবাঘে নিলেও চিহ্ন থাকে। রক্তের ফোঁটা. গাছের গায়ে লেগে থাকা লোম···কিছু না কিছু থাকে। কিন্তু এ যেন ধরেই গিলে ফেলেছে!'

'ক্যাপ্টেনের লাশটার মত!'

মাথা দোলাল কিশোর। 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা. কিশোর,' হাঁটতে হাঁটতে আচমকা প্রশ্ন করল মুসা. 'কোন মাংসাশী পাখির কাজ নয়তো? ভূতের কথা বললে তো আবার হাসবে···'

'নাহ্। কুকুরের মত একটা জানোয়ারকে তুলে নিতে হলে কন্ডর শকুনের মত বড় আর শক্তিশালী পাখি দরকার। এ সব অঞ্চলে অতবড় পাখির কথা শোনা যায়নি। কুমেরুতে অবশ্য সুমেরুর মত এক জাতের বড় পেঁচা আছে। কিন্তু ওরাও বড়জোর খরগোশ ধরতে পারে, তার চেয়ে বড় কোন জীব না। সেই পেঁচাও এখানে দেখিনি আজ পর্যন্ত।'

'তাহলে জীবটা কি? তুমি নড়তে দেখেছ। জঙ্গলের মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ আমার কানেও এসেছে। আর শুঁট···দূরো, টেরি তো শব্দ শুনে বোমাই ফাটিয়ে বসল। তারমানে কোন অশরীরীর পিছু নিইনি আমরা। তাই না?'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং শরীরী তো বটেই. বেশ বড় মাপের শরীরী— যে একটা কুকুর কিংবা মানুষের লাশকে বেমালুম গাপ করে দিতে পারে।'

এগারো

বিনোদন কক্ষে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে কিশোর। তার চারপাশে হই-চই করে কথা বলছে সকলে। আলোচনার বিষয়বস্তু একটাই—অদ্ভুত একটা জীব. যে স্বচ্ছন্দে একটা কুকুরকে তুলে নিয়ে যেতে পারে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে টেরি বলল, 'আমার এখনও ধারণা, জীবটা স্বচ্ছ।'

'কি পাগলের মত যা-তা বলছ?' প্রতিবাদ করল রুক। 'তুমি বলতে চাইছ এমন একটা জীব ওটা, যার গায়ে টর্চের আলো ফেললেও দেখা যায় না? দিব্যি আত্মগোপন করে থাকতে পারে? এইচ জি ওয়েলসের অদৃশ্য মানব পেয়েছ নাকি?'

'মানব নয়, দানব। আর এইচ জি ওয়েলসও নয়, বলতে পারো···টেরিয়াল ডয়েলের অদৃশ্য দানব। আইডিয়াটা প্রথম আমার মাথা থেকেই বেরিয়েছে কিনা।'

'তোমার ওই মোটা মাথা থেকে এরকম উদ্ভট জিনিস ছাড়া আর কি বেরোবে!'

রাগ করল না টেরি। আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'অনেক চিকন মাথা থেকেও যে জিনিস বেরোতে চায় না, সেটার সমাধান মোটা মাথারাই করে দিতে পারে। এই ধরো না, আরও একটা জিনিস আজ আবিষ্কার হলো আমারই "মোটা" বুদ্ধির কারণে—সেটা হলো, দানবটা আগুনকে ভয় পায়। বুদ্ধি করে মলোটভ ককটেলটা নিয়ে গিয়েছিলাম বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে।'

ওর বোমা ফাটানোর ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা হাসাহাসি হয়নি আর। পরিস্থিতি সবাইকে চিন্তিত, গম্ভীর করে তুলেছে। হাসার মেজাজ নেই এখন কারও। সুতরাং সাহস পেয়ে গেছে সে। গলাবাজি করে জ্ঞান দিতে গিয়ে বলল, 'অবাস্তব ভাবছ কেন ব্যাপারটাকে? সমুদ্রে এমন মাছ আছে, যেগুলোর গা কাঁচের মত স্বচ্ছ। টেলিভিশনে দেখোনি? ওগুলোর গায়ে আলো পড়লে শরীর ভেদ করে দিব্যি অন্য পাশে চলে যায়। সমুদ্রে যত প্রাণী আছে, সবগুলোর কথা জেনে গেছেন বিজ্ঞানীরা, এটা জোর দিয়ে বলা যায় না। কত রকমের বিচিত্র, অজানা প্রাণী এখনও হয়তো আবিষ্কারের বাইরে রয়ে গেছে। সেরকমই কোন একটা উভচর স্বচ্ছ দানব উঠে এসে যদি দ্বীপে উপদ্রব শুরু করে, অবাক হওয়ার কিছু আছে কি?'

'আছে,' টেরির বড় বড় কথা আর সহ্য করতে পারল না জিনা। 'তোমার ধারণা মেনে নিতে হলে কল্পনাকে আরও অনেকখানি বাড়াতে হয়। ধরে নিতে হয়, ওটা শুধু উভচর নয়, সর্বচর। আকাশেও তার গতিবিধি আছে। উড়তে পারে। নইলে প্লেনটাকে আক্রমণ করল কিভাবে?'

'তাহলে তাই,' নিজের যুক্তিতে অটল রইল টেরি। 'এমন অনেক পাখি আছে যেগুলোকে সর্বচরই বলা চলে। আকাশে উড়তে পারে, মাটিতে নেমে হাঁটতে পারে, আবার পানিতে ডুব দিয়ে মাছ শিকারও করতে পারে। সর্বচর হলো না?'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল জিনা। মুখ লাল।

বিজয়গর্বে সবার দিকে তাকাতে লাগল টেরি। বলল, 'জানোয়ারটা যা-ই হোক, ওটাকে খুঁজে আমি বের করবই। ঠেকানোর কৌশল যখন আবিষ্কার করে ফেলেছি, আর অত ভয় পাই না। এখন থেকে সব সময় মলোটভ ককটেল সঙ্গে রাখব আমি। এবার দেখতে পেলে বাছাধনের আর রক্ষা নেই।

গায়ের ওপর ছুঁড়ে মারব…'

'দেখা পাবে কি করে?' ফোড়ন কাটল ব্রুক। 'এই না বললে স্বচ্ছ? তোমার অজান্তেই এসে তোমার পাটকাঠির মত ঘাড়টা যদি মটকে দেয়? অবশ্য শুধু হাড্ডি খেয়ে মজা পাবে কিনা ওটা কে জানে!'

কথাবার্তা ক্রমশ ঝগড়ার দিকে চলে যাচ্ছে বুঝে তাড়াতাড়ি হাত তুলে থামানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'আহ্, কি শুরু করলে তোমরা? থামো তো!' উঠে দাঁড়াল সে।

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল মুসা।

'দেখে আসি, রেডিও হাউজে কোন খবর আছে কিনা।'

জিনা বলল, 'স্যারকে জানাবে না কুকুর হারানোর কথা?'

'জানাব, সকালে। এখন তাঁকে জানিয়েও লাভ নেই। নিশ্চয় গবেষণায় মগ্ন। অহেতুক বিরক্ত করা হবে। বরং আমাদের কাজ আমরা করে যাই।'

একা কিশোরকে বেরোতে দিল না মুসা। সঙ্গে চলল। রেডিও হাউজে এসে ঢুকল দুজনে। রেডারের পর্দায় আটকে আছে রবিনের চোখ। কিশোরের সাড়া পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, 'একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে!'

'খাইছে! সবখানেই অদ্ভুত কাণ্ড নাকি?' অবাক হয়ে বলল মুসা।

'কেন? আবার কোথায় কি ঘটল?'

সংক্ষেপে কুকুর উধাওয়ের ঘটনাটা রবিনকে জানাল মুসা।

কিশোর জানতে চাইল, 'তোমার অদ্ভুত ঘটনাটা কি?'

পর্দার একটা জায়গা দেখিয়ে বলল রবিন, 'এই দেখো, কুয়াশার মত লাগছে না? শুধু দিনের বেলাতেই এ জিনিস দেখা যাওয়ার কথা। এটা কুয়াশা নয়। পাখির ঝাঁক। রাতে পাখি উড়ছে কেন? আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল, এখন তোমাদের কথা শুনে আরও শিওর হলাম। এর একটাই জবাব—পাখিদের বাসায় গিয়ে হামলা চালিয়েছে কেউ। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে রাতের অন্ধকারেই আকাশে উঠে গেছে ওগুলো।'

কুঁচকে গেল কিশোরের ভুরু। 'তারমানে কুকুরটাকে নিয়ে যাওয়ার পর এখন পাখির বাসায় গিয়ে হানা দিয়েছে! এত তাড়াতাড়ি চলে গেল? যেমন বড়, তেমন শক্তিশালী, আর তেমনি দ্রুতগতি প্রাণী। দানবই তো মনে হচ্ছে!'

'দেখতে যাওয়ার কথা ভাবছ নাকি আবার?' তাড়াতাড়ি বলল মুসা, 'দেখো, আমার কথা যদি শোনো তো বলি, এখন যাওয়ার কোন দরকার নেই। গেলেও পাখিগুলোকে বাঁচাতে পারব না আমরা। যারা মরার তারা ইতিমধ্যেই দানবের পেটে চলে গেছে। বাকিগুলোকে আর ধরতে পারবে না। ওরা আকাশে। নিরাপদ না বুঝলে আর নামবে না।'

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর। তারপর বলল, 'না গেলেও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে আজ রাতেও। বলা যায় না কখন আবার মানুষের আস্তানায় এসে হামলা চালায়। ওটা যে মানুষখেকো, ক্যাপ্টেনের লাশটাকে নিয়ে যাওয়াই তার প্রমাণ। আরও একটা জিনিস স্পষ্ট হলো, শুধু রাতের বেলাতেই হামলা চালায় ওটা। দিনে বেরোয় না।'

নিজের অজান্তেই মুসার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'ড্রাকুলা!'

কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিল না কিশোর, 'ড্রাকুলা না হলেও ড্রাকুলার মতই কিছু—যে দিনে ঘুমায়, রাতে জাগে। শুধু রক্ত খায় না, হাড়-মাংস সব খায়। ড্রাকুলা হলো ভূত, অবাস্তব; আর এটা অতিমাত্রায় বাস্তব, একেবারে আমাদের মত।'

হেডকোয়ার্টারের চারপাশ ঘিরে পাহারার ব্যবস্থা হলো। আলাদা আলাদা থাকবে না কেউ। একসঙ্গে দুজন করে একজায়গায় পাহারা দেবে একজনের হাতে টর্চ থাকবে, আরেকজনের বন্দুক। কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে যাতে যেতে না হয়। অজানা যে জীবই চোখে পড়ুক, নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে আগে, তারপর অন্য কথা।

মেয়েদের জোর করে শুতে পাঠিয়ে দিল কিশোর। যাদের পাহারা নেই, তাদেরও যেটুকু পারে ঘুমিয়ে নিতে বলল। নিজে ঘুমাল না। বসে রইল বিনোদন কক্ষে। কেউ কিছু দেখলে কিংবা শুনলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে এসে তাকে খবর দিতে পারে।

মাঝরাতে তারাগুলোকেও যখন মেঘে ঢেকে দিয়ে চতুর্দিক ঘনঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দিল, তখন একটা গুলির শব্দ হলো। চিৎকার করে উঠল একটা কুকুর।

লাফ দিয়ে উঠে ছুটে বেরোল কিশোর।

গুদামের পাশে ফাঁকা জায়গাটায় মুসার সঙ্গে পাহারা দিচ্ছিল পটার নামে একটা ছেলে। তার হাতে ছিল বন্দুক।

গুদামের সামনে একটু আগেও আলো ছিল, এখন অন্ধকার। আলোটা নিভে গেছে।

রান্নাঘরের দিক থেকে দৌড়ে এল মুসা।

'কোথায় গিয়েছিলে?' জানতে চাইল কিশোর।

'বাল্ব আনতে।' গুদামের সামনের অন্ধকার জায়গাটার দিকে হাত তুলল মুসা, 'ওখানকার বাল্বটা ফিউজ হয়ে গিয়েছিল। বাল্বের জন্যে গুদামে ঢুকতে সাহস পাইনি। রান্নাঘরের বাড়তি বাল্বটা খুলে এনেছি।'

'গুলি করল কে? পটার নাকি?'

'তাই তো মনে হয়।'

'কোথায় ও?'

'এদিকেই তো ছিল।' গলা চড়িয়ে ডাকল মুসা, 'পটার! ও পটার!'

জবাব নেই।

বিশ ফুট দূরে গুদামের একটা অন্ধকার কোণের ওপাশ থেকে ডাকতে ডাকতে জেনারেটর হাউজের দিকে চলে যাচ্ছে কুকুরটা। কোন কিছু দেখেছে নিশ্চয়।

'ওদিকেই আছে কোথাও!' দৌড় দিল কিশোর।

টর্চ হাতে তার সঙ্গে ছুটল মুসা।

এদিক ওদিক কয়েকটা ঘরের দরজা খুলে গেল। দৌড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল অনেকে। টেরিও একটা কাপড়ের থলেতে কয়েকটা বোমা নিয়ে ছুটে বেরোল।

গুদামের কোণ ঘুরে এসে অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। পটারকে দেখা গেল না। বেশি আলো দেয়ার জন্যে মাতব্বরি করে একটা বোমা ফাটিয়ে দিল টেরি। আওয়াজে সবাই চমকে গেলেও কাজ হলো অবশ্য তাতে। অনেকখানি জায়গা আলোকিত হয়ে গেল।

সেই আলোতেও কোথাও দেখা গেল না পটারকে। শুধু ওর হাতের শটগানটা পড়ে থাকতে দেখা গেল একজায়গায়। কুকুরটা ডাকতে ডাকতে সরে গেছে রেডিও হাউজ আর জেনারেটর হাউজের মাঝের ফাঁকা জায়গাটায়।

সেদিকে ছুটে গিয়ে দমাদম আরও দুটো বোমা ফাটাল টেরি। এবং সর্বনাশ করে দিল। অন্ধকারে নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি। একটা বোমা গিয়ে পড়ল জেনারেটর রুমের কাছে। আগুন ধরে গেল ডিজেলের ড্রামে। ভয়াবহ শব্দ করে ফাটতে শুরু করল।

আগুন লেগে বন্ধ হয়ে গেল জেনারেটর। দপ করে নিভে গেল সমস্ত বাতি। আগুনের আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই।

হোস পাইপ আনতে আনতে রেডিও হাউজেও আগুন ধরে গেল। রবিন আর দুটো ছেলে ড্রাম ফাটার শব্দ শুনেই বেরিয়ে চলে এসেছে। তখন না বেরোলে আর বেরোতে পারত না। আগুনে পুড়ে মরত।

চেঁচামেচি শুনে ডক্টর বেঞ্জামিনও ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এলেন। বোকা হয়ে তাকিয়ে রইলেন জ্বলন্ত রেডিও হাউজটার দিকে। কি হয়েছে, জিজ্ঞেস করতেও যেন ভুলে গেলেন।

এই হট্টগোলের মাঝে কুকুরটার কথা আর মনে রইল না কারও।

বারো

ভয়ানক একটা রাত কাটল। ভোর হয়ে এল। যেন বহুকাল পর অন্ধকারের বুক চিরে একমুঠো আশীর্বাদের মত পুব আকাশের কোলে ছড়িয়ে পড়ল আলোর নিশানা। পশ্চিম থেকে আসছে সমুদ্রের একটানা গর্জন। দ্বীপের মানুষগুলোর অসহায় অবস্থার কথা জেনে গিয়ে করুণার হাসি হাসছে যেন।

রেডিও হাউজ পুড়ে যাওয়ায় সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গাউ আইল্যান্ডের যোগাযোগ। বাতাসের নিষ্ঠুর দাপটে কেঁপে কেঁপে উঠছে ছাউনিগুলো। একপাশে কাত হয়ে গিয়ে কাঁপছে নিঃসঙ্গ বেলুনটা।

গোধূলির মত মলিন ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়তেই দরজা খুলে একে একে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল ছেলেমেয়েরা। মেরুরাত্রি শুরু হতে বেশি বাকি নেই। এই বিচিত্র আলো তারই পূর্বাভাস। চতুর্দিকে তেল আর ছাইয়ের গন্ধ।

ছাইয়ের গাদার ফাঁকে রেডিও হাউজের কিছু অংশ এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে।

সবাই বেরোল, একমাত্র পটার ছাড়া। গতরাতে গায়েব হওয়ার পর ফিরে আসেনি সে। ওর যে আর ফেরার আশা নেই, এতক্ষণে সেটা বুঝে গেছে সকলে। মুষড়ে পড়েছে সবাই। আতঙ্কিত।

কুকুরটাও ফেরেনি।

নিরানন্দ ভঙ্গিতে, মুখ নিচু করে নাস্তা সারল ওরা। অনেকেই খেতে পারল না। মেয়েরা খেল সবচেয়ে কম। কোনমতে কিছু মুখে গুঁজল শুধু।

খাওয়া শেষ করে দুই সহকারীকে নিয়ে ওঅর্কশপের দিকে চলে গেল মুসা। যা হবার হয়েছে। বসে বসে দুশ্চিন্তা করলে কাজ এগোবে না।

রেডিও হাউজ পুড়ে যাওয়ায় রবিনের চাকরি খতম। অসহায়ের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। বলল, 'চলো, পটার যেখানে গায়েব হয়েছে জায়গাটা আরেকবার দেখে আসি।'

রাতে একবার দেখেছে। এখন দিনের আলোয় ভালমত দেখতে লাগল কিশোর। মাটিতে ছোট ছোট নুড়ি পড়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে শ্যাওলা আর বুনো ঘাস। এ মাটিতে কোনও জানোয়ারের পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দু'একটা নুড়ি মনে হলো স্থানচ্যুত হয়ে আছে।

'কিছু নেই এখানে,' রবিন বলল।

'তাই তো দেখছি। চলো, জঙ্গলে ঢুকব। যেখানে কাল রাতে কুকুরটা গায়েব হয়েছে।'

'নতুন কিছু পাবে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'রাতে মুসা আর টেরিকে নিয়ে যখন জঙ্গলে ঢুকলাম, একটা অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছি, যেটা ওখানে থাকার কথা নয়, অথচ ছিল। কিংবা থাকার কথা ছিল, কিন্তু ছিল না।'

'কি?'

'সেটাই তো মনে করতে পারছি না। এখন গিয়ে দেখতে চাই, ওটা আছে কিনা।'

বন্দুক হাতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল কিশোর। এখন দিনের বেলা ভয় থাকার কথা নয়, তবু গা ছমছম করতে লাগল। একটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে বুক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলল সে। পেছনে রবিন।

হাঁটা সহজ নয় মোটেও। দিনের বেলা গাছপালা তো আর অন্য রকম হয়ে যায়নি, আগের মতই আছে, ঘন, দুর্ভেদ্য। ওগুলো সরিয়ে চলতে গিয়ে রাতের মতই কষ্ট হলো।

যেখানটাতে বোমা ফাটিয়েছিল টেরি, সেখানে এসে দাঁড়াল দুজনে। রবিনকে ভালমত দেখতে বলে নিজেও দেখতে শুরু করল কিশোর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব। কিছুই পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে আবার আস্তানায় ফিরে চলল ওরা।

ফিরেই একটা নতুন খবর পেল। গতরাতে যে কুকুরটা পটারের পেছনে

ডাকতে ডাকতে গিয়েছিল. সেটাকে পাওয়া গেছে। একটা বড় পাথরের চাঙড়ের ধারে, ফাটলের কিনারে। মারাত্মক আহত অবস্থায়। এতটাই যন্ত্রণা পাচ্ছিল, গুলি করে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন ডক্টর বেঞ্জামিন। লাশটা নিয়ে গেছেন ময়না তদন্ত করার জন্যে।

এই প্রথম দানবের পেছনে লাগা একটা প্রাণীকে ফেরত পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি খোঁজ নিতে চলল কিশোর।

গবেষণাগারে ঢুকে দেখল চিন্তিত ভঙ্গিতে ছাতের দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর। কিশোরকে ঢুকতে দেখেই বলে উঠলেন, 'অদ্ভুত কাণ্ড, বুঝলে। নাকটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। কিসের আঘাতে হলো এমন বোঝা গেল না।'

যতটা আশা নিয়ে গবেষণাগারে ঢুকেছিল কিশোর, ততটাই নিরাশ হয়ে বেরিয়ে এল আবার। কোন ধরনের জন্তু জখম করেছিল কুকুরটাকে, জানা গেল না। তবে ডক্টর একটা জিনিস সন্দেহ করেছেন, তখনই ওদেরকে বললেন না। বলে দিলেন, শিওর হয়ে তারপর জানাবেন।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি করবে এখন?'

'কাজ তো অনেকই পড়ে আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল। 'ভাবছি আরেকটা জায়গা দেখে এসে তারপর শুরু করব।'

'কোন জায়গা?'

'পাখির পাহাড়। গতরাতে অনেকগুলো অঘটন ঘটিয়েছে রহস্যময় জীবটা। প্রথমে একটা কুকুরকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেছে। তারপর গেছে পাখির বাসার দিকে। সেখান থেকে ফিরে এসে উধাও করেছে পটারকে। আরেকটা কুকুরকে জখম করেছে। জঙ্গল আর ঘরের পেছনে তো দেখলাম। এখন শুধু পাহাড়ে দেখা বাকি।'

'কিন্তু ওখানেও কিছু পাব বলে মনে হয় না।'

'তবু দেখা দরকার। বলা যায় না কোথায় কি সূত্র ফেলে গেছে জীবটা। সূত্র খোঁজার ব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা করা উচিত নয় আমাদের।'

'বেশ, চলো তাহলে।'

'কিংবা আরেক কাজ করতে পারো। আমার তো এদিকে অনেক কাজ। কাউকে সঙ্গে নিয়ে তুমিই বরং চলে যাও। ভাল করে দেখে এসোগে জায়গাটা।'

'আমার আপত্তি নেই…'

'আমি যদি সঙ্গে যাই?' পেছন থেকে বলে উঠল টেরি।

ফিরে তাকাল কিশোর আর রবিন। কখন নিঃশব্দে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল টেরি। এমনিতেই শুকনো, গতরাতে অঘটনটা ঘটানোর পর মর্মযাতনায় আরও শুকিয়ে গেছে বেচারার মুখ। তাকানো যায় না। মায়াই লাগল কিশোরের। বলল, 'ঠিক আছে, যাও

তবে শেষ পর্যন্ত রবিন আর টেরিকে একলা যেতে দিল না কিশোর। টেরিকে বিশ্বাস নেই। কোন সময় আবার কি অঘটন ঘটিয়ে বসে। তা ছাড়া একটা দুর্ভাগ্যও যেন লেগে থাকে ওর সঙ্গে। ভাল করতে চাইলেও মন্দ হয়ে

যায়। সঙ্গে আরও তিনজনকে দিয়ে দিল। বার বার সাবধান করে দিল ওদের, সন্দেহজনক কোন কিছু দেখতে পেলে ঝুঁকি নিয়ে তার কাছে যেন না যায়। যদিও তার ধারণা, দিনের বেলা উধাও হয়ে যাওয়ার মত কোন ঘটনা ঘটবে না। কারণ জন্তুটা শুধু রাতের বেলা বেরোয়।

পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেল পাঁচজনের দলটা। ওরা ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর আনমনে একটা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

প্রচুর কাজ।

জেনারেটর বাতিল। রাতে আলোর ব্যবস্থা করতে হলে অনেকগুলো মশাল দরকার। বানাতে হবে। আরও নানা রকম টুকিটাকি কাজ আছে।

রেডিও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। যন্ত্রটা এমনভাবে পুড়েছে, কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘক্ষণ খবর না পেলে চিন্তিত হয়ে আবার প্লেন পাঠাতে পারে ভ্যালপারাইসোর কর্তৃপক্ষ। নামতে না পারলে এসেও ফেরত যাবে শুধু শুধু। ওটা আসার আগেই যদি ল্যান্ডিং প্লেসটা পরিষ্কার করে ফেলা যেত, ভাল হত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়।

বিনোদন কক্ষে সবাইকে জড়ো করে যার যার কাজ ভাগ করে দিল কিশোর। তারপর রওনা হলো মুসারা কি করছে দেখার জন্যে।

কাজে ব্যস্ত মুসা আর তার দুই সহকারী। কিশোরকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল মুসা, 'কি?'

'দেখতে এলাম, কতখানি এগিয়েছ।'

'আজ রাতের মধ্যেই লেজটা উঁচু করে ফেলতে পারব আশা করি।'

আরও দু'চারটা টুকটাক কথা বলে বেরিয়ে এল কিশোর। অহেতুক বকর বকর করে ওদের কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর কোন মানে হয় না।

বাইরে তখন সাজ সাজ রব। মশাল তৈরি করা; আরও নানা রকম কাজ। মশালের জন্যে তেল দরকার। জেনারেটর হাউজের ভেতরে আর বাইরে যেসব ড্রাম ছিল, সেগুলো সব পুড়েছে। তবে অসুবিধে নেই। প্রচুর পেট্রল, ডিজেল আর কেরোসিনের ড্রাম স্টক করা রয়েছে এখনও গুদামে। তা ছাড়া তেলের খালি ড্রামও আছে অনেক। সেগুলোকে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বিনোদন কক্ষের চারপাশে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। ব্যারিকেড। এর ওপর মশাল রাখার ব্যবস্থা হবে। আগুনের ঘেরের মধ্যে ঢুকতে সাহস করবে না অজানা জন্তুটা। তাতে রাতের বেলা নিরাপদে থাকা যাবে।

সবাই ব্যস্ত। সবাই গম্ভীর। এর মধ্যে মজার ঘটনাও ঘটল। আলমারির কাপড়-চোপড় গোছাতে গিয়ে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল ক্যাথি নামে একটা মেয়ে। আতঙ্কে কোটর থেকে ছিটকে বেরোবে যেন চোখ। কি ব্যাপার? দানবটা নাকি লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে আলমারি থেকে। লম্বা লেজের বাড়ি লেগেছে মেয়েটার মুখে। ছুটে গেল কিশোর আর আরও অনেকে। দেখা গেল, লেজটা আছে এখনও। একটা পাজামার ফিতে। টান

লাগতে এক মাথা বেরিয়ে এসে বাড়ি খেয়েছিল ক্যাথির মুখে। হাসির ধুম পড়ে গেল।

দুপুর নাগাদ ফিরে এল রবিনরা। জানাল, জন্তুটার কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি। তবে পাখির অনেকগুলো বাসা ভাঙা পেয়েছে। ডিম থেঁতলানো। ছেঁড়া পালক ছড়িয়ে আছে।

'আর কিছুই দেখনি?' জানতে চাইল কিশোর।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন, 'নাহ্।'

তেরো

দুপুরে খাওয়ার পর গুদাম আর পোড়া রেডিও হাউজের মাঝের ছাইগাদায় কি যেন খুঁজতে বেরোলেন ডক্টর। বেলচা দিয়ে ছাই সরিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। ওখান থেকে খানিক দূরে পাওয়া গিয়েছিল পটারের বন্দুকটা।

ব্যাপারটা লক্ষ করল কিশোর আর রবিন। কি খুঁজছেন তিনি দেখার জন্যে এগিয়ে গেল।

ওরা কাছে যাওয়ার আগেই বেলচা ফেলে দিয়ে একটা প্রজাপতি ধরার জাল নিয়ে খোঁড়া গর্তের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন তিনি। কি যেন তুলে নিয়ে একটা কাঁচের বয়ামে ভরলেন। কাছে গিয়ে দেখা গেল প্রবল উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে তাঁর মুখ। কাঁপছেন রীতিমত। কিশোরদের দেখে বলে উঠলেন। 'জানি না এটাই কুকুরটার মৃত্যুর কারণ কিনা!'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর, 'কি, স্যার?'

বয়ামটা দেখালেন ডক্টর। ভেতরে মাটির গুঁড়োর মধ্যে অদ্ভুত কি যেন নড়ছে। কাঁচের দেয়াল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে।

'কি এটা?'

'জানি না।'

'বুঝলেন কি করে, এখানে আছে?'

'কিছুটা অনুমান। কাল রাতে রেডিও হাউজটা যখন পুড়ছিল, পায়ের কাছে খসখস আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালাম। দেখি এটা কিংবা এরই মত অন্য একটা জীব গর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন গুরুত্ব দিইনি। আজ কুকুরটাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে মনে হলো, ওর নাকের ক্ষতটা এ ধরনের কোন পোকায় করে দেয়নি তো? এটাই হয়তো কামড়ে দিয়েছিল বেচারাকে, যে জন্যে মরতে হলো।'

'তারমানে এটা বিষাক্ত পোকা? কিন্তু এখানে ঘাঁটি বানানোর আগে তো তন্নতন্ন করে সমস্ত দ্বীপ চষে বেড়িয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ঘোষণা করে দিয়েছেন কিছু ছোট মাকড়সা ছাড়া আর কোন পোকামাকড় বা বিষাক্ত সাপ নেই।'

'এটা এখানকার স্থানীয় পোকা বলে মনে হয় না। গাছের বস্তায় ঢুকে প্লেনে করে চলে এসেছে। কিন্তু কি রকম অদ্ভুত, দেখেছ?'

'এখন তো এখানে কত অদ্ভুত ঘটনাই ঘটছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্যার, এত ছোট একটা পোকা নিশ্চয় প্লেনের নয়জন মানুষকে উধাও করে দেয়নি? ক্যাপ্টেনের লাশ, পটার আর কুকুরটাকেও নিয়ে যায়নি? গুদামে গাছগুলোকেই বা ছড়িয়ে দিল কে? এত ভারি গাছ এত খুদে পোকায় সরাতে পারবে?'

'তা তো পারবেই না।'

'কাল রাতে পাখির বাসা লণ্ডভণ্ড করে আসার সাধ্যও এটার নেই। দ্বিতীয় কুকুরটার নাকে এতবড় ক্ষত করার ক্ষমতাও এর আছে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

আনমনে মাথা নাড়লেন ডক্টর। 'হুঁ, আসল রহস্যের সঙ্গে পোকাটার কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটা এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।' আর কিছু না বলে প্রজাপতির জালটা তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন গবেষণাগারের দিকে।

বিকেলের আগেই মোটামুটি কাজ সেরে ফেলল মুসা। বিমানের লেজ উঁচু করার জন্যে বিচিত্র একটা মঞ্চ বানিয়ে চার চাকার ঠেলাগাড়িতে করে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলো।

পিছে পিছে চলল কিশোর আর রবিন। দেখার জন্যে জিনা আর আরও কয়েকজন এগিয়ে এল। প্রয়োজন হলে মুসাকে সহায়তাও করবে ওরা।

বিমানের কাছে নিয়ে গিয়ে মঞ্চটাকে নামানো হলো।

কিশোরের কাছে এসে দাঁড়াল জিনা। 'নতুন কোন খবর আছে?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ডক্টর একটা নতুন পোকা ধরে নিয়ে গেছেন পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। তাঁর ধারণা, দানবটার সঙ্গে এই পোকার কোন সম্পর্ক আছে।'

'সর্বনাশ! এক দানবের জ্বালায়ই তো বাঁচি না! সঙ্গে আবার পোকাও আছে! কি পোকা?'

'স্যার নিজেও জানেন না। তবে বিষাক্ত বলে সন্দেহ করছেন। দ্বিতীয় কুকুরটার মৃত্যুর কারণও নাকি হতে পারে ওটা।'

সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে পড়ল মুসা আর তার সহকারীরা। বেলা তিনটের মধ্যে বিমানের লেজের নিচে বসিয়ে ফেলল সেই বিচিত্র মঞ্চ। এত ভারি বিমানের লেজ উঁচু করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু ঠিকই করে ছাড়ল। বেলা চারটের মধ্যে দুই ফুট উঁচু করে ফেলল।

বাকি বিকেলটা চলল ওই একঘেয়ে, বিরক্তিকর, পরিশ্রমের কাজ। দফায় দফায় বিশ্রাম নিতে হচ্ছে মুসা আর তার সহকারীদের। তবে কাজ এগোল অনেক।

অবশেষে মাথার ওপরে আকাশের রঙ যখন গাঢ় হয়ে এল, পশ্চিমের ম্লান আলোর শীর্ণ আভাটুকুও যখন প্রায় বিলীন হবার পথে, কাজ থামানোর নির্দেশ দিল মুসা। আসল কাজ সেরে ফেলেছে। লেজের দিকের চাকাটা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জায়গামত আটকে গেছে।

অন্ধকারে কাজ করা আর সম্ভব নয়।

মশাল জ্বালানোর নির্দেশ দিল কিশোর।

মোমের আলোয় তাড়াহুড়ো করে ডিনার সেরে নিল সবাই। তারপর জুটল গিয়ে বিনোদন কক্ষে। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন অস্বস্তিকর। পড়াশোনা করার মত আলো নেই। ঘোলাটে আলোয় তাস খেলাও শক্ত। বাতাসে পোড়া তেলের গন্ধ। দিনটা ভালই কেটেছে, কিন্তু রাতের অন্ধকার নামতেই অজানা আশঙ্কা আর আতঙ্ক এসে চেপে ধরল ওদের। কাল রাতে পটার গেছে। আজ কার পালা?

দম বন্ধ করা পরিস্থিতি। বিদ্যুতের অভাবে টেলিভিশন চালানো যাচ্ছে না। রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ। এককোণে কিশোরও কথাবার্তা বাদ দিয়ে চুপ করে বসে আছে। সে নিজেই জানে না কি ঘটতে যাচ্ছে, অন্যদের ভরসা দেবে কি? উৎসাহ জোগানোও সম্ভব নয়।

এই সময় ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলেন ডক্টর বেঞ্জামিন। বিচলিত ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'কিশোর, একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করেছি। এমন কাণ্ড, কল্পনাও করতে পারবে না।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'কি, স্যার?'

'সেটা পরে দেখাচ্ছি। আগে বলো, এ ধরনের পোকা আর কেউ দেখেছ কিনা?'

'কি ধরনের, স্যার?' অনেকেই জানতে চাইল।

'ওই যে যেটা ধরলাম,' বললেন তিনি। কিশোর আর রবিন বাদে আর কেউ দেখেনি। পোকাটা দেখতে কি রকম তখন বুঝিয়ে বলতে হলো তাঁকে।

সবার মুখ দেখেই বুঝলেন ডক্টর, বোঝানোতে কাজ হয়নি। পোকাটার চেহারা কল্পনা করতে পারছে না কেউ। শেষে বললেন, 'দাঁড়াও, নিয়ে আসছি।'

'একা একা এভাবে অন্ধকারে ঘোরাফেরা করবেন না, স্যার। পটারের কথা ভুলে গেছেন?' দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা বন্দুকটা তুলে নিল কিশোর। 'চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল দুজনে। কৌতূহলে ফাটতে থাকা ছেলেমেয়ের দল ঘিরে ধরল ডক্টরকে। তাঁর হাতের বয়ামে কুৎসিত প্রাণীটা নড়ছে।

বয়ামটা তুলে সবাইকে দেখানোর পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি, এখন বলো, এই প্রাণী কেউ দেখেছ?'

টেবিলের ওপর আলোর কাছে বয়ামটা রাখলেন ডক্টর।

জিনা এসে অনেকক্ষণ ধরে দেখে মাথা নাড়ল, 'না, দেখিনি। উফ্, কি কুৎসিত!' পিছিয়ে গেল সে।

কারোরই পছন্দ হলো না জীবটা। হওয়ার কথাও নয়। টেবিলে রাখার পর বয়াম নড়ছে না দেখে জীবটাও শান্ত হয়ে পড়ে রইল তলায়। কাঁটাওয়ালা সবুজ দাড়ার মত অঙ্গগুলো এখন গোটানো। সব মিলিয়ে ইঞ্চি চারেক লম্বা।

শরীরটা দেখলে মনে হয় এক টুকরো শেকড়। গা সরু রোমে ঢাকা। ঝোপের মরা পাতায় নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা শুঁয়াপোকার মত হঠাৎ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

'দেখে তো তেমন সাংঘাতিক কিছু মনে হচ্ছে না, স্যার,' ব্রুক বলল।

'অতি সাধারণ শেকড়ের মত লাগছে,' বলল আরেকটা ছেলে, 'পাতা তিনটে অবশ্য মোটেও ভাল না দেখতে।'

'শেকড়ের সঙ্গে এর তফাৎ হলো শেকড় চলতে পারে না, কিন্তু এটা পারে,' লেকচার দেয়ার ঢঙে ডক্টর বেঞ্জামিন বললেন। 'যে দাড়াগুলোকে সাধারণ বলছ, সেগুলোর প্রচণ্ড অনুভব শক্তি, অনেকটা লজ্জাবতী লতা অথবা পোকামাকড়ভোজী ভেনাস-ফ্লাই-ট্র্যাপের মত। মিমোসা কিংবা ভেনাস-ফ্লাই-ট্র্যাপ জাতীয় উদ্ভিদ হয়ে থাকলে বলতে হবে উদ্ভিদের মধ্যে বিবর্তনের এ এক চরম উদাহরণ। কারণ এটা গুড়ি মেরে এগোতে পারে, যা আজ পর্যন্ত কোন উদ্ভিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর উদ্ভিদ না হয়ে যদি জীব হয়, তাহলে বলতে হবে জীবের সঙ্গে উদ্ভিদের মত এমন অদ্ভুত মিল আজ পর্যন্ত আর কোন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়নি।'

'এটা উদ্ভিদ না প্রাণী, আপনি জানেন না, স্যার?' জানতে চাইল রবিন।

'পেয়েছি তো মাত্র একটা নমুনা। এটাকে কাটাকুটি করে নষ্ট করতে ভরসা পাচ্ছি না। আরও পাওয়া গেলে পরীক্ষা করে দেখব, প্রাণী না উদ্ভিদ। সবাইকে বলে দিচ্ছি যে-ই পাও ধরে নিয়ে আসবে। সাবধান, খালি হাতে ধরতে যেয়ো না। ভয়ানক হিংস্র। বিষাক্তও হতে পারে।'

'প্রাণী হলে তো এটার খাবার লাগে, তাই না, স্যার?'

'খাওয়া তো উদ্ভিদেরও লাগে। খাবার দিয়ে কিছু বোঝা যাবে না। ভেনাস-ফ্লাই-ট্র্যাপও পোকামাকড় খেয়ে হজম করে ফেলে।' বয়ামে হাত রাখলেন ডক্টর, 'এটা যে কি ভয়ঙ্কর প্রাণী দেখাতে পারি তোমাদের।'

'দেখান, স্যার, দেখান,' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল রবিন।

'এক টুকরো মাংস আনা লাগবে।'

'নিয়ে আসছি,' রান্নাঘরে রওনা হলো ব্রুক।

'একা যেয়ো না,' মুসা বলল। 'দাঁড়াও, আমিও আসছি সঙ্গে।'

বন্দুকটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর।

আলোকিত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল ব্রুক আর মুসা। রেফ্রিজারেটর খুলল ব্রুক। দুটো জেনারেটরই নষ্ট হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ নেই। রেফ্রিজারেটর চলছে না। এই অবস্থায় খাবারও তাজা থাকবে না আর বেশিক্ষণ। তবে সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় সময় নষ্ট করল না ওরা।

মাংসের টুকরোটা এনে ডক্টর বেঞ্জামিনের হাতে দিল ব্রুক। বয়ামের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল অদ্ভুত প্রাণীটা। দাড়াগুলো তুলে দিল ওপরে।

টুকরোটা ভেতরে ফেলে দিলেন ডক্টর।

ভয়ঙ্কর এক কাণ্ড করল প্রাণীটা। কাঁটাওয়ালা পাতা দিয়ে বাড়ি মারতে

শুরু করল মাংসের টুকরোর গায়ে, যেন ওটা জীবন্ত কিছু. খাওয়া শুরু করার আগে মেরে নেয়া দরকার। খাড়া হয়ে গেছে শুঁয়াগুলো। থিরথির করে কাঁপছে। বাড়ি মারা শেষ করে এক সময় দাড়া দিয়ে টুকরোটাকে ঢেকে ফেলল প্রাণীটা। কয়েক মিনিটের মধ্যে উধাও হয়ে গেল মাংসের টুকরোটা। এত ছোট একটা প্রাণী ওর চেয়ে বেশি ওজনের মাংস কি করে এত দ্রুত হজম করে ফেলল না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বয়ামের দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করে বিফল হয়ে নতুন খাবারের আশায় ওপর দিকে দাড়া মেলে অপেক্ষা করতে থাকল ওটা।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। হরর ছবির দৃশ্য দেখল যেন। তাকিয়ে রয়েছে পোকাটার দিকে। আচমকা এক চিৎকার দিয়ে ঢলে পড়তে শুরু করল ক্যাথি।

চোদ্দ

সারারাত কেউ ঠিকমত ঘুমাতে না পারলেও নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা। হাই তুলতে তুলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল দরজার কাছে শুয়ে থাকা কুকুরটা। লেজ নেড়ে স্বাগত জানাল।

'কেমন আছিস, বব?'

'ঘাউ' করে জবাব দিল কুকুরটা, যেন বলল, 'ভাল।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। ধূসর রঙ। ইতিউতি ভেসে বেড়াচ্ছে খণ্ড মেঘ।

দানবটার কথা মনে পড়ল। গতরাতে আর ছাউনিতে আক্রমণ চালাতে আসেনি। বোধহয় মশালের আলো এবং আগুন ওটাকে মানুষের আস্তানা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

রানওয়ের দিকে তাকাল সে। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে বিমানটা। তবে আগের চেয়ে লেজ অনেক উঁচুতে। আজকালের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে পারলে অন্য বিমান এসে নামতে পারবে ওখানে। রেডিওতে যোগাযোগ করে খবর না পেলে দু'একদিনের মধ্যে ওরা খবর নিতে আসবেই।

রেডিও হাউজটা গেছে। বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব নয়। তবে অথর্ব বিমানের রেডিওটার প্রেরণ-ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলেও গ্রাহকযন্ত্রটা এখনও ঠিকই আছে। এক কাজ করা যেতে পারে। রবিনকে ওটার সামনে বসিয়ে দিলে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলেও ভ্যালপারাইসোতে ওরা কি ভাবছে, কি করছে হয়তো জানতে পারবে। কোন সন্দেহ নেই ওরা মেসেজ পাঠাতেই থাকবে। এখান থেকে সাড়া না পেলে চিন্তিত হয়ে আরও বেশি করে পাঠাবে।

গুদামের দরজার দিকে চোখ পড়ল ওর। খোলা। গতরাতে বন্ধ করেনি নাকি?

পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। কুকুরটা গেল তার সঙ্গে সঙ্গে।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। অন্ধকার। কিছু দেখা গেল না।

ভেতরে ঢুকল সে। সুইচের জন্যে হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল। মনে পড়ল, জ্বলবে না। জেনারেটর নষ্ট। দরজার কাছে থেকে তাকিয়ে রইল ভেতরে। ক্রমে চোখে সয়ে এল অন্ধকার। আবছামত দেখা যাচ্ছে ভেতরের জিনিসগুলো।

খাঁচাগুলোর দিকে নজর পড়তেই কুঁচকে গেল ভুরু। পাখিগুলোর কোন নড়াচড়া নেই কেন? এগিয়ে গেল সেদিকে। খাঁচার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। সবগুলো খাঁচা খালি। একটা পেঙ্গুইনও নেই। গতকাল বিকেলেও ছিল। ব্রুক এসে খাইয়ে গেছে। বেরোল কিভাবে?

ভাল করে দেখে বুঝল, নিজে থেকে বেরোয়নি ওগুলো। খাঁচার দরজা বাইরে থেকে ভেঙে বের করে নেয়া হয়েছে। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল কিশোরের। নিশ্চয় দানবটার কাজ! গতরাতে মানুষ বা কুকুর না পেয়ে পেঙ্গুইনগুলোকেই সাবাড় করেছে।

ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগল সে। বাক্স, বস্তা, টিন, ড্রাম—পরিচিত সমস্ত জিনিস। অস্বাভাবিক কোন কিছু নজরে পড়ল না। তারমানে এ ঘরে নেই এখন দানবটা।

দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে গুদাম থেকে বেরিয়ে এল কিশোর।

বেরিয়েই দেখে আরেক কাণ্ড। খানিক দূরে মাটিতে নাক নামিয়ে গন্ধ শুঁকছে কুকুরটা। নড়ে উঠল কি যেন। চট করে লাফিয়ে সরে গেল কুকুরটা। ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

দৌড়ে গেল কিশোর। একটা পোকা। তিনটে দাড়া তুলে আক্রমণের ভঙ্গি করে রেখেছে।

চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'বব, খবরদার! কাছে যাবি না! জলদি সরে আয়!'

কুকুরটাকে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে পোকাটার গায়ে লাথি মারতে আরম্ভ করল সে। রবারের গায়ে জুতো পড়ছে যেন। কিছুতেই নরম হতে চায় না পোকাটা। মরতে চায় না। অথচ ওটার সমান অন্য যে কোন পোকা এ রকম এক লাথিতেই ভর্তা হয়ে যেত।

কিশোরকে উত্তেজিত দেখে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল কুকুরটাও।

পোকাটা মেরে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে সাবধানে তাতে তুলে নিল কিশোর। সোজা রওনা হলো ডক্টরের ল্যাবরেটরিতে। টেবিলে পা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে আছেন তিনি। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। সারারাত ঘুমাননি মনে হচ্ছে। কিশোরকে উত্তেজিত হয়ে ঢুকতে দেখে পা নামালেন। 'কি ব্যাপার?'

কাগজটা বাড়িয়ে দিল কিশোর, 'একটা পোকা ধরে এনেছি, স্যার। তবে পা দিয়ে পিষে ভর্তা বানিয়ে ফেলেছি। এতে কি কোন কাজ হবে?'

'দাও। এক্ষুণি কাটব।'

পোকাটা টেবিলে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিশোর, ডাক দিলেন ডক্টর, 'শোনো। ব্রুককে এক কাপ কফি দিয়ে যেতে বলো, প্লীজ। কড়া করে।'

'আচ্ছা।'

খাবার ঘরে অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো। জিনা, মুসা, রবিন সবাই আছে। হাত তুলে ওকে ইশারায় ডাকল মুসা। কাছে যেতে বলল, 'আজ প্লেনটা সরিয়ে ফেলব, যে করেই হোক। ছেলেদের সবাইকে তুমি বলে দিয়ো, কোথাও যেন না যায়। আমাকে সাহায্য করতে হবে।'

'ঠিক আছে, বলে দেব।'

'নাস্তা করবে না?'

'করব।' এদিক ওদিক তাকিয়ে ব্রুককে দেখে ডাক দিল কিশোর, 'ব্রুক, স্যারকে এক কাপ কফি দিতে বলেছেন। কড়া করে। সারারাত ঘুমাননি।'

নাস্তা শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে কিশোর, এই সময় নজর পড়ল টেরির ওপর। এককোণে একটা টেবিলে বসে আছে চুপচাপ। বিমর্ষ। তার নাস্তা খাওয়া শেষ। জেনারেটর আর রেডিও হাউজ পুড়িয়ে দেয়ার দুঃখটা ভুলতে পারছে না এখনও বেচারা। কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই একবার দ্বিধা করে ডাক দিল, 'কিশোর, আসবে একটু? কথা আছে।'

পিরিচে করে চায়ের কাপটা নিয়ে ওর টেবিলে গিয়ে বসল কিশোর। 'বলো?'

আবার দ্বিধা করতে লাগল টেরি। উসখুস করে বলল, 'আমার কথা তো এখন আর বিশ্বাস করবে না। এখন আর কেউ আমাকে দেখতেও পারে না। তুমিও না...'

'কি হয়েছে, তাই বলো। কিজন্যে ডেকেছ?'

চায়ের কাপে চুমুক দিল টেরি। 'বলব? বিশ্বাস করবে?'

'বলোই না।'

আবার কাপে চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল টেরি। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মুখ তুলে বলল, 'আজ ভোরে উঠেই পাহাড়ে গিয়েছিলাম। পাখিগুলোকে দেখতে। মনে হচ্ছিল, গাধামি করে সবাইকে তো ভয়ানক বিপদে ফেললাম। এখন উদ্ধার করার দায়িত্বও আমার। তাই কিছু একটা করার জন্যে...'

'কি দেখলে?'

'তছনছ করে ফেলেছে সব।'

'তাই নাকি? তারমানে কাল রাতেও হানা দিয়েছিল ওখানে?'

মাথা ঝাঁকাল টেরি। 'আর কয়েক দিন এ রকম হামলা চললে পাখির চিহ্নও থাকবে না এ দ্বীপে।'

'দানবটার কোন চিহ্ন পেয়েছ? পায়ের ছাপটাপ?'

মাথা নাড়ল টেরি। 'আমার কি মনে হয় জানো? বললে তো হাসবে। দানব একটা নয়, অনেকগুলো।'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের. 'এ কথা কেন মনে হলো তোমার?'

'আক্রমণের ধরন দেখে। একটা দানব হলে একদিকের বাসা আর ডিম নষ্ট হত। কিন্তু নষ্ট হয়েছে অনেক জায়গার। একই দানব কয়েক জায়গায় নষ্ট করতে পারবে না তা নয়, তবে দেখেই চট করে মনে হয়, অনেকগুলো দানব বিভিন্ন দিক থেকে এসে একযোগে আক্রমণ চালিয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি নিজে গিয়ে দেখে আসতে পারো।'

পনেরো

খাওয়ার পর পরই দলবল নিয়ে কাজে লেগে পড়ল মুসা। বিমানের সামনের দিকটা বেজায় ভারি। নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে অনেকে মিলে চেষ্টা করেও সামান্য একটু কাঁপানো ছাড়া কিছুই করতে পারল না বিমানটার। তবে দমল না ওরা। দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। জানে, বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চাইলে এখন ওদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো ওটাকে সরানো। বাইরের কোন বিমান নামতে না পারলে আর দু'চারদিন পর খাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। রেড বলে গেছে জাহাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সে জাহাজ কবে আসে তার কোন ঠিক নেই। রেফ্রিজারেটরের খাবার পচতে সময় লাগবে না।

ছেলেরা প্রায় সবাই ওখানে কাজ করছে। এই সময় রান্নাঘর থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার। দৌড় দিল কিশোর। ঘরে ঢুকে দেখল, এককোণে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে ক্যাথি। হাতা দিয়ে মেঝেতে একটা পোকাকে পিটাচ্ছে ব্রুক। কিছুতেই মরছে না ওটা। সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

ছুটে গিয়ে তাক থেকে একটা বাটি নিয়ে এল কিশোর। ব্রুকের হাত থেকে চামচটা নিয়ে পোকাটাকে তুলে রাখল বাটিতে। তাড়াতাড়ি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিল বাটিটা।

সকালে উঠেই দু'দুটো পোকা পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে ওগুলো। খাবারের গন্ধে হাজির হতে শুরু করেছে রান্নাঘরে। ব্রুক আর ক্যাথিকে সাবধান থাকতে বলে বাটিটা নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। ওর দেরি দেখে বিমানের কাজ ফেলে রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছে রবিন আর-আরও কয়েকজন।

রবিন জানতে চাইল, 'কি? চিৎকার করল কেন?'

পোকাটার কথা জানাল কিশোর। দিয়ে আসতে চলল ডক্টরকে।

ঘণ্টাখানেক পর বিমানের সামনের দিকটাও প্রায় দেড় ফুট উঁচু করে ফেলা হলো। কায়দা পেয়ে গেছে মুসা। এখন তুলতে আর অত সময় লাগবে না। কোনমতে সামনের চাকাগুলো মেলে তাতে দাঁড় করাতে পারলেই হয়। ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাবে তখন। আশা করছে, পারবে সরাতে।

ঠিক এই সময় আবার চেঁচামেচি শোনা গেল। এবার বিনোদন কক্ষে।

নিশ্চয় আবার কেউ পোকা দেখেছে। সবাইকে কাজ করতে বলে আবারও দৌড়ে গেল কিশোর। জিনা আর আরও দু'তিনটে মেয়ে রয়েছে সেখানে। বিমান সরানোর কাজ ফেলে বাথরুম সারতে এসেছিল ডিক। জুতো দিয়ে একটা পোকাকে পিষে মারার চেষ্টা করছে সে। মেরে ফেলার পর বোকার মত নিচু হয়ে হাত দিয়ে তুলতে গেল সেটাকে। আর অমনি এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ। মরেই যাবে যেন, এই অবস্থা।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন ডক্টর বেঞ্জামিন। ডিককে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন। যে আঙুল দিয়ে ধরেছিল ডিক, চামড়া যেন পুড়ে গেছে। ক্ষত-বিক্ষত। প্রচণ্ড জ্বালা। কুকুরটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলতে হয়েছিল ওটাকে। ডিকের কি অবস্থা হবে?...আর ভাবতে চাইল না সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ফ্যাকাসে মুখে গবেষণাগারে ফিরে গেলেন ডক্টর।

কয়েক মিনিট পর রান্নাঘরের বাইরে আরেকটা পোকা পেয়ে জ্যান্ত ধরে ফেলা হলো। সকাল থেকে বেড়ে গেছে ওগুলোর আনাগোনা। যতই আসবে উৎপাতও বাড়বে। এ ভাবে আসতে থাকলে রাতে ভয়ানক অবস্থা হবে। অন্ধকারে কি যে ক্ষতি করবে ওরা খোদাই জানে!

বিমান উঁচু করার কাজ এগিয়ে চলল। দুপুর নাগাদ অনেকখানি উঁচু করে ফেলা হলো সামনের দিকটা। আর সামান্য তুলতে পারলেই চাকার ওপর দাঁড় করানো যাবে।

দুপুরে ডক্টরকে খাবার ঘরে না দেখে তাঁকে ডাকতে ল্যাবরেটরিতে চলল কিশোর। দরজা খুলে দেখল সকালের মতই টেবিলে পা তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন তিনি। কিশোরের সাড়া পেয়ে পা নামালেন। 'বোসো।'

'পোকাটাকে পরীক্ষা করেছেন, স্যার?'

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর।

'কিছু বোঝা গেল?'

'এখনও শিওর হতে পারছি না। মোটেও স্বাভাবিক প্রাণী নয়। আদিম। বড়ই অদ্ভুত।'

'ওঅর্ম-লেক থেকেই এসেছে?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে,' ডক্টরের কণ্ঠে অস্বস্তির ছোঁয়া। 'লাখ লাখ বছর ধরে বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ওঅর্ম-লেক। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী এখনও ওখানে বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়। অস্ট্রেলিয়া বিচ্ছিন্ন হয়েছে মাত্র সেদিন। তা-ও ওখানে কত বিচিত্র প্রাণীর বাস। আর ওঅর্ম-লেক তো হয়েছে অস্ট্রেলিয়ারও বহু বহু আগে। সেখানকার পরিবেশ, সেখানকার আবহাওয়া বাইরের পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি অস্বাভাবিক আর বিচিত্র, ফলে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিচিত্র প্রাণীর জন্ম কিংবা টিকে থাকাটা অবৈজ্ঞানিক নয় মোটেও...'

অপেক্ষা করতে থাকল কিশোর। কিন্তু আর কিছু বললেন না ডক্টর। নিজের চিন্তায় ডুবে আছেন। শেষে বলল কিশোর, 'খাবার দেয়া হয়েছে, স্যার। যাবেন না?'

'উঁ?' উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর। 'চলো।

খাবার ঘরে ঢুকে জানা গেল, আরও একটা পোকা ধরা পড়েছে। টেবিলের পা বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিল। দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে জিনা। কিশোরের মতই চামচ দিয়ে ওটাকে চেপে ধরে বাটিতে আটকে ফেলেছে মুসা।

পোকার ভয় সবার মাঝেই সংক্রমিত হয়েছে। একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে খাওয়া সারল সবাই। এই প্রথম খাবার ঘরে কোন রকম খোশগল্প কিংবা হই-চই হলো না।

নীরবে খাওয়া সেরে যে যার কাজে চলে গেল। মুসা তার দলবল নিয়ে চলে গেল বিমানটাকে তুলতে। রবিনকে রেডিওর সামনে বসে খবরাখবর শুনতে বলল কিশোর। ব্রুক আর মেয়েরা রয়ে গেল খাবার ঘরে। প্লেট ধোয়া থেকে শুরু করে রাতের খাবার রান্না—কাজ এখানেও কম নয়। পোকাগুলোর আনাগোনা যেহেতু এদিকেই বেশি, রান্নাঘরে যারা থাকবে তাদের সবচেয়ে বেশি সাবধান থাকা দরকার—বলে গবেষণাগারে চলে গেলেন ডক্টর।

ঘণ্টাখানেক পরেই উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। জানালেন, 'পোকা ঠেকানোর একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি। জ্বালানী তেল। পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন যা-ই ফেলে রাখা হোক না কেন, সেটা এড়িয়ে চলে ওগুলো। কাছে যায় না। আমরা যেখানে থাকব, তার চারদিকে তেলের ব্যারিকেড দিয়ে রেখে দেখা যেতে পারে। ওই ব্যারিকেড ডিঙিয়ে হয়তো ঢুকবে না পোকাগুলো।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল কিশোর, 'কিন্তু সমস্ত দ্বীপে তো আর এভাবে ব্যারিকেড দিয়ে রাখা যাবে না। হাঁটাচলা করতেই হবে আমাদের। কখন কোথায় কার গায়ের ওপর উঠে পড়ে ওগুলো, বলা মুশকিল। শুধু ঠেকালে চলবে না, ওগুলোকে মারার কোন ওষুধ আবিষ্কার করতে হবে।'

'তা-ও করেছি,' হাসিমুখে বললেন ডক্টর। 'অ্যামিনো ট্রায়াজোল। মাংসে মাখিয়ে খেতে দিয়েছিলাম কয়েকটা পোকাকে। সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পেয়েছে।'

'অ্যামিনো ট্রায়াজোল? এই জিনিস তো জানি বাগানে ফুলের কেয়ারিতে পোকা মারার জন্যে ব্যবহার করা হয়। পেলেন কোথায়, স্যার?'

'ছিল, গুদামে। খুব বেশি নেই যদিও। ভবিষ্যতে কেবিনগুলোর সামনে বাগান করা হবে এরকম ভেবেই বোধহয় খানিকটা অ্যামিনো ট্রায়াজোল পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এখানে। পোকা মারার ওষুধ খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেছি বয়ামটা। নিশ্চয় জানো, এটা মারাত্মক বিষাক্ত। পোকা তো বটেই, ছোটখাট প্রাণীও মরে যায়।'

'দানবটাকেও যদি মারা যেত!' আনমনে কথাটা বলে ফেলল কিশোর।

মাথা নাড়লেন ডক্টর। 'উঁহু, সম্ভব না। ওটা যে জাতের প্রাণীই হোক না কেন, অনেক বড় আর শক্তিশালী। ওটাকে মারতে অ্যামিনো ট্রায়াজোল কাজ দেবে না। পটাশিয়াম সায়ানাইড দরকার। অবশ্য তাতেও মরবে কিনা জানি না। জীবটা যে কি, ওই ব্যাপারেই তো শিওর নই এখনও...যা যা জেনেছি,

বললাম। সেই মত ব্যবস্থা করো। যাই। জরুরী কাজ পড়ে আছে।…'

তাড়াহুড়ো করে ল্যাবরেটরির দিকে চলে গেলেন ডক্টর।

কিছুটা স্বস্তি বোধ করল কিশোর। একটা প্রতিষেধক অন্তত পাওয়া গেল। রাতে হামলা চালালে কি করে ঠেকাবে পোকাগুলোকে, এই দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। রাতের বেশি দেরি নেই। এখনই কাজ শুরু করা দরকার। অন্ধকারের আগেই ব্যারিকেড দিয়ে ফেলতে হবে।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। এক দানবের জ্বালাতেই অস্থির হয়ে পড়েছিল। নতুন আরেকটা বিপদ যুক্ত হলো। মারাত্মক বিপদ।

ষোলো

কেটে গেল আরেকটা ভয়ঙ্কর রাত। সারারাত জেগে থেকে পোকাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করে করে ওরা সব ক্লান্ত। ঝাঁকে ঝাঁকে এসে হাজির হয়েছিল। কোথা থেকে হঠাৎ করে এত পোকার আবির্ভাব ঘটল, ভেবে কোন কূলকিনারা করতে পারেনি কেউ। ডক্টর বেঞ্জামিনও কিছু বুঝতে পারছেন না। ভাগ্যিস ওগুলোকে ঠেকানোর উপায়টা বের করে ফেলেছিলেন। নইলে আর রক্ষা ছিল না। তেলের ব্যারিকেডের বাইরে অ্যামিনো ট্রায়াজোল মাখিয়ে মাংসের টুকরো ফেলে রাখা হয়েছিল। যতগুলো এসেছিল, সব ওই বিষাক্ত মাংস খেয়ে মরেছে। একেবারে রাক্ষস। খাবার দেখে যেন আর হুঁশ ছিল না। নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাতে মনে হয়েছে পোকাগুলো নির্বোধও বটে। মগজ নেই একেবারেই। পুরোপুরি সহজাত প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে চলে। ভেতরে ঢুকতে পারেনি। ঢোকার চেষ্টাও করেনি। বাইরেই খাবার পেয়েছে। খেয়ে খেয়ে মরেছে। কারও কোন ক্ষতি করতে পারেনি তাই। আহত হয়নি কেউ।

বিনোদন-কক্ষে এককাপ কফি নিয়ে বসল কিশোর। চোখ লাল। ঘন ঘন হাই তুলছে। এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল টেরি। জানাল, গতরাতেও পাখির বাসায় হানা দিয়েছিল দানবটা কিংবা দানবেরা।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বাইরে বেরিয়ে দেখল আকাশের অবস্থা ভাল না। ঝড় আসবে মনে হচ্ছে। পাখির পাহাড়ে গিয়ে দেখে আসার প্রয়োজন বোধ করল। বার বার ওই একটা জায়গায় হামলা চালাচ্ছে দানবটা। ওটাকে খুঁজে বের করার কোন না কোন সূত্র পেয়েও যেতে পারে ওখানে।

দুপুরের পর পুঁতে রেখে আসা গাছগুলোর অবস্থা দেখতে চললেন ডক্টর বেঞ্জামিন। তিন গোয়েন্দা আর জিনা চলেছে সঙ্গে। টেরিও আসতে চেয়েছিল। সাফ মানা করে দিয়েছেন ডক্টর। ও কিছু করতে গেলেই অঘটন ঘটায়। সঙ্গে এসে আবার কি করে বসবে কে জানে। মুখ চুন করে বসে

খেকেছে বেচারা।

মুসার হাতে বন্দুক। রবিনের হাতে পেট্রলের টিন। পোকারা যদি আক্রমণ করতে আসে, বাধা দেয়ার জন্যে।

এবড়োখেবড়ো পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। দুধারে বুনো ঘাসের জঙ্গল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে জিনাকে বলল কিশোর, 'ঝড় আসতে দেরি আছে। কিন্তু এখনই সমুদ্র কি রকম ফুঁসছে দেখেছ? বাতাসটাও কেমন বদলে গেছে।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জিনা। 'রাতের বেলা শুরু হলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাব। বাতাস আর বৃষ্টিতে আগুন যাবে নিভে। সুযোগ পেয়ে আজ পাখি বাদ দিয়ে আমাদেরকেই খেতে আসবে দানবের দল।'

দূরে চোখে পড়ল ঝর্নার কাছের জলাশয়গুলো থেকে ওঠা ধোঁয়ার মত বাষ্প বাতাসে গা ভাসিয়ে পাহাড় পেরিয়ে ভেসে চলেছে কোন্ অজানায়।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন ডক্টর, 'এদিকটায় পাথুরে মাটি অনেক বেশি, দেখতে পাচ্ছ? এতে খনিজও বেশি। কিছু কিছু গাছের বেশ ভাল খাবার। কিন্তু ইচ্ছে করেই এখানে পুঁতিনি, তার কারণ এই গাছগুলো অন্য ধরনের। মাটি থেকে উদ্ভিদ যে রস শুষে নেয় তাতে সহায়তা করে এক ধরনের জীবাণু। মাটিতে বেশি পরিমাণে ধাতব পদার্থ মিশে থাকলে সেখানে জীবাণু জন্মাতে পারে না। ফলে বেশির ভাগ উদ্ভিদই জন্মাতে পারে না ওসব জায়গায়। জীবাণুর সাহায্য লাগে না এমন কিছু উদ্ভিদ যা-ও বা জন্মায়, সূর্যের তাপে ধাতু মেশানো মাটি তপ্ত হয়ে থাকার কারণে সেগুলোও মাটির বেশি গভীরে ঢুকতে পারে না। ওপর থেকেই রস শুষে নেয়ার জন্যে বিশেষ শেকড়ের ব্যবস্থা করে দেয় তখন প্রকৃতি। শেকড়ের গায়ে চুলের মত সরু সরু অসংখ্য লোম গজায়। মাটির মাত্র একআধ ইঞ্চি গভীর থেকেই প্রয়োজনীয় রস শুষে নিতে পারে এই লোমের সাহায্যে। শুধু তাই না, ওই মূল এতটাই শক্ত আর এমনভাবে মাটি কামড়ে থাকতে পারে যে তাতে ভর করে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকে গাছটা। মাটির সবচেয়ে ওপরের শীতল স্তর থেকেই রস সংগ্রহ করে এধরনের গাছ।'

'কিন্তু স্যার, মাটির গভীরেই যদি শেকড় ঢোকাতে না পারে,' মুসা বলল, 'শক্তি পায় কোথায় গাছগুলো? ঝড়ের সময় টিকে থাকে কি করে?'

'শেকড় ছোট বলে বেশি লম্বা হতে পারে না এই গাছ,' জবাব দিলেন ডক্টর। 'যতটা উঁচু হলে শেকড়ে ভার রাখতে পারবে, ঠিক ততটাই বড় হয়। কোনমতেই ছয় ফুটের বেশি না। আর শেকড়ও হয় খুব মোটা আর লম্বা। মাটির নিচে ঢুকতে না পারলেও আশেপাশে ছড়িয়ে পড়তে বাধা নেই। তাই গাছকে ধরে রাখার জন্যে যতটা সম্ভব লম্বা হয়ে ছড়িয়ে যায় ওগুলো। মাটির ওপরে বেরিয়ে থাকে, কিংবা বলা যায় বিছিয়ে থাকে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীরভাবে চিন্তা করছে কি যেন। আচমকা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'বিছিয়ে থাকার কথা বলছেন, স্যার?'

চোখের দৃষ্টি বদলে গেল ওর। 'এখানকার কোন গাছেরই তো এরকম শেকড় নেই।'

'না, নেই।'

'কিন্তু আমি দেখেছি এধরনের শেকড়!' বলতে বলতে উত্তেজনা বেড়ে গেল কিশোরের।

দাঁড়িয়ে গেলেন ডক্টর। 'দেখেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার! সেদিন রাতে কুকুরটাকে খুঁজতে রবিন আর মুসাকে সঙ্গে নিয়ে যখন বনে ঢুকেছিলাম, টর্চের আলোয় ওরকম শেকড় আমি দেখেছি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লেগেছিল। অন্য দিকে মনোযোগ ছিল বলে ধরতে পারিনি তখন। তবে খটকা লেগেছিল ঠিকই। পরে বার বার মনে করার চেষ্টা করেছি, কি দেখে অস্বাভাবিক লাগল? কি এমন জিনিস দেখলাম যা ওখানে ছিল, অথচ থাকার কথা নয়? পরে যখন আবার গেছি, সেটা আর ছিল না তখন ওখানে।'

হাতের বন্দুকটা শক্ত করে চেপে ধরল মুসা।

'সত্যি দেখেছিলে!' ডক্টরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। 'ভাল করে ভেবে দেখো···সত্যি সত্যি···' বলতে বলতেই একপাশে চোখ পড়তে থেমে গেলেন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এসে গেছি। ওখানেই গাছগুলো লাগিয়েছি। লাল পানির ওই পুকুরটা চিহ্ন।'

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। বাকি সবাই তাঁকে অনুসরণ করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝর্নার তিরিশ ফুট দূরে এক চিলতে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। জায়গাটার চারদিক ঘিরে রেখেছে পাতাবাহার গাছ। উঁচু উঁচু ঘাস। একটু দূরে দুর্গন্ধময় নানা বর্ণের মাটি। বাষ্পের কারণে বাতাস গরম, ভেজা ভেজা। ঘাম বেরোলেই আঠা হয়ে যায়। বিশ্রী আবহাওয়া। কেমন আদিম।

কাছাকাছি গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন ডক্টর। গাছগুলোকে না দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায় গেল? এখানেই তো লাগিয়েছিলাম।··· এই যে গর্ত, ভুল করিনি তার প্রমাণ···মাটি উপড়ানো···'

ভুরু কুঁচকে গর্তগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

জিনা বলল, 'ওই গাছ উপড়ে নিতে আসবে কে? দানবটা নাকি?'

ডক্টরের দিকে তাকাল কিশোর, 'স্যার···আপনার কি ধারণা গাছগুলো···'

বিমূঢ় ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন তিনি। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গর্তগুলোর দিকে। একটা গাছও নেই। সব উধাও।

'চলুন, পাখির পাহাড়টা দেখে আসি,' কিশোর বলল। 'টেরি ঠিকই বলেছে—দানব একটা নয়, অনেকগুলো।'

ফিরে চলল ওরা। মুসা শটগান তৈরি রেখেছে। দানবকে দেখামাত্র গুলি করবে। কিন্তু কিশোর আর ডক্টর বেঞ্জামিন যা অনুমান করেছেন সেটা যদি তার জানা থাকত, বন্দুকের ওপর আর নির্ভর করত না। অস্ত্রটাকে খেলনা

মনে হত তখন।

গতকালের তুলনায় আলো আজ আরও কম। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। দ্বিগুণ বেগে বয়ে যাচ্ছে খেপা হাওয়া। সমুদ্র ভয়ানক অশান্ত। পাখিগুলো ঝড়ের সঙ্কেত পেয়ে গেছে। কোনক্রমে পেট ভরিয়ে নিয়ে বাসায় কিংবা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে ব্যস্ত।

'ব্যাপারটা গতরাতেই মাথায় এসেছিল আমার,' যেতে যেতে ডক্টর বললেন। 'একটা জ্যান্ত পোকা কেটেকুটে দেখার পরই অনুমান করে ফেলেছিলাম কারা ওই দানব।'

'তখনই বলেননি কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'আরও শিওর হওয়ার জন্যে। এখানে এসে গাছগুলোকে না দেখা পর্যন্ত সন্দেহটা যাচ্ছিল না। কাল রাতে পোকাটাকে পরীক্ষা করে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না...' ঝোড়ো বাতাসের প্রচণ্ড এক ঝটকা মুখ বন্ধ করে দিল যেন তাঁর।

নীরবে পাখির পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল দলটা।

সতেরো

এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হলো ওরা, যেখান থেকে সমুদ্রের দিকে মুখ করা পাহাড়ের মাথায় প্রায় আধ মাইল জায়গা জুড়ে ছড়ানো পাখিদের আস্তানাটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। সমুদ্রও দেখা যায় এখান থেকে। সমুদ্রের রঙ এখন গাঢ় ধূসর। ফুলে ফুলে উঠছে রাক্ষুসে ঢেউ। ভীমবেগে এসে আছড়ে পড়ছে পাথুরে পাহাড়ের গায়ে। হাজারো কামানের কানফাটা গর্জন তুলে রুদ্ধ আক্রোশে যেন ফেটে পড়ছে। কার বিরুদ্ধে যে ঢেউয়ের এই ক্ষোভ, বোঝার উপায় নেই।

পুরো অঞ্চল জুড়ে পাখির মেলা। আকাশে, মাটিতে এমনকি দুরন্ত ঢেউয়ের মাথায়ও বসে বসে দুলছে। থেকে থেকে ডুবে যাচ্ছে ধূসর পানির নিচে। ভেসে উঠছে যখন ঠোঁটে ছটফট করছে রূপালী মাছ। ডাইভ দিয়েও মাছ শিকার করছে কোন কোনটা। ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডানাদুটো একপাশে কাত করে আশ্চর্য দ্রুততায় উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। নিচে মাছ চোখে পড়লে টর্পেডোর মত তীব্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পানিতে।

রাতের আঁধারে কোন্ জায়গাটায় ধ্বংসলীলা চলেছে দেখলেই বোঝা যায়। বাসা, ডিম, সব তছনছ। রাশি রাশি পালক ছড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে রয়েছে পাখির ছিন্নভিন্ন লাশ। খেয়েছে তো বটেই, সেই সঙ্গে নষ্টও করেছে প্রচুর।

আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। দূর দিগন্তের এককোণে এক টুকরো ঘন কালো মেঘ জমা হয়েছে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে দ্বীপের দিকে।

মেরুরাত্রি আসার সূচনালগ্নে কেমন এক ধরনের কালচে ধূসর আলো

ছড়িয়ে আছে, বিশেষ করে এই শেষ বিকেলে। আলোটা ঠিক দিনেরও নয়, আবার রাতের মত অন্ধকারও নয়। দেখা যায় সব। সারাদিনে একটিবারের জন্যে সূর্যের মুখ দেখা যায়নি।

'খাইছে! এ গাছটা এখানে এল কি করে?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমরা তো কেউ এনে লাগাইনি...'

পাহাড়ের একটা ঢালের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন, মুসা আর জিনা। চোখে অবিশ্বাস। কিন্তু কিশোর আর ডক্টরের চোখে অবিশ্বাস নেই, সেই জায়গায় ভয় দানা বাঁধছে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে রবিন। গাছটা এখানে ছিল না। সেদিনও এসেছে এই পাহাড়ে। এটাকে দেখেনি, সে নিশ্চিত। দেখলে মনে থাকতই। এ দ্বীপের গাছই নয় এটা। অনেকটা বোতলের মত কাণ্ড। নিচটা মোটা, ওপর দিক সরু। গুঁড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোড়া থেকে অসংখ্য লম্বা লম্বা শেকড় সাপের মত এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূর। ওগুলোর গায়ে কালো কালো চুলের মত। বেশির ভাগ চুলের মাথাই ঢুকে গেছে মাটিতে। শাখাপ্রশাখাগুলোও সরু সরু, বাঁকা বাঁকা, হরর ছবিতে দেখা ভূতুড়ে এলাকার গাছের মত, মানুষের গন্ধ পেলেই যেগুলো ডাল বাড়িয়ে মানুষ ধরার চেষ্টা করে। কলার মোচার মত ফলগুলো আমলকি গাছে আমলকি যেভাবে ধরে থাকে অনেকটা সেরকম ডাল কামড়ে আটকে রয়েছে।

তাকিয়ে আছে কিশোর। পটার আর হারিয়ে যাওয়া কুকুরটার কথা মনে হতেই শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। ওঅর্ম-লেক থেকে আনা গাছগুলোর একটা এটা। চটে মোড়ানো অবস্থায় কেমন রোগাটে, শীর্ণ ছিল, এখন অনেক মোটাতাজা হয়েছে। প্রচুর খেয়ে খেয়ে বলদ কিংবা শুয়োর যেমন চকচকে হয় সেরকম। শেকড়গুলোও যেন রাতারাতি অতিরিক্ত লম্বা হয়ে গেছে।

পায়ে পায়ে গাছটার কাছে চলে গেলেন বেঞ্জামিন। একেবারে কাছে। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারেন।

আচমকা গাছটার ঝুলে পড়া প্রায় নির্জীব ডালগুলো নড়ে উঠল। সোজা হতে শুরু করল।

সাপের মাথার মত সামনের অংশটা উঁচু করে প্রফেসরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল একটা ডাল। বাকি ডালগুলোও প্রবল আগ্রহে কেঁপে কেঁপে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল যেন তাঁকে ধরার জন্যে।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে থ হয়ে গেল সকলে। সিনেমা দেখছে যেন। কথা হারিয়ে ফেলেছে। ডক্টর নিজেও সরছেন না, তাঁকে সরতে বলার কথা ভুলে গেছে অন্যেরাও।

সবার আগে চিৎকার করে উঠল জিনা। তারপর কিশোর। সবগুলো ডাল একযোগে এগিয়ে আসছে ডক্টরকে ধরার জন্যে।

সংবিৎ ফিরে পেল যেন মুসা। বন্দুক তুলে গুলি করল। এত কাছে থেকে মিস হবার কথা নয়। হলোও না। গুলি লেগে গাছের গা থেকে এক টুকরো বাকল খসে পড়ল। কিন্তু সামান্যতম ভঙ্গি পরিবর্তন হলো না গাছটার।

আগের মতই ডাল বাড়িয়ে রেখেছে ডক্টরকে ধরার জন্যে। বিমানের মধ্যে কাকে গুলি করেছিল যাত্রীরা, বুঝতে অসুবিধে হলো না আর মুসার।

প্লেনের মেঝেতে পড়ে থাকা বাকলের টুকরোগুলো কিভাবে পড়েছিল, তা-ও বুঝতে পারল কিশোর।

চেঁচিয়ে বলল কিশোর, 'সরুন, স্যার, জলদি সরে যান!'

জিনা আর কিশোরের চেঁচামেচি এবং গুলির শব্দে সংবিৎ ফিরল যেন ডক্টরের। লাফিয়ে পেছনে সরতে গিয়ে একটা পাথরে পা বেধে উল্টে পড়ে গেলেন।

তোলার জন্যে ছুটে গেল কিশোর। তার পেছনে রবিন। গাছটাকে সই করে আবার গুলি করল মুসা। কিছুই হলো না ওটার। জিনা দিশেহারার মত তাকিয়ে আছে। হাত-পা নড়াতে পারছে না যেন।

উঠে বসার চেষ্টা করলেন ডক্টর। গুঙিয়ে উঠে গোড়ালি চেপে ধরলেন। মচকে গেছে বোধহয়। তাঁকে ধরে তুলতে গেল কিশোর। সোজা হতে গিয়েও আবার বসে পড়লেন ডক্টর। মচকেছে ভালমত। নাকি ভেঙেই গেছে কে জানে। দাঁড়াতেই পারছেন না।

ওদিকে সচল হয়ে উঠেছে গাছটা। বোতলের তলার মত গুঁড়িতে ভর দিয়ে শেকড়গুলোর সাহায্যে অদ্ভুত কায়দায় ঘষটে ঘষটে এগোতে শুরু করল। ডালগুলো বাঁকা করে নামিয়ে দিয়েছে ডক্টরকে ধরার জন্যে।

হাত বাড়াল কিশোর, 'রবিন! টিনটা! জলদি!' বলে প্রায় কেড়ে নিল ওটা রবিনের হাত থেকে। মুখ খুলে গাছটার কাছে এগিয়ে গিয়ে গলগল করে খানিকটা পেট্রল ঢেলে দিল মাটিতে। মুসা আর রবিনকে বলল ধরাধরি করে ডক্টরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

ডক্টরকে সরাতে দুজনকে সাহায্য করল জিনা।

তেলের কাছাকাছি এসে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে গেল গাছটা। থরথর করে শিহরণ বয়ে গেল ডাল আর শেকড়গুলোতে। তেলের গন্ধ পছন্দ হয়নি ওটার। ডক্টরকে আরও দূরে সরিয়ে নিতে বলে পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করল কিশোর। অপেক্ষা করল কয়েক সেকেন্ড। ডক্টরকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঠি জ্বেলে ফেলে দিল পেট্রোলে।

দপ করে জ্বলে উঠল তেল। লাফ দিয়ে কয়েক হাত ওপরে উঠে গেল আগুন।

মানুষ কিংবা জন্তু-জানোয়ারের মত পা নেই, লাফিয়ে সরার ক্ষমতা নেই গাছটার। কিন্তু কিলবিলে শেকড়ে ভর দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় অবিশ্বাস্য দ্রুত সরে গেল আগুনের কাছ থেকে। উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্যে। অতিরিক্ত পেকে গিয়েছিল বলেই বোধহয় ঝাঁকি লেগে টুপটাপ কয়েকটা ফল ডাল থেকে ঝরে পড়ল।

বাতাসের বেগ বেড়েছে। দূরে সমুদ্রের গর্জনও বেড়েছে আরও। ঝড় আসার আগেই আস্তানায় ফেরার তাগিদ অনুভব করল কিশোর। অন্ধকার বেশি হলে বাকি দানবগুলোও জেগে উঠবে। হয় মানুষের আস্তানার দিকে

যাবে, নয়তো অন্যান্য রাতের মতই এদিকে ছুটে আসবে পাখিগুলোকে খেয়ে শেষ করতে। তার আগেই পালাতে হবে। খানিক আগে গাছটার যে রূপ স্বচক্ষে দেখল, এ যেন ড্রাকুলার চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওর ওই শুঁড়ের মত ডালের আওতায় পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। শিকারকে জাপটে ধরে অবশ করার জন্যে ডালগুলোর লোম নিশ্চয় মারাত্মক বিষ ঢুকিয়ে দেয় শরীরে।

ডক্টরকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারের দিকে প্রায় ছুটতে শুরু করল মুসা আর রবিন। জিনার হাতে তেলের টিনটা দিয়ে ডক্টরকে বয়ে নিতে দুজনকে সাহায্য করল কিশোর। ফিরে তাকিয়ে দেখল, আগুন এখনও জ্বলছে। তাপ সইতে না পেরে আরও দূরে সরে যাচ্ছে গাছটা। অহেতুক বন্দুক বয়ে না এনে আরেকটা তেলের টিন আনলে বরং কাজের কাজ হত। ওই দানব ঠেকানোর একটাই উপায়—তেল এবং আগুন। আর কোন কিছু দিয়েই দমানো যাবে না।

প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। যদি মানুষের গন্ধ পেয়ে বাকি গাছগুলোও এসে একযোগে হামলা চালায়? টিনের অবশিষ্ট পেট্রল দিয়ে এতগুলোকে ঠেকানো অসম্ভব। ঠিক করল, এরপর আর মাটিতে তেল ফেলবে না। সোজা গায়ে তেল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে। পুড়িয়ে মারবে। বাঁচিয়ে রাখাটা বিপজ্জনক। আগুন নিভে গেলে আবার এসে আক্রমণ করবে। পুড়িয়ে ফেললে কতগুলো মূল্যবান নমুনা নষ্ট হবে বটে। হোক। কয়েকটা গাছের জন্যে ওদের মরার কোন যুক্তি খুঁজে পেল না সে।

আক্ষেপ করে ডক্টর বলতে লাগলেন, 'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। ব্যবস্থা নিতে পারতাম। গুদামে আটকে না রেখে রাক্ষসগুলোকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতাম না তাহলে!'

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ঘাঁটি এখনও বহুদূর। ডক্টরকে বয়ে নিয়ে যাওয়া না লাগলে আরও তাড়াতাড়ি যেতে পারত ওরা। ভারী বোঝা নিয়ে এগোতে সময় লাগছে।

একটু থামতে বললেন ডক্টর। মুসা আর রবিনের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলেন। হাঁটা তো দূরের কথা, দাঁড়াতেই পারছেন না। বসে পড়লেন। ফোলা গোড়ালিতে হাত বোলাতে গিয়ে উফ্ করে উঠলেন ব্যথায়।

'গোড়ালি ভেঙেছে নাকি, স্যার, আপনার?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'মচকেছে!' ক্ষোভের সঙ্গে বললেন ডক্টর, 'তবে ব্যথা করছে খুব। হাঁটতে যখন পারছি না, ভাঙা আর মচকানো এখন একই কথা। এক কাজ করো। আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে দৌড়ে চলে যাও তোমরা। টিনটা আর দেশলাই রেখে যাও। আমি বসে থাকি। যেটাই প্রথম আসবে, তার গায়ে আগুন ধরাব। ঠেকিয়ে রাখব তোমরা না আসা পর্যন্ত। তাড়াতাড়ি গিয়ে কয়েকটা মলোটভ ককটেল বানিয়ে নিয়ে এসো। এই দানবের বিরুদ্ধে ওটাই এখন একমাত্র অস্ত্র। সিনেমা দেখেই হোক আর যেভাবেই হোক, সঠিক অস্ত্রটা আবিষ্কার করে ফেলেছিল টেরি। জীবনে বোধহয় এই একটা ভাল কাজই করেছে ও।...যাও যাও, আর দেরি কোরো না, দৌড় দাও।'

ডক্টরের কথার জবাব দিল না কিশোর। চারদিকে চোখ বোলাতে

বোলাতে ভাবছে. কি করা যায়? পাহাড়ের দিক থেকে শাঁ শাঁ করে বইছে বাতাস। সমুদ্রের রঙ এখন ঘন কালো। ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনার মুকুট।

ডক্টরের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'আর কিছু না পারেন, খোঁড়াতে পারবেন তো, স্যার? দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে কোনমতে হাঁটতে থাকুন। জানি এভাবে হাঁটা খুব কষ্টকর, কিন্তু ফিরতে তো হবে।'

'দেখো, অহেতুক সবাই মরব। তার চেয়ে আমাকে এখানে ফেলে যাও। বসে বসে পাহারা দিই। দৌড়ে গিয়ে বোমা নিয়ে এসো। আসতে দেরি কোরো না. তাহলেই হবে।'

'অত ভাবছেন কেন? পুরোপুরি অন্ধকার হতে এখনও অনেক দেরি। অন্ধকার না হলে বেরোবে না দানবের দল। ততক্ষণে ঘাঁটিতে চলে যেতে পারব আমরা। কথা বলে অহেতুক সময় নষ্ট করছি।'

'অন্ধকারের জন্যে এখন আর বসে থাকবে না ওরা,' ডক্টর বললেন। 'দেখলে না, ধরতে এল আমাকে। সারাটা গ্রীষ্মকাল ঘুমিয়ে থাকে ওরা, মেরুরাত্রির আগমন সঙ্কেত পেলেই ঘুম ভেঙে যায়। দীর্ঘদিন হাইবারনেট করার পর পেটে থাকে প্রচণ্ড খিদে। রাক্ষস হয়ে যায়। সামনে যা পায় তাই খায়। মাংস তো বটেই, ডালপাতাও বাদ দেয় না। আমার তো বিশ্বাস, আর কিছু না পেলে নিজের জাতভাইদেরই ধরে ধরে খায় এরা। সবলেরা দুর্বলদের ধরে খেয়ে ফেলে।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'এতক্ষণে আরেকটা প্রশ্নের জবাব পেলাম। কেন প্লেনের মধ্যে জেগে উঠেছিল ওরা। স্টোর রুমের অন্ধকারকে ওরা মেরুরাত্রি ধরে নিয়েছিল, আর প্লেনের এঞ্জিনের শব্দকে ঝড়ের গর্জন। জেগে উঠে চটের মোড়ক ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছিল সবচেয়ে ক্ষুধার্ত গাছগুলো। আক্রমণ করেছিল যাত্রীদের। ফেলে দেয়ার জন্যে মাল নামানোর দরজাটা খুলে ফেলেছিল ক্রুদের কেউ। অনেকে মিলে ধাক্কা দিয়ে একটা গাছকে ফেলে দিয়েছিল সাগরে, নয়তো গর্তের বেশি কাছে গিয়ে আপনাআপনি গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল ওটা। সেজন্যেই একটা গাছ কম পেয়েছি আমরা। যাত্রীরা কেউ আত্মহত্যার জন্যে সাগরে লাফিয়ে পড়েনি। সবাইকে ধরে খেয়ে ফেলেছে রাক্ষুসে গাছের দল। কিংবা দু'একজন আতঙ্কিত হয়ে সাগরে ঝাঁপ দিতেও পারে। পাইলট কেবিনের দরজা বন্ধ ছিল বলে, কিংবা জানালা দিয়ে অতিরিক্ত আলো আসছিল বলে ওখানে আর ঢোকেনি গাছগুলো। আলো দেখলেই থেমে যায় ওরা। নাকি মেরুরাত্রি শেষ ভেবে ঘুমিয়ে পড়ে, স্যার?'

'দুটোই হতে পারে,' জবাব দিলেন ডক্টর। 'পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না।'

'ক্যাপ্টেন আত্মহত্যা করলেন কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'গাছের কাণ্ড দেখে, চোখের সামনে মানুষ খেয়ে ফেলতে দেখে বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর,' কিশোর বলল। 'এ ছাড়া আর তো কোন কারণ দেখি না...'

'কথা বলে দেরি করছ কেন?' তাগাদা দিলেন ডক্টর। 'এসব আলোচনা

ঘাঁটিতে ফিরেও করা যাবে। যাও তোমরা, দৌড় দাও।'

তাঁর কথায় কানই দিল না কিশোর। এক বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মুসাকে বলল, 'ধরো তো ওপাশটা। উঁচু করো।'

কিছুতেই নিরস্ত করা যাবে না ওদের, তাঁকে না নিয়ে যাবে না বুঝে আর তর্ক করলেন না ডক্টর। অগত্যা একটা হাত রাখলেন মুসার কাঁধে, অন্য হাত কিশোরের। দু'তিন পা এগিয়ে দেখলেন হাঁটা সম্ভব কিনা।

খুবই অসুবিধে। তাঁর এখন যে অবস্থা, স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু বললেন না সেকথা। বরং মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে বললেন, 'বাহ্, ভালই তো হাঁটতে পারি। কিন্তু কিশোর, আমি যেটা বলেছিলাম, আমাকে...'

'হাঁটতে থাকুন, স্যার, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

রাস্তা খারাপ। পাথরে বোঝাই। ডক্টর পা না মচকালে ঘণ্টায় তিন-চার মাইল গতিতে হাঁটতে পারত ওরা। কিন্তু এখন এক মাইলও পারবে কিনা সন্দেহ। জানে সেটা কিশোর। কিন্তু কিছু করার নেই। এভাবেই যেতে হবে।

অন্ধকার নামার আগে ঘাঁটিতে পৌঁছতে পারবে না কোনমতেই। আর যদি ইতিমধ্যে ঝড় এসে যায়, তাহলে যে কি ঘটবে ভাবতেই মুখ শুকিয়ে গেল ওর।

আধ মাইল এগোনোর পরই পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। বাতাস এখন ঝড়ের রূপ নিয়েছে। হিংস্র আক্রোশে ছুটে ছুটে আসছে যেন শুধু ওদেরকে লক্ষ্য করেই।

প্রফেসরের অর্ধেক ভার নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে মুসা। তার ওপর চাপ কমানোর জন্যে মচকানো পা'টা জোর দিয়ে ফেলতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

'আবার আপনি পা ফেলার চেষ্টা করছেন কেন?' বলে উঠল মুসা। 'নিতে তো পারছিই আমরা। অসুবিধে হচ্ছে না। আপনি নড়লেই বরং অসুবিধে।' তাঁকে অন্যমনস্ক করার জন্যে বলল, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না, স্যার, গাছটা ঝর্নার কাছ থেকে পাহাড়ে গেল কিভাবে?'

'তুমি যেভাবে এসেছ ঠিক সেই ভাবে,' পায়ের যন্ত্রণার কথা মুহূর্তে ভুলে গেলেন ডক্টর। 'দেখোনি কিভাবে শেকড়ে ভর দিয়ে আমাকে ধরতে এগিয়ে এল, আগুন দেখে পিছিয়ে গেল?'

জানে মুসা। দেখেছে। ডক্টরকে অন্যমনস্ক করার জন্যে নতুন প্রশ্ন খুঁজতে লাগল মনে মনে।

কিছুদূর এগোনোর পর হাঁপাতে হাঁপাতে ডক্টর বললেন, 'আবার একটু বসলে কেমন হয়? আমার হাত দুটো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

ভার বইতে বইতে মুসা আর কিশোরের অবস্থাও কাহিল। মুসা অতটা কাহিল হয়নি। বন্দুক হাতে পাহারা দিতে দিতে চলেছে রবিন। তার পাশে জিনা।

কিশোরের অবস্থা দেখে বন্দুকটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রবিন বলল, 'এটা নাও তুমি। আমি এখন স্যারকে ধরি। বদলাবদলি করে নিলে বেশি চাপ পড়বে না কারও ওপরই।'

আপত্তি করল না কিশোর। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'অন্ধকার এমনিতেই হয়ে গেছে। সময়মত ঘাঁটিতে পৌঁছতে পারব না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অতিরিক্ত কষ্ট করার কোন মানে হয় না। তারচেয়ে স্যার যে বললেন, জিরিয়ে নেয়াই ভাল।'

একটা পাথরের ওপর ডক্টরকে বসিয়ে দিল তিনজনে মিলে।

মুসাও বসল। 'নিজের চোখে যা দেখলাম, বিশ্বাস করব কিনা বুঝতে পারছি না! ওটা সত্যি গাছ, না অন্য কিছু?'

'গাছই। ভূত কিনা জানতে চাইছ তো? ভূত নয়,' জবাব দিলেন ডক্টর। 'ওঅর্ম-লেক অঞ্চলের উদ্ভিদ। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার জন্যে ওভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে ওদের প্রকৃতি।'

'আশ্চর্য! গাছ যে কখনও হেঁটে-চলে বেড়াতে পারে, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি কোনদিন!'

জোরে জোরে শ্বাস টেনে ডক্টর বললেন, 'ওঅর্ম-লেকে কয়েকশো বর্গমাইল জমির ভেতরের দিকটা—আমি মাটির নিচের কথা বলছি, গাউ আইল্যান্ডের ঝর্নার কাছের উষ্ণ অঞ্চলের মতই গরম। কোটি কোটি বছর ধরে একই অবস্থায় রয়েছে ওঅর্ম-লেকের প্রকৃতি আর আবহাওয়া। এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে ওখানকার প্রাণী জগৎ। পৃথিবীর সবখানেই তাই, নইলে টিকতে পারত না কেউই। গ্রীষ্মকালে ওখানকার দিনগুলো আমাদের এক সপ্তাহের মত লম্বা, আর রাতগুলো খুবই ছোট। মাত্র কয়েক ঘণ্টা। শীতের সময় এর ঠিক উল্টো, দিনগুলো ছোট, রাত লম্বা। দিন লম্বা হলে উদ্ভিদের বেঁচে থাকা সহজ হয়, সমস্যায় পড়ে রাত লম্বা হলেই। অন্ধকারে সজীব থাকতে পারে না। কারণ শেকড় দিয়ে শুষে নেয়া খাদ্য নিজেদের উপযোগী করে হজম করতে ওদের সূর্যের আলো প্রয়োজন হয়…'

গভীর মনযোগে শুনছিল জিনা, মুসা আর রবিন; নিতান্ত বেরসিকের মত বাধা দিল কিশোর, 'জিরানো হয়েছে। এবার ওঠা দরকার।'

'আবারও বলছি, আমাকে রেখে তোমরা চলে যাও…'

বন্দুকটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রবিন বলল, 'নাও। আমি আর মুসা ধরছি স্যারকে।'

'বরং জিনার হাতে দাও ওটা,' কিশোর বলল। 'জিনা, টিনটা আমাকে দাও তো। সামনে কোন গাছ পড়ে গেলে দেব তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে।'

'কেন, আমি পারব না?' মুখিয়ে উঠল জিনা। 'তুমি কি আমাকে অবলা মেয়েমানুষ মনে করছ?'

হেসে ফেলল কিশোর, 'না না, তোমাকে অবলা ভাবে, কার এতবড় দুঃসাহস…'

'বেশি কথা না বলে বন্দুক নিয়েই এগোও তুমি। আমি যে ভাবে বইছি,

সেভাবেই বইতে থাকি। ভয় নেই, গাছ দেখলে আতঙ্কে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে না আমার, আগুন লাগাতেও ভুলব না। এগোও।'

মুসা আর রবিনের কাঁধে প্রায় চ্যাংদোলা হয়ে ব্যথা ভুলে থাকার জন্যে কথা বলতে লাগলেন ডক্টর, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। জীব-জন্তু, পোকামাকড় অন্ধকারেও খাবার জোগাড় করে বেঁচে থাকতে পারে। অসুবিধে হয় না। কিন্তু উদ্ভিদের হয়ে যায় সমস্যা। তাই কিছু কিছু অঞ্চলের উদ্ভিদ, বিশেষ করে কুমেরুর—বেঁচে থাকার জন্যে নতুন নতুন উপায় খুঁজতে থাকল। বিবর্তনের পথ বেয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিল পতঙ্গভুক উদ্ভিদ, পোকামাকড় ধরে খেতে শুরু করল। তারপর ধরতে শুরু করল বড় বড় জীব। সেটা বহুকোটি বছর আগের কথা। অবশ্য মাদাগাস্কারের মাংসাশী গাছের কাহিনী এখনও শোনা যায় ওখানকার বুড়োদের মুখে। কিছুদিন আগেও নাকি ছিল। অন্য প্রাণী তো বটেই, বাগে পেলে মানুষ ধরেও খেত। ওসব গাছের গুঁড়ি নাকি খুব মোটা হত। মাথার কাছে থাকত অক্টোপাসের শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা লতানো ডাল। বনের মধ্যে আর দশটা সাধারণ গাছের মতই নিরীহ ভাল মানুষটি সেজে ওত পেতে থাকত। ভুল করে কোন প্রাণী ওর নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই, চোখের পলকে শুঁড় বাড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরত। বুড়োরা বলে, বনে শিকার করতে ঢুকলে যাতে সবার ক্ষতি না করে সেজন্যে নাকি নিয়মিত মানুষের ভেট পাঠাত গ্রামবাসীরা। এখন অবশ্য ওরকম কোন গাছ ওখানে খুঁজে পাননি বিজ্ঞানীরা। তাই বলে কখনোই ছিল না, এটা বলার কোন যুক্তি নেই। কত প্রজাতির প্রাণী আর গাছই তো চিরকালের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে…'

উপত্যকা থেকে নেমে একটা খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়ল ওরা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপুনি তুলে দিল শরীরে। এ সময়ে মানুষখেকো গাছের ভয়াল কাহিনী আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিল ওদের।

মিনিটখানেক চুপচাপ চলার পর আবার বলতে লাগলেন ডক্টর, 'লক্ষ লক্ষ, কিংবা হয়তো কোটি কোটি বছরের বিবর্তন চক্রের পথ ধরে ওঅর্ম-লেকের এক ধরনের উদ্ভিদ অবশেষে টিকে থাকার একটা পথ আবিষ্কার করে ফেলল। গ্রীষ্মকালে সাধারণ গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মাটি থেকে রস শুষে নেয়। সেটা হজম করতে তাকে সাহায্য করে সূর্যালোক। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় দীর্ঘ মেরুরাত্রিতে। বাধ্য হয়ে তখন তাকে বেরিয়ে পড়তে হয় খাবারের সন্ধানে। চলাফেরা করার জন্যে তাকে সচল শেকড়ও বানিয়ে দিল প্রকৃতি…'

আচমকা প্রচণ্ড এক দমকা হাওয়া হুড়মুড় করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন ওদের ওপর। ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর রবিন বলল, 'মুসা, এভাবে হবে না। এসো, স্যারকে আমরা পুরোপুরিই বয়ে নিয়ে যাই। একজন ধরব সামনের দিক, একজন পা, আরেকজন পিঠ। বন্দুক আর পেট্রলের টিন দুটোই বইতে পারবে জিনা। কি, পারবে না?'

মাথা কাত করল জিনা, 'পারব।'

'একটা স্ট্রেচার হলে ভাল হতো,' মুসা বলল।

'দেখো, এখনও বলছি,' করুণ স্বরে মিনতি করলেন ডক্টর, 'আমাকে

ফেলে চলে যাও তোমরা। ঘাঁটির কাছে তো প্রায় এসেই গেছি। দৌড়ে গিয়ে বরং স্ট্রেচার আর ছেলেদের নিয়ে এসো। সহজেই বয়ে নিতে পারবে তখন।'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর, 'সেই ঝুঁকি আমরা নিতে পারব না। স্ট্রেচার নিয়ে ফিরে এসে যদি দেখি আপনিই নেই, গাছের পেটে চলে গেছেন, লাভটা কি হবে? তারচেয়ে কষ্ট যখন করেই ফেলেছেন, আরেকটু ধৈর্য ধরুন, ঘাঁটিতে না গিয়ে থামছি না আমরা।'

তিনজনে ধরাধরি করে বয়ে নেয়ার প্রস্তাবটা পছন্দ হলো না মুসার। অনেক অসুবিধে। বলল, 'দাঁড়াও, আমি একাই একবার চেষ্টা করে দেখি পারি কিনা···স্যার, শরীরটা ঢিল করুন তো···'

যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান কিংবা আহত সৈনিককে যেভাবে পিঠে তুলে নেয় তার সহযোদ্ধা, ঠিক সেভাবে ডক্টরকে তুলে নিল মুসা। তুলতে পেরে বেরিয়ে পড়ল তার সাদা দাঁত। অন্ধকারেও দেখা গেল। 'আরি, এত্ত সহজ! এই কাজটা এতক্ষণ করলাম না কেন? শুধু শুধু কষ্ট দিলাম স্যারকে···.'

আঠারো

বৃষ্টি শুরু হলো। ঝমঝম করে নেমে এল আকাশ ভেঙে। দ্বীপটাকে ধুয়েমুছে দেয়ার পণ করেছে যেন। আকাশ চিরে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুতের নীলচে শিখা। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করে দিচ্ছে ধরণীকে। সামনে গাছপালা কম। ঘাস বেশি। বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে ঘাসফুল, ভঙ্গি দেখে মনে হয় লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইছে। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ে সেসব।

'ভাল। আরও বিদ্যুৎ চমকাক,' কিশোর বলল, 'চমকাতে থাকুক। পথ দেখে চলতে সুবিধে।'

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে যাবে পৃথিবী। বিদ্যুৎ না চমকালে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাবে না। বৃক্ষদানবগুলো যদি এগিয়ে আসে, দেখতেও পাবে না ওরা। একেবারে নিঃশব্দে চলতে পারে না ওগুলো। সামান্য শব্দ হয়। সেটা শোনা যাবে না বাতাস আর বৃষ্টির শব্দের জন্যে। কাছে এসে মারাত্মক শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে না ধরা পর্যন্ত কিছুই টের পাওয়া যাবে না। একবার যদি ধরে ফেলে, আর রক্ষা নেই, বাঁচার কোন উপায়ই থাকবে না। নিশ্চিত মৃত্যু।

'অসুবিধে না হলে আপনি কথা বলতে থাকুন, স্যার,' কিশোর বলল। 'কথা আমাদের অন্যমনস্ক করে রাখবে। ভয়কে দূরে সরিয়ে রাখবে।'

কাশি দিয়ে গলা সাফ করে নিলেন ডক্টর। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওঅর্ম-লেকটা আগ্নেয় অঞ্চল বলে ওখানে মাটি খুব গরম। শেকড় ঢোকাতে পারে না ওখানকার উদ্ভিদ। মাটির ওপর বিছিয়ে থাকে। গাছকে খাড়া থাকতে সাহায্য করে। শেকড়ের গায়ে চুলের মত লোম থাকে, যেগুলো দিয়ে মাটি থেকে রস

শুষে নেয় গাছ। মাটিতে শেকড় ঢোকাতে পারে না বলে গাছগুলো আমাদের পরিচিত অন্যান্য গাছের মত শক্ত করে মাটি আঁকড়ে থাকতে পারে না। তবে এতে একটা সুবিধেও পায় ওরা। মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণীরা পা থাকায় যে সুবিধাটা পায়। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করতে পারে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কিভাবে মাংসাশী হলো ওরা? দীর্ঘ মেরুরাত্রিতে উপোস থাকতে থাকতে একসময় মরিয়া হয়ে উঠল হয়তো কোন গাছ। খিদের জ্বালায় অন্য কোন ছোট গাছকে জড়িয়ে ধরে রস শুষে নিল তার গা থেকে। শুরুটা হলো এভাবেই। কালক্রমে শুধু গাছ নয়, অন্য প্রাণীর দিকেও নজর দিল এসব গাছ। নিরামিষাশী থেকে হয়ে গেল মাংসাশী। গ্রীষ্মে ওদের ডালে ধরে নতুন কুঁড়ি, ফুল থেকে ফল, শীতের শুরুতে ফল পেকে মাটিতে পড়ে। ওগুলো থেকে ব্যাঙের ছাতার মত অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চারা বেরোয়। মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে খাবারের সন্ধানে। নতুন শুঁয়াপোকার যেমন জন্মানোর পর থেকে একটা দিকেই নজর থাকে—খাবার, খাবার চাই, আরও খাবার; চারাগুলোরও তেমন।

'কেটে গেল লক্ষ লক্ষ বছর। প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার জন্যে শিকারী গাছগুলো আরও শিকারী হয়ে উঠল। ওঅর্ম-লেকে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটেনি বলে এই প্রজাতির গাছেরাও মারা পড়েনি। বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে এখনও।

'ওঅর্ম-লেক থেকে দিনের বেলা এই গাছগুলোকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্লেনে তোলার আগে ওরা অন্ধকার পায়নি। অন্ধকারেই জেগে ওঠে ওরা, খাবারের জন্যে পাগল হয়ে যায়, দানবে পরিণত হয়। যদিও ওদের ফল থেকে বেরোনো ছানারা, অর্থাৎ চারারা দিনের বেলাতেও জেগে থাকে, খাবার খুঁজে বেড়ায়। নিশ্চয় টিকে থাকার জন্যেই প্রকৃতি এই বাড়তি ক্ষমতাটা দিয়েছে চারাগুলোকে। শিশুকালে বাড়ন্ত শরীর, একবেলা খাবারে ওদের চলে না—এখানেও সেই শুঁয়াপোকার উদাহরণ। বাড়ন্ত শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সারাক্ষণ শুধু খাই খাই, আর খাই খাই। দিনে ঘুমালে চলবে কেন?'

'ও, এই ব্যাপার!' বলে উঠল জিনা। 'অদ্ভুত ওই পোকাগুলো তাহলে পোকা নয়, ওই দানবগাছের ছানা! চারা!'

'হ্যাঁ। ওগুলো যে গাছের চারা, বোঝার পরই অনুমান করে নিয়েছিলাম আসল গাছ কোনগুলো।'

ডক্টরকে কাঁধে করে এগিয়ে চলেছে মুসা। আগে দুজনে মিলে যেভাবে চ্যাংদোলা করে নিচ্ছিল, তারচেয়ে এভাবে চলাটা দ্রুত হচ্ছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর কিশোর বলল, 'এবার আমার কাছে দিয়ে তুমি একটু জিরিয়ে নাও।'

দিল না মুসা। 'লাগবে না। পারব। আমার কষ্ট হচ্ছে না।'

পাশে পাশে এগিয়ে চলল অন্য তিনজন। জিনার হাতে পেট্রলের টিন। কিশোরের হাতে বন্দুক। রবিনের হাতে টর্চ।

বিদ্যুতের আলো ঝিলিক দিল আবার। যেন কোনও মস্ত দানবের জ্বলন্ত শিরাউপশিরা সৃষ্টি করে কালো আকাশটাকে চিরে দিল। বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম। বুক কাঁপানো দীর্ঘশ্বাসের মত হুহু করে বয়ে চলেছে বাতাস। ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার, সব মিলিয়ে ভয়াবহ এক দুর্যোগের রাত নামল গাউ আইল্যান্ডের বুকে। তার সঙ্গে যুক্ত হলো বৃক্ষদানবের আতঙ্ক।

এক সময় কিশোরের মনে হলো, ঘাঁটিতে যেন আর পৌঁছতে পারবে না আজ রাতে। বিদ্যুতের আলোয় একপাশে একটা পাহাড়ের গায়ে গুহা দেখতে পেয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, বৃষ্টি যতক্ষণ না থামে ওর ভেতরে বসে কাটাবে যে হারে বৃষ্টি পড়ছে, আর বাতাসের যা বেগ, ভারি বোঝা নিয়ে এই অবস্থায় বেশিক্ষণ এগোতে পারবে না মুসা। বিশ্রাম দরকার এবং সেটার জন্যে ওই গুহার চেয়ে ভাল জায়গা আপাতত আর নেই।

গুহায় আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে একমত হলো সবাই। ভেতরে ঢুকে শুকনো জায়গা দেখে দেয়াল ঘেঁষে বসিয়ে দেয়া হলো ডক্টরকে। দেয়ালে হেলান দিলেন তিনি। অন্যেরাও হাত-পা ছড়িয়ে বসল।

ডক্টর বললেন, 'গাছগুলোকে বিশ্বাস নেই। এই দুর্যোগের রাতে বেরোবেই ওরা। নিশ্চয় খাবারের গন্ধ পায়। গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে এসে পড়লে বেঘোরে মরব। এখনও সময় আছে, আমাকে ফেলে দৌড় দাও। এখানে আমি নিরাপদ, অন্তত তোমাদের ফিরে আসা পর্যন্ত...'

তাঁর কথা কানেই তুলল না কিশোর। মুসার দিকে ফিরে বলল, 'বন্দুকটা তুমি নিয়ো এবার। স্যারকে আমি পিঠে তুলে নেব।'

বাইরে অন্ধকার রাত। গুহার ভেতরে আরও অন্ধকার। শ্রান্ত শরীর আর ক্লান্ত, আতঙ্কিত মন নিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে পাঁচজন মানুষ। ঝড়বৃষ্টির বিরাম নেই। ঝোড়ো বাতাস আর সমুদ্রের একটানা গর্জনে কাঁপছে সমস্ত দ্বীপ। থেকে থেকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতের আলো। ভেজা পাহাড়ের গা চকচক করছে সে আলোয়। ঝড় এখনও চরমে পৌঁছায়নি। এখনই এই অবস্থা! আর পৌঁছালে কি যে ঘটবে অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

বিদ্যুৎ চমকাল ওই মুহূর্তে। গুহার বাইরে চোখ পড়তে চিৎকার করে উঠল জিনা। আতঙ্কিত হয়ে সবাই দেখল, হেলেদুলে এগিয়ে আসছে একটা বড় ছায়া।

কি ওটা, বুঝতে কারও অসুবিধে হলো না। ওঅর্ম-লেকের শয়তান গাছ।

টর্চ জ্বালল রবিন। আলো ফেলল গাছটার ওপর। অতি সন্তর্পণে গুড়ি মেরে এগোতে এগোতে আলো পড়ায় দাঁড়িয়ে গেল। ডালপালাগুলো নিচের দিকে নোয়ানো। বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচার জন্যে মুহূর্তে মুহূর্তে ভঙ্গি বদল করছে লম্বা লিকলিকে ডালগুলো। এক শুঁড়ে একটা মরা পাখি ঝুলছে। খায়নি এখনও।

টর্চের আলো বেশিক্ষণ ঠেকাতে পারল না গাছটাকে। চলতে শুরু করল

আবার। অক্টোপাসের শুঁড়ের মত করে পাথর জড়িয়ে ধরে কাণ্ডের পতন রোধ করছে শেকড়গুলো। বোতলের তলার মত দেখতে বিচিত্র গুঁড়িটা কাত করে করে দুলতে দুলতে এগোচ্ছে। দেখে বোঝা গেল পাখির আস্তানার দিক থেকে এসেছে ওটা। ডক্টরকে যেটা আক্রমণ করতে চেয়েছিল, ওটাও হতে পারে।

কিন্তু গুহার দিকে কেন? শিকারের গন্ধ পেয়েছে?

জবাব পেতে দেরি হলো না। ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই এদিকে এসেছে ওটা। পাখিটাকে ধরার পর আর খাওয়ার সুযোগ পায়নি। বেরিয়ে থাকা চাতালের মত একটা পাথরের নিচে দাঁড়িয়ে খেতে শুরু করল ওটা। কিলবিলে ডালগুলো কাণ্ডের যেখানটায় মিলিত হয়েছে, তার ঠিক মাঝখানে বেরিয়ে পড়ল একটা কালো ফোকর। শুঁড় দিয়ে পাখিটাকে সেই ফোকরে ঠেলে দিল গাছটা। মুহূর্তে গিলে ফেলল। কয়েকটা সেকেন্ড ফোকরের নিচে কাণ্ডটা সাপে ইঁদুর গিললে যেমন ফুলে থাকে, তেমনি ফুলে রইল। তারপর মিলিয়ে গিয়ে আগের মত হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য দ্রুত পাখিটাকে হজম করে ফেলল গাছটা। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল ওরা।

একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ডক্টরকে কাঁধে তুলে নিতে গেল। বাধা দিল মুসা। 'তুমি নিয়ে ছুটতে পারবে না। শক্তিতে কুলাবে না। আমিই নিচ্ছি, দাঁড়াও। এতখানি যখন আনতে পেরেছি, বাকিটাও পারব।'

পাখিটাকে খাওয়া শেষ করে গুহার দিকে ফিরল দানবটা। মানুষের গন্ধ পেয়ে কিলবিল করে উঠল শুঁড়গুলো। ধরার জন্যে সামনে বাড়িয়ে দিল।

অনেকটা দূরে রয়েছে কিশোররা। নাগালের বাইরে। ছুটতে শুরু করল। ডক্টরকে কাঁধে নিয়ে মুসাও যতটা সম্ভব দৌড়ে চলল।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এখন। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। এগোতে অসুবিধে হচ্ছে না। ফিরে তাকাল কিশোর। গাছটা আসছে কিনা দেখল।

আসছে না।

বোধহয় বুঝে গেছে, ধরতে পারবে না আর। তাই পিছু নেয়ার চেষ্টা করেনি। সামনের দিক থেকে আর কোন গাছ না এলে এখন নিরাপদেই ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়া যাবে।

পাহাড়ের একধারে একটা উৎরাইয়ে এসে পড়ল ওরা। এ পথটা সোজা গেছে ঘাঁটিতে। একপাশে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল থাকায় সমুদ্রের দিক থেকে আসা বাতাসের ঝাপটাও কম লাগবে। পাথরও মোটামুটি কম।

এগিয়ে চলল ওরা। ঘাঁটি বড়জোর আর মাইলখানেক হবে এখান থেকে। সিকি মাইল পেরোনোর পর একটা বাঁক পেরিয়েই থমকে দাঁড়াল ওরা। সামনে পথরোধ করে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ-ছয়টা বৃক্ষদানব। কিলবিল করছে মাথার শুঁড়ের মত ডালগুলো। মানুষের গন্ধ পেয়েই বোধহয় কাঁপুনি উঠেছে ওদের সর্বশরীরে। মুহূর্তে সবগুলো গাছের সবকটা শুঁড় ওদের দিকে ঘুরে গেল।

গুলি শুরু করল রবিন। এত কাছে থেকে মিস হবার কথা নয়। কিন্তু কোন কাজ হলো না। পরোয়াই করল না গাছগুলো। এগোতে শুরু করল।

ফড়াৎ করে একটান দিয়ে নিজের শার্টের অনেকখানি ছিঁড়ে নিল কিশোর। ছেঁড়া কাপড়টাকে পাকিয়ে সলতে বানাল। জিনার হাত থেকে পেট্রলের টিনটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সলতেটা গুঁজে দিল ওটার মুখে। দেশলাই বের করল। চিৎকার করে জিনাকে বলল হাত দিয়ে আড়াল করতে যাতে পানি না লাগে। জিনার হাতের তালুর আড়ালে রেখে কাঠি ধরাল। সলতেতে আগুন লাগিয়ে টিনটা ছুঁড়ে মারল গাছগুলোকে লক্ষ্য করে।

বোতল দিয়ে ককটেল বানিয়ে ছুঁড়লেই সাংঘাতিক কাণ্ড হয়। আর একটা বড় টিন ছুঁড়েছে। ভয়ানক শব্দ করে ফাটল ওটা। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল দুটো গাছের গায়ে। পুড়তে থাকা জীবন্ত জানোয়ারের মত ছটফট করে উঠল ওগুলো। মৃত্যু যন্ত্রণায় কিলবিল করতে লাগল শুঁড়গুলো। বীভৎস দৃশ্য। গা গুলিয়ে উঠল জিনার। বাকি গাছগুলোর গায়ে সরাসরি আগুন না লাগলেও প্রচণ্ড আঁচ লাগল। হুড়াহুড়ি করে পিছিয়ে যেতে লাগল ওগুলো।

চিৎকার করে মুসাকে বলল কিশোর, 'মুসা, দৌড় দাও। এইই সুযোগ।'

ডক্টরকে কাঁধে নিয়ে পুড়তে থাকা গাছ দুটোর পাশ দিয়ে ছুটে অন্যপাশে চলে গেল মুসা। বাকি গাছগুলো পিছানোয় ব্যস্ত। নাগালের মধ্যে থাকলেও ওদেরকে ধরার চেষ্টা করল না।

এরপর রবিনকে ছুটতে বলে জিনার একহাত ধরে টেনে নিয়ে দৌড় দিল কিশোর। পার হয়ে চলে এল গাছগুলোকে। সামনে খোলা পথ। এখন কোন গাছ এলেও পথরোধ করতে পারবে না আর ওদের।

কিছুদূর আসার পর ফিরে তাকাল কিশোর। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেল, আগুন লাগা গাছ দুটো মাটিতে পড়ে গেছে। পুড়ছে এখনও। বাকিগুলো পাহাড়ের পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে আগুনের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে।

সামনে দেখা যাচ্ছে এখন ঘাঁটির মশালের আলো। সিকি মাইলও নেই আর। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ওরা। নিরাপদেই পৌঁছে যেতে পারবে এখন ঘাঁটিতে।

যে গাছগুলো বেঁচে রয়েছে ওগুলোকে নিয়ে আর ভাবনা নেই। কি করে ঠেকাতে হয়, জেনে গেছে ওরা। রাতে ঘাঁটি আক্রমণ করতে যদি আসে তো খতম করে দিতে পারবে সহজেই। আর যদি না আসে, কাল সকাল হলেই দলবল আর প্রচুর পরিমাণে মলোটভ ককটেল নিয়ে বেরোবে। এক এক করে খুঁজে বের করে ধ্বংস করবে সর্বনাশা ওই দানবদের। এদের একটাও যদি কোনক্রমে সভ্যজগতে পৌঁছে যায়, নিদেনপক্ষে ওদের পোকার মত একটা চারাগাছও, তাহলেও সর্বনাশ করে ছাড়বে। কোনমতেই যেতে দেয়া যাবে না ওদের। এমনকি বাঁচিয়েও রেখে যাওয়া যাবে না। গাউ আইল্যান্ডের কর্মচারীরা শীত কাটিয়ে আবার যখন ফিরে আসবে গরমকালে, কিছু না জেনে, না বুঝে গাছের আক্রমণের শিকার হবে অযাচিতভাবে।

শেষ পর্যন্ত ভয়ানক এক দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটতে চলেছে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে যেন মনের সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিল কিশোর। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলল ঘাঁটির দিকে। কল্পনায় দেখতে পেল গরম একটা ঘর, কাপের তপ্ত কফি থেকে ধোঁয়া উঠছে। নিজের অজান্তেই চলার গতি বেড়ে গেল ওর।

তুষার বন্দি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

'আস্তে চালাও!' চিৎকার দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল রবিন। বরফে ঢাকা পিচ্ছিল পথে পিছলে গেল চাকা।

সাঁই সাঁই স্টিয়ারিং ঘোরাল মুসা। কোনমতে আবার রাস্তার মাঝখানে সরিয়ে এনে গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ বাড়াল। তার কালো চোখে উত্তেজনা।

'আরেকটু আস্তে চালাও না,' রবিন বলল। 'সামনে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

পেছনের সীট থেকে পটার বলল মুসাকে, 'তোমার অসুবিধে হলে আমার কাছে দাও। এ সব রাস্তায় চালানোর অভ্যাস আছে আমার।'

'অভ্যাস কমবেশি আমারও আছে,' জবাব দিল মুসা। 'কিন্তু সকালের আগে বাড়ি ফিরতেই হবে আমাকে, যে ভাবেই হোক। প্লেনটা মিস করলে মা আর আস্ত রাখবে না।'

জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মুসার বাবা-মা আর ওকে, অর্থাৎ পুরো পরিবারকে দাওয়াত করেছেন ওর মলি খালা। নিউ ইয়র্কে থাকেন। টিকেট কাটা হয়ে গেছে। উইকএন্ডে তাই স্কি লজে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে বেড়াতে যেতে দিতে চাননি মিসেস আমান। পথে অঘটন ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সময়মত মুসা বাড়িতে হাজির হতে না পারলে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া হবে না কারোরই। সেজন্যেই বাড়ি ফেরার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

হাত দিয়ে পাশের কাঁচ মুছে বাইরে তাকাল পটার। দেখার কিছু নেই। শুধু সাদা তুষার।

পেছনের সীটে পটারের পাশে বসে আছে কিশোর। তারও চোখ জানালার বাইরে।

লজ থেকে যখন রওনা হয়েছিল ওরা, খুব অল্প তুষার পড়ছিল। ছোট ছোট, হালকা, ভেজা পালকের মত। এতটা বেড়ে যাবে ভাবেনি। তাহলে বেরোত না। বেরোনোর জন্যে অবশ্য পটারও অনেকখানি দায়ী। 'কিছুই হবে না', 'ঝড় আসবে না', বলে বলে এমন অবস্থা করেছে, থেকে যাওয়ার কথাটা আর গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি ওরা।

নিচে নামার সময় পর্বতের মোড় ঘুরতেই হঠাৎ বদলে গেল বাতাসের গতি, গর্জন করে বইতে শুরু করল ঝোড়ো হাওয়া, এত ঘন হয়ে তুষার পড়তে লাগল, মনে হলো আকাশ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে সাদা চাদর।

ভটভট শব্দ তুলে যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটছে মুসার পুরানো জেলপি। সরু

ঝাঁকাবাঁকা রাস্তায় অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাঁক। সেগুলোতে মোড় ঘোরার সময় পিছলে যাচ্ছে চাকা। ধড়াস ধড়াস করছে রবিনের বুক।

ওদের আগে আরও কয়েকটা গাড়ি লজ থেকে বেরিয়ে চলে গেছে সরু পাহাড়ী পথটা ধরে। সামনেই থাকার কথা ওগুলোর। কিন্তু তুষারের চাদরের কারণে একটাকেও চোখে পড়ছে না মনে হচ্ছে ভয়াল এই তুষার-সমুদ্রের মাঝখানে শুধু ওরা একা একটা পুরানো গাড়ি নিয়ে খাবি খেতে খেতে চলেছে

উইন্ডশীল্ডে জমে যাওয়া বরফ ঘষে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ওয়াইপার দুটো। মুছে সরাতে না সরাতেই জমে যাচ্ছে আবার তুষার। দৃষ্টি আটকে দিচ্ছে। অন্য কেউ হলে হয়তো হাল ছেড়ে দিত। থামিয়ে দিত গাড়ি। কিংবা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবত। কিন্তু ড্রাইভিং সীটে বসেছে মুসা আমান। জেদ চেপে গেছে তার। তুষারপাত, সে যত সাংঘাতিকই হোক না কেন, রুখতে পারবে না এখন ওকে। সামনে সে এগোবেই।

শুধু তুষারের বাধাই নয়, যন্ত্রণা আরও আছে। ঝোড়ো বাতাস। ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালের মত গর্জন করে ফিরছে চতুর্দিকে, থেকে থেকে এসে ধাক্কা মেরে, ঠেলা দিয়ে রাস্তা থেকে নামিয়ে দিতে চাইছে গাড়িটাকে।

ঝাঁকি খেয়ে কিশোরের মাথার উলের টুপিটা একপাশে কাত হয়ে গেল। বেরিয়ে পড়ল কোঁকড়া, লম্বা চুল। টুপিটা আবার জায়গামত বসিয়ে চুলগুলো ঠেলে দিল ভেতরে। জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের আকাশ দেখার চেষ্টা করল। ভারি তুষারপাতের জন্যে কয়েক হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না, আকাশ তো বহুদূর।

চাচার একটা অদ্ভুত জোকের কথা মনে পড়ে গেল। রসিকতা করে একদিন একটা সাদা কাগজ দেখিয়ে বলেছিলেন ওর চাচা রাশেদ পাশা, 'কিশোর, দেখ তো ছবিটা কেমন হলো?'

'কই, ছবি কোথায়? এ তো সাদা কাগজ।'

অবাক হওয়ার ভান করে চাচা বলেছেন, 'দেখছিস না? বলিস কি? এটা হলো সুমেরুর ছবি। একটা মেরুভালুক আর একজন তুষারমানব এঁকেছি। বরফঝড়ে ঢাকা পড়েছে ওরা।' বলে হা-হা করে হেসে উঠেছেন চাচা। রসিকতাটাকে তখন চাচার পাগলামি মনে হয়েছিল ওর কাছে, কিন্তু এখন আর সেরকম লাগছে না। বাইরেটা ওই সাদা কাগজের মতই ফাঁকা।

আবার পিছলে গেল চাকা। চিৎকার করে উঠল রবিন। অনুরোধ করে বলল, 'মুসা, আরেকটু আস্তে চালাও!'

জবাব দিল না মুসা। গতিও কমাল না।

গাড়ির ভেতর টানটান উত্তেজনা। দুটো কারণে অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। এক, প্রায় অন্ধের মত চালাতে হচ্ছে মুসাকে। ভালমত না দেখে পিচ্ছিল ঢালু পথে তীব্র গতিতে চলতে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসতে পারে। আর দ্বিতীয় কারণ, গাড়িতে বসে থাকা প্রায় অপরিচিত লোকটা। নাম পটার গুরমান্ডি। মাত্র দুদিন আগে দেখা হয়েছে লজের রেস্টুরেন্টে।

আড়চোখ পটারের দিকে তাকাল সে। জানালার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কি করে যেন আঁচ করে ফেলল কিশোরের নজর ওর দিকে। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

'কি?'

'এই যে তুষারপাত। এতটা ভারি হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল! দোষটা আমারই। না বেরোলেই হত।'

নীরবে মাথা দোলাল কেবল কিশোর। পটারের সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্তটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। স্কি লজের রেস্টুরেন্টে বসে চা খেতে খেতে একটা ম্যাগাজিনে চোখ বোলাচ্ছিল সে। রবিন আর মুসা গেছে স্কিইং করতে। ওর বাইরে বেরোতে ভাল লাগছিল না বলে রয়ে গেছিল। হঠাৎ কানের কাছে ভারি একটা কণ্ঠ কথা বলে উঠল, 'বসতে পারি?'

ফিরে তাকিয়েছে কিশোর। ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে একজন অচেনা লোক। বয়েস বিশের কোঠায়, বাইশ থেকে আটাশ, যে কোন বয়েসের হতে পারে, অনুমান করা কঠিন। লাল চুল। মুখে প্রচুর তিল। তবে সব মিলিয়ে চেহারাটা আকর্ষণীয়।

মাথা ঝাঁকিয়েছে কিশোর, 'হ্যাঁ, বসুন।'

'তোমার বন্ধুরা কোথায়?'

'স্কিইং করতে গেছে।'

'তুমি যাওনি?'

'নাহ্, বসে বসে বই পড়তেই আমার বেশি ভাল লাগে।'

'তারমানে ঘরকুণো লোক। হাহ্ হাহ্। আমিও তাই। বেড়াতে বেরোতে ভাল লাগে, তবে স্পটে পৌঁছে নিজে ছোটাছুটি করার চেয়ে হোটেলের বারান্দায় বসে অন্যদের দৌড় ঝাঁপ দেখতে বেশি ভাল লাগে আমার।'

আলাপ জমানোয় ওস্তাদ পটার। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জমিয়ে ফেলল। নিজের জন্যে চায়ের অর্ডার দিল। কিশোরের জন্যেও আরেক কাপ।

উইকএন্ডের বাকি সময়টা তিন গোয়েন্দার সঙ্গে সঙ্গে রইল সে। ফেরার সময় ওদের সঙ্গে এক গাড়িতে ফিরতে চাইল। হলিউডে বাড়ি। রকি বীচ থেকে দূরে নয়। গাড়িতে জায়গা আছে। লোকটার ব্যবহারও খুব ভাল। নিতে আপত্তি করার কোন কারণ খুঁজে পেল না ওরা।

যে হারে গাড়ি চালাচ্ছে মুসা, তাতে সামনে আরও ছয় ঘণ্টার পথ। গতি কমাতে বাধ্য হলে তো আরও বেশি সময় লেগে যাবে। লক্ষণ সুবিধের মনে হলো না কিশোরের। রাতের বেলা এই পাহাড়ী পথে কখন যে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে কে জানে। মুসাকে গতি কমাতে বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও কি ভেবে চুপ করে রইল।

'ইস্, কি ঠাণ্ডা! জমে গেলাম!' স্কি জ্যাকেটের হুড তুলে দিয়ে মাথাটা পুরোপুরি ঢেকে দিল রবিন।

'পুরানো গাড়ির হাজার যন্ত্রণা!' তিক্তকণ্ঠে মুসা বলল। 'হীটার ··রাপ হওয়ারও আর সময় পেল না! ধূর!'

সামনে গলা বাড়াল পটার. 'আসলেই কি কিছু দেখতে পাচ্ছ না তুমি?'
'পাচ্ছি.' তিক্ত,হাসি হাসল মুসা। 'বরফ...'
কথা শেষ হলো না ওর। আচমকা এক ধাক্কায় রাস্তা থেকে গাড়িটাকে নামিয়ে দিল দমকা বাতাস। চিৎকার করে সীটের পেছনটা খামচে ধরল রবিন। তুষারের চাদরের মধ্যে দিয়েও আবছা চোখে পড়ল একপাশের গভীর খাদ। রাস্তার পাশে এখানে কোন গার্ডরেইলও নেই যে গাড়িটার পতন ঠেকাবে।
প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে মুসা। ব্রেক চাপছে। নানা কায়দায় বাঁচানোর চেষ্টা করছে গাড়িটাকে। কিন্তু কথা শুনছে না চাকা। খাদের দিকে পিছলে সরে যাচ্ছে দ্রুত।
চোখ বুজে ফেলল রবিন। কল্পনায় দেখতে পেল খাদের কিনারে পৌঁছে যাচ্ছে একপাশের চাকা। যে কোন মুহূর্তে এখন কাত হয়ে যেতে শুরু করবে গাড়ি। পাহাড়ের দেয়ালে বাড়ি লেগে ডিগবাজি খেতে খেতে...
আর ভাবতে চাইল না সে।

দুই

দম বন্ধ করে আছে রবিন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন কিছু ঘটল না, ধীরে ধীরে চোখ মেলল আবার।
হাসল মুসা। 'কি বুঝলে? আবার দেখাব সার্কাস?'
বাতাস ছাড়া আর কিছুর শব্দ নেই। বন্ধ হয়ে গেছে এঞ্জিন। খাদে পড়েনি গাড়ি। অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচিয়ে দিয়েছে মুসা।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'না ভাই, একবারই যথেষ্ট। আর দরকার নেই।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। 'আমারও না। আবার পিছলালে কি ঘটবে আল্লাহই জানে।'
বহুদূর যেতে হবে এখনও। আরও কবার যে পিছলাবে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। দমে গেল রবিন। তুষারপাত বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে বাতাসের গর্জন।
পেছনে তাকাল রবিন। জানালার কাঁচ বরফে ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সামনে এগোনো যাবে না। গাড়িটাকে রাস্তায় তুলতে হলে পিছিয়ে নিতে হবে। যেহেতু কিছুই চোখে পড়ছে না, কাজটা করতে হলে অন্ধের মত করতে হবে মুসাকে।
স্টার্ট দিল সে। কয়েকবার ঝিরিক-ঝিরিক করে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। সাবধানে পিছিয়ে রাস্তায় তুলে আনল গাড়ি। 'যাক, প্রথমবারের মত বাঁচা গেল।'
'হীটারটার কিছু করা যায় না?' কেঁপে উঠল রবিন। 'যা ঠাণ্ডা!'
সামনে ঝুঁকে সীটের হেলান খামচে ধরল পটার। 'ডিফ্রস্টে দিয়ে দেখো

তো?'

'ডিফ্রস্টেই রয়েছে,' জবাব দিল মুসা। 'কাজ করছে না। নষ্ট।'

'যে রকম অবস্থা, নষ্ট আমরা সবাই হব,' পরিচয় হওয়ার পর থেকে এই প্রথম গম্ভীর হতে দেখা গেল পটারকে।

'কাজই যখন করছে না,' রাগত স্বরে রবিন বলল, 'চালিয়ে রেখে লাভ কি?' হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা খুঁজতে শুরু করল সে। 'গরম তো করছেই না, আরও ঠাণ্ডা ঢোকাচ্ছে। তাপমাত্রা নিশ্চয় বিশের নিচে।'

সুইচ খুঁজে পেল না রবিন। তার হাতটা সরিয়ে দিল মুসা। নিজে খুঁজতে গিয়ে একবারেই পেয়ে গেল। অফ করে দিল হীটারের কন্ট্রোল।

আবহাওয়ার আলোচনা ভয়ই বাড়াবে শুধু। প্রসঙ্গটা বাদ দেয়ার জন্যে কিশোর বলল, 'একটা কথা জানো, পানির চেয়ে তুষার দশগুণ বেশি জায়গা দখল করে? তারমানে এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাত সমান দশ ইঞ্চি তুষারপাত।'

'এই ঘোড়ার ডিম জেনে কি হবে?' মুসার এক হাতের আঙুল ড্যাশবোর্ডে, আরেক হাত স্টিয়ারিঙে, টাট্টু বাজাচ্ছে। 'বরং হিসেব করে বলতে পারলে বলো, কি উপায়ে দশ ভাগের এক ভাগ কম সময়ে বাড়ি পৌছানো যায়।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর।

হেসে বলল পটার, 'তারচেয়েও অনেক কম সময়ে কি করে ওপরে পৌছানো যাওয়া যায়, তার উপায় অবশ্য বাতলে দিতে পারি।' ছাতের দিকে আঙুল দেখাল সে। 'এমন এক দেশে চলে যেতে পারবে, যেখানে কোন কিছু নিয়েই আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

গাড়ি ছাড়ল আবার মুসা। শরীর শক্ত করে বসে আছে রবিন। কোন্ সময় চাকা পিছলায়, সেই আশঙ্কায় অস্থির।

জোরাল দমকা বাতাস ঝাপটা দিয়ে কাঁপিয়ে দিল গাড়িটাকে। পটার বলল, 'বেশি কষ্ট হচ্ছে নাকি? আমার কাছে দাও, চালাই।'

'ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে আপনার?' রসিকতার সুরে বলল মুসা। 'পুলিশে ধরবে না তো?'

কিন্তু হালকা কথায় গেল না পটার, শান্তকণ্ঠে বলল, 'আছে। গাড়ি আমি ভালই চালাই। তোমার চেয়ে খারাপ না।'

'ঠিক আছে। পরে দেখা যাবে। কষ্ট হলে তখন বলব।'

'আমার মনে হয় ফিরে যাওয়াই ভাল,' ঘন তুষারপাতের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল রবিন।

আঁতকে উঠল মুসা, 'ও কথা মুখেও এনো না! আজ সময়মত বাড়ি না গেলে চিরকালের জন্যে বাইরে বেরোনো আমার বন্ধ করে দেবে মা।'

'ফিরে যাওয়া এখন সম্ভব হবে কিনা সেটাও ভাবতে হবে,' যেন কিশোরের মন্তব্যের জন্যেই ওর দিকে ফিরল পটার। কোন জবাব না পেয়ে বলল, 'ঘণ্টাখানেকের বেশি চালিয়ে ফেলেছি। তারমানে অনেক পথ ফিরতে গেলে এখন ঝামেলা হবে। পিচ্ছিল পথ বেয়ে যদি কোনমতে উঠতে পারিও,

আটকা পড়তে হবে গিয়ে স্কি লজে। কতদিন বসে থাকব?'

কিশোর বলল, 'ঠিকই বলেছ, এখন আর ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। খাড়া পথে উঠতে গেলে গাড়ি আরও বেশি পিছলাবে। স্কি লজ থেকে বেরোনোই উচিত হয়নি আমাদের।'

পিছলে গেল চাকা।

কথা বন্ধ হয়ে গেল সবার।

আবার গাড়িটাকে রাস্তার মাঝখানে সরিয়ে আনল মুসা।

কয়েক গজ এগোতে না এগোতেই প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল গাড়ি। সামনের চাকার নিচে গাছ কিংবা পাথর পড়েছে। অকারণেই রবিনের মনে হলো ওসব কিছু না, পড়েছে আসলে মানুষ। ঠাণ্ডায় জমে মারা যাওয়া মানুষের লাশ। কেন যে এসব আবোল-তাবোল ভাবনা মাথায় আসছে, বুঝতে পারল না।

কিছুদূর সোজা এগিয়ে আবার বাঁকতে আরম্ভ করল রাস্তা। জানালার কাঁচের বাইরের দিকটায় তুষার আটকে যাচ্ছে, তাই ভেতর দিকটায়ও পানির কণা জমছে। সামনে দেখার জন্যে হাত দিয়ে ডলে সেগুলো মুছে একটা বৃত্ত তৈরি করল সে। চোখে পড়ল রাস্তার পাশের খাদ। পাহাড়ের দেয়াল খাড়া নেমে গেছে কয়েকশো ফুট নিচে।

বাতাসের তাড়া খেয়ে উইন্ডশীল্ডে অবিরাম আছড়ে পড়ছে তুষার কণা, যেন গাড়িটাকে আক্রমণের পাঁয়তারা করছে। ভয়ানক এক দমকা হাওয়া কাঁপিয়ে দিল গাড়ির শরীর।

খানিক পর মুসা বলল, 'পর্বতের গোড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছি।' উইন্ডশীল্ডের ওপাশে তার দৃষ্টি স্থির। 'নিচে নিশ্চয় তুষারের অতটা মাতামাতি নেই।'

'বাড়ি গিয়ে ঘরে ঢোকার আগে আর নিশ্চিন্ত হতে রাজি নই আমি,' রবিন বলল।

সোজা এগিয়েছে আবার রাস্তা। উপত্যকায় নামল গাড়ি। কিন্তু তুষারপাতের কমতি নেই। আগের মতই ঘন। সামনে বা পেছনে কোন গাড়ি চোখে পড়ল না। হয়তো দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যে ইতিমধ্যেই রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ, ওরা জানে না। জানার কোন উপায়ও নেই। মুসার গাড়ির রেডিওটাও নষ্ট।

বার বার নিজের পাশের জানালা মুছছে পটার। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এলাকাটা চেনা চেনা লাগছে। মুসা, সামান্য এগোলেই বাঁয়ে আরেকটা সরু রাস্তা দেখতে পাবে। ওটা দিয়ে নেমে যেয়ো।'

'কি বলছেন? এই আবহাওয়ায় গেঁয়ো রাস্তায় নামব?' গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ বাড়াল মুসা। কিন্তু বিশেষ সাড়া দিল না আর পুরানো এঞ্জিন।

'গেঁয়ো রাস্তা বলে অবহেলা কোরো না। সরু হওয়ায় স্নোপ্লাউ দিয়ে ওসব রাস্তার বরফ অনেক তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলা যায়। সেজন্যে মহাসড়কের আগেই বরফ সাফ করে ওগুলো খুলে দেয়া যায়। ঢুকেই

দেখো।'

তবু সন্দেহ গেল না মুসার। ফিরে তাকিয়ে পটারের মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করল রসিকতা করছে কিনা? কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল সরু রাস্তাটা। ছোট সবুজ সাইনবোর্ডে লেখা: কাউন্টি রোড ৩।

একবার দ্বিধা করে বাঁয়ে কাটল সে। গতি কমাল না। এত দ্রুত স্টিয়ারিং ঘোরাল, সবেগে ঘুরতে গিয়ে বরফে ঢাকা রাস্তায় ঘষা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল চাকার রবার। রাস্তায় নেমে গাড়ির নাক সোজা করে দিল আবার।

দুধারে পাইন বন। গাছগুলো তুষারে সাদা। মাঝেসাঝে একআধটা খামারবাড়ি চোখে পড়ে। পৃথিবীটা যেন শুধু সাদাকালো। বরফের সাদা রঙ এত উজ্জ্বল, অন্য সব রঙ ঢেকে দিয়েছে।

'এ পথ ধরে এগোলে কি কোন শহর পাওয়া যাবে?' পটারকে জিজ্ঞেস করল রবিন। মাথার হুড খানিকটা নিচে নেমে গিয়েছিল, টেনে তুলে দিল আবার। নড়েচড়ে বসল সীটে। এত ঠাণ্ডা, মনে হচ্ছে জমে যাচ্ছে শরীর।

'থাকলে তো খুবই ভাল হত,' পটারের আগেই বলে উঠল মুসা। 'রেস্টুরেন্ট পেতাম। পেটের মধ্যে ছুঁচো দৌড়াদৌড়ি করছে।'

'ছুঁচোটাকে আপাতত থামাও,' নীরস স্বরে বলল কিশোর। 'রেস্টুরেন্ট তো দূরের কথা, লোকালয়েরই কোন লক্ষণ দেখছি না। এ কোনখানে নিয়ে এলেন, পটার?'

জবাব দিল না পটার। গলা বাড়িয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে।

জানালার পানি মুছে আবার বাইরে তাকাল রবিন। সাদার আড়ালে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে যেন পৃথিবীটা। মুছে অদৃশ্য করে দিতে চাইছে সব কিছু।

ঠিক এই সময় সামনে ট্রাকটা চোখে পড়ল মুসার। বিরাট লাল একটা গাড়ি রাস্তা জুড়ে নিয়ে ভীমবেগে ছুটে আসছে যেন ওদের পিষে মারার জন্যে।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল রবিন। তার চোখেও পড়ল গাড়িটা।

সিনেমায় ধীরগতিতে ঘটানো দৃশ্যের মত যেন ঘটে গেল পরের ঘটনাগুলো।

তীক্ষ্ণ শব্দে হর্ন বাজাল ট্রাকটা। তুষারপাত ভোঁতা করে দিল প্রচণ্ড সেই শব্দকেও।

সরাসরি এগিয়ে আসছে ট্রাক।

রাস্তাটা অতিরিক্ত সরু। পাশ কাটানো কঠিন।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল মুসা। কাজটা বোধহয় ঠিক করল না। চাকার নিচে বরফ। কামড় বসাতে পারল না রবারের খাঁজগুলো। দ্রুত পিছলে সরে যেতে শুরু করল ট্রাকের দিকে।

চোখ বুজে ফেলল রবিন।

আবার কানে এল হর্নের শব্দ। আগের চেয়ে জোরে। অনেক কাছে। মনে হলো, বধির করে দেবে। খটখট করে নাড়িয়ে দিল যেন শরীরের সমস্ত হাড়।

ধাক্কা খাওয়ার জন্যে তৈরি হলো সে। কোন জায়গায় আঘাত লাগবে

প্রথমে? নাকে, না কপালে? মাথায় বাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলে ভাল। মৃত্যুযন্ত্রণা টের পাবে না।

কানে এল ট্রাকের এঞ্জিনের গর্জন। বাতাসের ঝাপটা। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ওটা।

'বাঁচলাম!' চিৎকার করে বলল মুসা। সশব্দে নাক দিয়ে বাতাস ছাড়ল।

চোখ মেলে তাকাল রবিন। বাঁচার আনন্দে চিৎকার করে উঠল সে-ও। ফিরে তাকাল কিশোর আর পটারের দিকে। সামনের সীটের পেছনটা খামচে ধরেছিল ওরা দুজনেই। ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হেলান দিচ্ছে।

কয়েক গজ এগিয়ে আবার রাস্তায় উঠল জেলপি। ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেছে এঞ্জিন।

তিন

কেউ নড়ল না। কথা বলল না। তারপর একসঙ্গে কলরব করে উঠল সবাই।

'তেল শেষ নাকি দেখো,' কিশোর বলল।

'তেল তো আছে,' গজের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। 'দেখি স্টার্ট নেয় কিনা।'

'না নিলে অসুবিধে নেই,' সীটের ওপর দিয়ে ড্যাশবোর্ডের ডায়ালের দিকে তাকাল পটার, 'নেমে গিয়ে হুড তুলে দেখব। এঞ্জিন মেরামত করতে পারি।'

গাড়ির এঞ্জিন সারাতে যে মুসাও ওস্তাদ, এ কথাটা আর পটারকে বলল না কেউ।

মুসা বলল, 'আগে দেখাই যাক না, স্টার্ট নেয় কিনা।'

সীটে হেলান দিল পটার। হাত দুটো কোলের ওপর রেখে বলল, 'আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই। যতভাবে সম্ভব।'

'থ্যাংক ইউ। প্রয়োজন হলে বলব।'

'স্টার্ট না হলে আর বাড়ি যাওয়া লাগবে না,' শুকনো গলায় বলল রবিন।

ইগনিশনে মোচড় দিল মুসা। কেশে উঠল এঞ্জিন। একবার, দুবার, তারপর চালু হয়ে গেল। এই প্রথম জেলপির বিকট ভটভটানি মধুর সঙ্গীতের মত লাগল কিশোর আর রবিনের কানে। হাসি ফুটল মুখে। কিশোর বলল, 'আরও কিছু কাপড়-চোপড় গায়ে চাপানো দরকার। আরাম হবে।'

'বসে বসে যতটা পারো, পরো,' সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল মুসা, 'আমি আর থামাতে রাজি না। আরেকবার বন্ধ হলে স্টার্ট নেবে কিনা সন্দেহ। অচল হয়ে গেলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'এঞ্জিনের শব্দটা আমার ভাল ঠেকছে না,' পটার বলল। 'টেমপারেচার গজটা দেখো তো, বেশি গরম হয়ে গেল নাকি?'

'গরম?' ভুরু কোঁচকাল রবিন, 'এত ঠাণ্ডায়ও গরম হয় নাকি? জমে যাওয়ার তো কথা!'

'ঠাণ্ডা বলেই কম গরম হয়েছে। নইলে বার্স্ট করত এতক্ষণে। এত পুরানো এঞ্জিন যে চাপ সহ্য করে এতক্ষণ টিকে আছে এইই যথেষ্ট।' জানালার বাইরে তাকাল পটার। 'তবে আর বেশিদূর এগোতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কাছাকাছি কোন শহর আছে?' রবিনের কণ্ঠে ভয়ের ছোঁয়া।

কালো হয়ে আছে আকাশ। তুষার পড়ছে একইভাবে। বাতাসের ঝাপটায় ছড়িয়ে যাচ্ছে ইতিউতি। লম্বা লম্বা পাইন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। তুষারের জন্যে মনে হচ্ছে সাদা আলখেল্লা পড়ে আছে গাছগুলো।

চলতে গিয়ে দ্বিধা করল এঞ্জিন। গ্যাস পেডালে চাপ বাড়াল মুসা।

জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে পটার। গম্ভীর স্বরে বলল, 'মনে হয় ভুলই করলাম। হাইওয়ের চেয়ে আরও খারাপ এই রাস্তা।'

'কোন অর্থে?' রবিনের প্রশ্ন।

'বরফ। একটুও কম না।'

'থাকুক বরফ। পর্বত থেকে তো নেমেছি। খাদে পড়ে যে ভর্তা হইনি সেটাই স্বস্তি।'

'স্বস্তির কিছু নেই,' পেছন থেকে বলল কিশোর। 'এ কোথায় এসে পড়লাম? পথ হারালে এখন...'

'দাঁড়াও দাঁড়াও!' আচমকা চিৎকার করে উঠল পটার। চমকে দিল সবাইকে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'বনের মধ্যে একটা বাড়ি দেখলাম মনে হলো। থামাও তো।'

'কিন্তু বাড়ি যেতে হবে আমাদের,' বলল বটে, কিন্তু ব্রেক কষে থামিয়ে দিল মুসা। এঞ্জিন চলছে।

'গাড়ির যা হাল, এখন এতে করে বাড়ি কেন, কোথাও পৌঁছতে পারব না আমরা,' বনের দিকে চোখ পটারের। বাড়িটাকে খুঁজছে। 'রাস্তার মাঝখানে আটকা পড়ে জমে মরব।'

'আমার পা এখনই জমে গেছে,' মোজার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে গোড়ালি ঘষতে শুরু করল রবিন।

কিশোর বলল, 'এ গাড়িতে এখন বাড়ি যাওয়ার রিস্ক নেয়া উচিত হবে না। রাত হয়ে যাচ্ছে। হীটার নষ্ট, খাবার নেই। অন্ধকারে তুষার ঝড়ের মধ্যে নির্জন রাস্তায় আটকা পড়লে বেরিয়ে কোথাও যাওয়ার জায়গা পাব না। ভেতরে বসে থাকলেও মরব। এই তুষারপাত কতক্ষণ থাকবে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না।' পটারের দিকে ঘুরল সে, 'বাড়িটা কোনখানে?'

'ওই ওপরে,' হাত তুলল পটার।

ছোট একটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে গাছপালা। সীটে বসে মাথা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। তুষার আর গাছ ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। এর মধ্যে বাড়িটা কিভাবে চোখে পড়ল পটারের, ভেবে অবাকই

লাগল ওর।

'ওই পাহাড়টার চূড়ায়,' আবার বলল পটার। 'স্কি লজ কিংবা হান্টিং লজ জাতীয় কিছু হবে। বেশ বড় বাড়ি। আশা করছি জায়গা হয়ে যাবে আমাদের। রাত কাটাতে পারব।'

'ফোন থাকলে তো আরও ভাল,' রবিন বলল, 'বাড়িতে জানিয়ে দিতে পারব। দুশ্চিন্তা করবে না।'

'যত যাই থাকুক, আমি মরে গেছি!' কপাল চাপড়াল মুসা। 'শেষ। আমার জীবন বের না করে ছাড়বে না মা!'

'অত ভাবছ কেন?' সান্ত্বনা দিল কিশোর। 'অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টই। আমরা সবাই মিলে আন্টিকে বোঝাব। বলে দিয়ো বরং, তোমাকে ছাড়াই দাওয়াতে চলে যাক।'

'ফোন থাকলে তবে তো বলব?'

'বাড়ি যখন আছে, ফোনও থাকবে।'

পটারের দিকে তাকাল মুসা, 'ওই বাড়িতে যে আমাদের জায়গা দেবেই, কি করে বুঝলেন? নাও তো দিতে পারে?'

'এ অঞ্চলের লোক খুব ভাল। জানি আমি। ছোটবেলায় বহুদিন ছিলাম। ঠেকায় পড়ে সাহায্য চাইলে মানুষকে কখনও ফিরিয়ে দেয় না। শহুরে লোকের মত নয়। এই দুর্যোগের মধ্যে কোনমতেই ফেরাবে না আমাদের, শিওর থাকতে পারো।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল। 'গিয়ে দেখা যেতে পারে তাহলে।'

'আমি অতটা আশা করতে পারছি না,' একটা টিস্যু পেপার দিয়ে উইন্ডশীল্ডের ভেতরের দিকটা মুছতে লাগল মুসা। 'তবে এঞ্জিন কিন্তু বন্ধ হত না। চালানো যেত। বেশি চাপ পড়লে উল্টোপাল্টা শব্দ করে বটে, থেমে গিয়ে কখনও ভোগায়নি। আমি একা হলে চলে যেতাম, থামতাম না। কিন্তু আরও তিনজনের মতের বিরুদ্ধে...'

ঘড়ি দেখল সে। সাড়ে চারটে বাজে। এখনও নিশ্চয় উৎকণ্ঠা শুরু হয়নি মায়ের। আরও ঘণ্টা দুই চিন্তা করবে না। ততক্ষণে বাড়িটাতে গিয়ে ফোন করে দেয়া যাবে। যদি অবশ্য টেলিফোন থাকে!

'রাস্তার পাশে সরিয়ে রাখো গাড়ি।' হাত তুলে দেখাল পটার, 'ওই ওখানটায়। যার যার ব্যাগ নাও শুধু। স্কিয়িঙের জিনিসপত্র সব থাক। অহেতুক বোঝা নিয়ে লাভ নেই। পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে।'

'গাড়িটা এখানে নিরাপদ তো?' জানতে চাইল মুসা।

'নিশ্চিন্তে রেখে দাও, কিচ্ছু হবে না। দরজায় তালা লাগিয়ো না। বরফ জমে জ্যাম হয়ে গেলে কোনমতেই আর খুলতে পারবে না।' দরজা খুলে বাইরের বরফে পা রাখল পটার। নীল রঙের উলেন স্কি ক্যাপটা মাথায় টেনে দিয়ে হাত-পা ঝেড়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে করতে পাহাড়ের ওপর দিকে তাকাল।

কিশোরও নেমে পড়ল। স্কি লজ থেকে রওনা হয়েছে দুই ঘণ্টাও হয়নি,

কিন্তু ওর মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে বসে ছিল গাড়ির মধ্যে। পটারের পাশে দাঁড়িয়ে সেও তাকাল পাহাড়ের ওপরে। ঠিকই তো! পাইনের ফাঁক দিয়ে রেডউডে তৈরি একটা লম্বা বাড়ি চোখে পড়ল। একপাশে পাথরে চিমনি, মুখ দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে।

পটারের দিকে ফিরে হাসল কিশোর। 'ঈগলের নজর নাকি আপনার?'

পটারও হাসল। চেহারাটা আকর্ষণীয়, হাসিটাও সুন্দর।

গাড়ির দিকে ফিরল কিশোর। দুপাশের দরজা খুলে মুসা আর রবিন নামছে।

'এক কাপ কফি পেলে এখন দুনিয়ায় আর কিছু চাইতাম না!' কাঁপুনি উঠে গেছে রবিনের।

গাড়ির ট্রাংক থেকে ব্যাগগুলো টেনে বের করল ওরা। তাতে সময় বেশি লাগল না। এরই মধ্যে হুড, হ্যাট আর কোটের গায়ে তুষার জমে গেল। আকাশের রঙ ঘন কালো। বাতাসের গতি বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে ঠাণ্ডা। ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েও গা গরম করতে পারছে না ওরা, জমে যেতে চাইছে হাত-পা।

'শুধু কফি?' রবিনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল কিশোর, 'গরম পানিতে গোসল করে আগুনের সামনে বসতে চাও না?'

'আহ্, আর বোলো না! চলো চলো, জলদি চলো!'

দড়াম করে ট্রাংকের ডালা নামিয়ে দিল মুসা।

বাড়িটার দিকে রওনা হলো ওরা। চারজন। একসারিতে। ঢাল বেয়ে বনের ভেতর দিয়ে এগোল। ক্রমশ ওপরে উঠে যাচ্ছে।

জুতো দেবে যাচ্ছে নরম তুষারে। ভেজা, পিচ্ছিল। তার ওপর খাড়াই। ওঠাটা সহজ হলো না মোটেও। তবে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে, উষ্ণতার কথা কল্পনা করে ওরা শান্তি পেল মনে। ফ্রিজের মত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া গাড়ির মধ্যে সারারাত বসে থাকতে হলে আর বাঁচা লাগত না। পাক খেয়ে ঘুরছে বাতাস। পাইনের ডালে বাড়ি দিয়ে সাঁ সাঁ শব্দ তুলছে।

বাড়ির সামনে বারান্দার কয়েক গজ দূরে এসে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো রবিনের। অকারণেই ভয় পেল। মন বলছে, পালাও, জলদি পালাও এখান থেকে! বাঁচতে চাইলে ওখানে ঢোকার চেষ্টা কোরো না! কেন এমন লাগল তার বলতে পারবে না।

কিন্তু মনের হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিল না। এই ঠাণ্ডার মধ্যে আর গাড়িতে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে এতখানি উঠে আসার পর। জোর করে মন থেকে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে অন্য তিনজনের সঙ্গে এগিয়ে চলল সে।

চার

বারান্দার কাছে যখন পৌঁছল ওরা, শীতে রীতিমত কাঁপছে, বিশেষ করে রবিন। জুতো ঢেকে গেছে তুষারে। পা ভেজা। জমে গেছে।

সামনের দরজায় থাবা দিল মুসা। বারান্দার কাঠের মেঝেতে জোরে জোরে জুতো ঠুকে জুতোর ওপরে লেগে থাকা তুষার ঝাড়ল পটার। ওর দিকে তাকিয়ে নিজের অবস্থা কি হয়েছে অনুমান করতে পারল কিশোর।

আবার থাবা দিল মুসা। স্কি জ্যাকেটের আড়ালে নিজের দেহকে আড়াল করেও ঠাণ্ডা থেকে রেহাই পাচ্ছে না রবিন, দুহাত শক্ত করে ঢুকিয়ে দিয়েছে দুই বগলের নিচে, কিন্তু বিন্দুমাত্র কমছে না তাতে গায়ের কাঁপুনি।

বাড়ির চারপাশে শত শত চাবুকের মিলিত শব্দ তুলে মাথা কুটে মরছে যেন বাতাস। দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারছে তুষারকণা। দস্তানা পরা আঙুলে নিজের নাক ছুঁয়ে দেখল কিশোর। অনুভূতি নেই। অসাড় হয়ে গেছে।

কেউ দরজা খুলে না দিলে, ঘরে জায়গা না পেলে, ফ্রস্টবাইটের শিকার হতে হবে এখন।

বাড়ির ভেতর পায়ের শব্দ শোনা গেল। জোরাল হলো। দরজার সামনে এসে থামল। অবশেষে খুলে গেল পাল্লা।

'হুয়া!' ওদের দেখে অবাক হয়ে বিচিত্র শব্দ করে উঠল লোকটা। লম্বা। চওড়া কাঁধ। কোঁকড়া বাদামী এলোমেলো চুলে বহুকাল চিরুনি লাগেনি। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ে লাল ফ্লানেলের শার্ট। পরনে ঢোলা জিনসের প্যান্ট এক হাঁটুর কাছে ছেঁড়া। চারজনের ওপর চোখ বুলিয়ে ষাঁড়ের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল সে। 'এ-কি! কাদের দেখছি!'

'আমাদের গাড়ি···' অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। 'বুঝতেই পারছেন··· ঝড়···'

'হুঁ। এসো, ঘরে ঢোকো,' ভারি গমগমে কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আরে জলদি করো না! ঠাণ্ডা ঢুকছে তো!'

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ওরা। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খেল। পাল্লা বন্ধ করে ছিটকানি লাগিয়ে দিল লোকটা।

উজ্জ্বল বরফের দিকে এত বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়েছে ওদের, ঘরের আলো চোখে মানিয়ে নিতে সময় লাগল। তারপর দেখল বাইরের দরজাটা ছাড়া বেরোনোর আর কোন পথ নেই। যে ঘরটাতে ঢুকেছে, অর্থাৎ সামনের হলঘরটা অনেক বড়। গম্বুজের মত ছাত। অনেক বড় একটা স্কাইলাইট দিয়ে অতি সামান্য আলো আসছে। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে বড় একটা পাথরের ফায়ারপ্লেস। তাতে কমলা রঙের আগুন। থেকে থেকে কাঠ পোড়ার চড়চড় শব্দ উঠছে। উল্টোদিকে দোতলার ব্যালকনি।

আগুন দেখে জীবনে আর এত খুশি হয়নি সে।

'হুই! জমে গেছ তো মনে হচ্ছে,' লোকটা বলল। 'খোলো খোলো. ওই ভেজা জুতো খোলো। কোট খুলে ওখানে রাখো,' একটা দেয়াল-আলমারি দেখাল সে। 'আগুনে গিয়ে হাত-পা সেঁকো জলদি।'

ওর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল গোয়েন্দারা।

'লিসা! লিসা!' চিৎকার করে ডাকল সে, 'জলদি এসো দেখে যাও কারা এসেছে।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল, 'এলে কোঁত্থেকে এই ভর সন্ধেবেলা?'

'বাড়ি রওনা হয়েছিলাম,' কিশোর জানাল। 'আবহাওয়া এত খারাপ হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি। এঞ্জিনটা গোলমাল শুরু করল। গাড়িতে নেই হীটার। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম...'

'সেজন্যেই তো বলছি, হাত-পা সেঁকে গরম হও।'

ঝাড়া দিয়ে চুলে লেগে থাকা তুষার ঝেড়ে পটার বলল অস্বস্তিভরা কণ্ঠে, 'আপনাদের বিরক্ত করছি...'

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিল লোকটা, 'হেই! আরে দূর, রাখো তো তোমার অতিবিনয়। এতবড় বাড়িতে থাকি মাত্র দুজন, আমি আর লিসা। অনেক জায়গা আছে, আরামেই থাকতে পারবে। আগে স্কি লজ ছিল এটা। নতুন হাইওয়ে তৈরির পর আর লোকজন তেমন আসে না দেখে বেচে দিয়ে চলে গেছে আগের মালিক। কোন চিন্তা নেই, থেকে যাও। ঝড় থামার আগে বেরিয়ে যেতে বলব না।'

'থ্যাংকস,' বলে আগুনের দিকে এগিয়ে গেল রবিন। 'বরফের কফিন হয়ে গিয়েছিল গাড়িটা। আর এক মিনিট থাকলেই মরে যেতাম।'

'আমি ভালকান,' পা দিয়ে ভেজা জুতোগুলো দেয়ালের কাছে সরিয়ে দিতে দিতে নিজের পরিচয় দিল লোকটা, 'হেরিং ভালকান। কোত্থেকে এসেছ তোমরা?'

'রকি বীচ,' উলের মোজা জোড়ার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। পা থেকে টান দিয়ে খুলে ফেলল।

'আমার বাড়ি ব্রকটনে, হলিউডে থাকি,' আগুনের দিকে মুখ করে থাকা চামড়া মোড়া সোফার হেলানের কাছে দাঁড়িয়ে বলল পটার। 'পাইনভিউতে এদের সঙ্গে পরিচয়। গাড়িতে জায়গা আছে দেখে লিফট চেয়েছিলাম।'

মোটা মোটা আঙুল দিয়ে দাড়ি চুলকে বলল ভালকান, 'পাইনভিউ স্কি লজ?'

পটার জবাব দেয়ার আগেই তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল একজন ছোটখাট মহিলা। ওকে দেখে নাটকীয় ভঙ্গিতে হেসে বলল ভালকান, 'এই যে এসে গেছেন আমার সহধর্মিনী, মিসেস লিসা ভালকান।'

প্রায় একসঙ্গে তাকে 'হালো' বলল চারজনে। ভালকানের তুলনায় বয়েস অনেক কম। বড়জোর পঁচিশ। সুন্দর সোনালি চুল। মেটাল-রিম চশমার কাঁচের ওপাশে নীল একজোড়া চোখ। গায়ে লাল ফ্লানেলের শার্ট, স্বামীরটার ছোট সংস্করণ। পরনে বাদামী করডুরয়ের স্ল্যাকস, পায়ে একই

রঙের ওঅর্কবুট।

'এই দুর্যোগের মধ্যে মেহমান আসবে কল্পনাই করিনি,' দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো মহিলাকে। খুব আস্তে কথা বলে। ভালকানের পাশে তাকে মনে হয় ভালুকের কাছে ইঁদুর।

নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা। ভালুক-থাবায় ওদের ঠাণ্ডা হাত চেপে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে দিল ভালকান। লিসাও হাত মেলাল ওদের সঙ্গে হাত মেলানো না বলে বলা যেতে পারে আলতো ছোঁয়া।

'ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিল ওরা,' স্ত্রীকে জানাল ভালকান, 'পথ হারিয়ে বিপাকে পড়েছে। রাস্তা যে বন্ধ করে দিয়েছে সেখবরও শোনেনি মনে হয়। আমি ওদের বললাম যে এটা ফাইভ স্টার হোটেল নয়, তবে আরামে থাকার অসুবিধে হবে না। ঝড় যতক্ষণ না থামে, থাকুক। কি বলো?'

ক্ষণিকের জন্যে মুখের ভাব বদলে গেল লিসার। কিছু বলল না। কিশোরের মনে হলো, বনের ভেতর থেকে হুট করে এসে চার-চারজন অপরিচিত লোকের বাড়িতে ঢুকে পড়াটা মেনে নিতে পারছে না মহিলা। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মহিলা বলল, 'ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে গেছে নিশ্চয় ওরা। কফি চড়িয়ে দিইগে।'

সোফায় হেলান দিয়ে কার্পেটে বসে পড়ল কিশোর। পা দুটো বাড়িয়ে দিল ফায়ারপ্লেসের দিকে। আহ্, কি আরাম!

রবিন আর মুসা কি করছে দেখার জন্যে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। লম্বা কাউচের শেষ মাথায় পাশাপাশি বসেছে ওরা। স্কি লজ থেকে বেরোনোর পর এই প্রথম রবিনের মুখে হাসি দেখা যাচ্ছে।

'হুই, কি ঝড়রে বাবা!' কাঠের কড়িবরগায় ধাক্কা খেয়ে যেন ফিরে এল ভালকানের গমগমে কণ্ঠ, 'বাতাসের শব্দটাও শোনো।' পিঠের ওপর হাত নিয়ে গিয়ে গোয়েন্দাদের সামনে কাঠের মেঝেতে পায়চারি করছে সে। 'ছয় ফুট পুরু হয়ে তুষার জমে গেছে কোথাও কোথাও। বিশ্বাস করা যায়?' কথা বলতে বলতে মুসার সামনে থমকে দাঁড়াল সে। 'এত খাটো করে চুল ছাঁটো কেন? তারের জালের মত লাগে। বিশ্রী দেখা যায়।'

ঘাবড়ে গেল কিশোর। মেজাজ খারাপ করে কি বলে বসে মুসা, কে জানে! হাত নেড়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল সে। তাকালে ইশারা করবে গোলমাল না করার জন্যে। যাই বলুক, এই ঝড়ের মধ্যে ওদের ঠাঁই দিয়েছে ভালকান।

কিন্তু তাকাল না মুসা। কোন জবাবও দিল না।

আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল কিশোর। সম্মোহিতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কমলা-রঙ আগুনের দিকে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় বোধহয় ঘোলাটে হয়ে গেছে মগজ। ঘর, ঘরের আসবাব এবং মানুষগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। পাহাড়ী পথে গাড়ি চড়ার আতঙ্ক আর উত্তেজনা প্রচণ্ড চাপ দিয়েছে স্নায়ুতে, এ কারণেই বোধহয় এমন লাগছে।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, মুসার কথায় যেন ঘোর কিংবা তন্দ্রা

থেকে জেগে উঠল সে। মুসা জিজ্ঞেস করছে. 'ফোন আছে আপনাদের?'

ফিরে তাকাল কিশোর।

হাত তুলে বেলকনির নিচে একটা ছোট টেবিল দেখাল ভালকান। 'কাকে করবে?'

'বাড়িতে। মাকে।'

'গিয়ে দেখো ঠিক আছে কিনা। সকাল পর্যন্ত তো ছিল না। এখন হয়তো হয়ে গেছে।'

মুসা উঠতেই রবিনও উঠে দাঁড়াল। কিশোর চলল ওদের সঙ্গে। চাচীকে একটা ফোন করে দিলে মন্দ হয় না। ফিরতে দেরি হলেও দুশ্চিন্তা করবেন না আর।

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল মুসা। 'ডায়াল টোন নেই। তবে খড়খড় করছে। কাজ হতেও পারে।' নম্বর টিপতে শুরু করল সে।

ফিরে তাকাল কিশোর। সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে পটার। মাথার নিচে হাত। ওকে জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনি বাড়িতে জানাবেন না?'

'পরেও জানাতে পারব। আমি এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছি না, জানে ওরা। দুশ্চিন্তা করবে না।' এক হাঁটু বাঁকা করে এনে পায়ের মোজাটা টেনে খুলল। বুড়ো আঙুলের কাছে মস্ত এক ফুটো।

মুসা চিৎকার করছে, 'শুনতে পাচ্ছি না তো! জোরে বলো! কে, মা নাকি?'

চিৎকার করে বোঝানোর চেষ্টা করল কোনখানে কি অবস্থায় পড়েছে সে। বেশি কিছু বলতে পারল না। ও নিজে ভালমত বুঝতে পারছে না, ওপাশে মা'র কাছেও নিশ্চয় পরিষ্কার হচ্ছে না কথা।

কথা শেষ করে রিসিভারটা রবিনের হাতে ধরিয়ে দিল মুসা।

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল লিসা। তাতে কফির কেটলি আর বড় একটা পাঁউরুটি, কলা মিশিয়ে বানানো।

রবিন বাড়িতে কথা বলার পর রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর। খড়খড় শব্দ কমেছে। ডায়াল টোন অস্পষ্ট। বাড়ির নম্বর টিপল সে। ওপাশে রিঙ হচ্ছে। শব্দ শুনে মনে হয় যেন কোটি কোটি মাইল দূরে।

'হালো,' মহিলাকণ্ঠে জবাব এল, 'এটা পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড। সরি, এখন তো কেউ বাড়ি নেই, পরে করুন।'

দুই সহকারীর দিকে ফিরে বিস্মিত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'বাড়ি নেই কেউ। রেকর্ড করা মেসেজ। অবিশ্বাস্য!'

'অবিশ্বাসের কি হলো?' রবিন বলল। 'কোন কাজে বাইরে যেতেই পারেন আন্টি।'

তা পারে। মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো কিশোর। চাচীর জন্যে একটা মেসেজ রেখে লাইন কেটে দিল। মনটা খারাপ হয়ে গেছে। বুঝল চাচীর গলা শোনার জন্যে অস্থির হয়ে ছিল সে।

কিন্তু গেল কোথায়? রোববার বিকেলে সাধারণত কোথাও বেরোন না

চাচী। খারাপ কিছু ঘটল? গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে প্রচুর শত্রু তৈরি করেছে কিশোর আর তার চাচা। ওদের কেউ প্রতিশোধ নেয়নি তো?

আবোল-তাবোল ছেলেমানুষী ভাবনা। বাড়ি থেকে শত শত মাইল দূরে অপরিচিত জায়গায় তুষারবন্দী হয়ে পড়লে অবশ্য এমনটি হওয়ারই কথা। চিন্তার জঙ্গল দূর করার চেষ্টা করল মন থেকে। কিন্তু ভার কাটল না।

ব্যানানা ব্রেড আর কফি মনের অনেকটা উন্নতি করল। খাবার গেলার ধরনেই বোঝা গেল, খিদে পেয়েছিল খুব, পরিস্থিতির কারণে বুঝতে পারেনি। চোখের পলকে রুটিটা সাবাড় করে দিল ওরা। আরেকটা নিয়ে এল লিসা। সেটা শেষ করতেও সময় লাগল না।

'ভাগ্যিস আপনার বাড়িতে জায়গা পেয়েছিলাম,' আবার গিয়ে সোফায় লম্বা হয়েছে পটার। কাউচের শেষ মাথায় বসেছে রবিন আর মুসা। কিশোর আগুনের সামনে কার্পেটে, আগের জায়গায়।

একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে ভালকান। পটারের দিকে চোখ তুলে বলল, 'থাক, হয়েছে, আর বেশি ফোলানোর দরকার নেই।'

কিশোর দেখল, ম্যাগাজিন সাইজ হলেও আসলে ওটা একটা গান ক্যাটালগ। ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভালকান জিজ্ঞেস করল, 'শিকার কেমন লাগে তোমার?'

'ভালই। তবে ক্যামেরা দিয়ে।'

'তারমানে তুমি ফটোগ্রাফার। হান্টার নও।'

'হান্টার হলো ও,' পাশে বসা মুসাকে দেখিয়ে দিল রবিন।

হাসি ফুটল ভালকানের মুখে। উজ্জ্বল হলো কালো চোখের তারা। ফায়ারপ্লেসের ওপর পাথরের চিমনির পাশে বসানো দুটো হরিণের মাথা দেখাল। এমন জায়গায় রয়েছে, অথচ ওদুটো চোখেই পড়েনি কারও। আগুন আর খাবারের দিকে নজর ছিল বেশি।

'সুন্দর, তাই না? গত বসন্তে এক সকালে শিকারে বেরিয়ে পেয়ে গিয়েছিলাম।' ডান হাতটা রাইফেলের মত করে মাথাগুলোর দিকে তুলে ইনডিয়ান শিকারিদের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল, 'কা-প্লু! কা-প্লু!'

নিজের অজান্তেই নাকমুখ কুঁচকে গেল রবিনের।

হেসে উঠল ভালকান, 'শিকারের মত আনন্দ আর কোন কিছুতে নেই। তুমি এই আনন্দের ভাগীদার হতে পারোনি বোঝা যাচ্ছে, নইলে অমন পেঁচার মত মুখ করতে না। শিকার হলো সত্যিকারের পুরুষমানুষের খেলা।'

'আমার এক দাদাও তাই বলে,' মুসা বলল। 'তবে বাবা খুব একটা পছন্দ করে না। বলে, অহেতুক জানোয়ার খুন করতে ভাল লাগে না তার। দাদা আমাকে বহুবার শিকারে নিয়ে গেছে। তার পুরানো রাইফেলটা দিয়ে গুলি করতে দিয়েছে। কিভাবে নিশানা করলে মিস হবার সম্ভাবনা কম, শিখিয়েছে। পুরানো হলেও খুব শক্তিশালী অস্ত্র। সাংঘাতিক ধাক্কা মারে।'

মুসার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ভালকান। 'তারমানে বন্দুক নাড়াচাড়ার অভ্যেস আছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল, সব।'

উঠে গিয়ে ঘরের কোণে রাখা একটা কাঁচে ঢাকা গান-র‍্যাকের সামনে দাঁড়াল ভালকান। ইশারায় ডাকল মুসাকে। পটারও উঠে গেল। রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। চোখাচোখি হলো না। হরিণের মাথা দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।

একটা পিস্তল বের করে মুসার হাতে দিল ভালকান, 'দেখো। খুব সুন্দর, না?...আর এই যে হান্টিং রাইফেলটা, এটাও দারুণ জিনিস!' চকচকে হাসি ফুটল তার দাড়িগোঁফে ঢাকা ঠোঁটের কোণে।

'হ্যাঁ, সুন্দর,' পিস্তলটা দেখতে দেখতে বলল মুসা। হাত তুলে নিশানা করল একটা হরিণের মাথার দিকে।

'হুয়া!' চিৎকার করে উঠল ভালকান। 'সাবধান! গুলি ভরা!' রাইফেলটা রেখে দিল সে। পিস্তলটা নিয়ে সেটাও রাখল। কাঁচের দরজা টেনে দিয়ে বলল, 'গুলি ভরেই রাখি। বলা তো যায় না...'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কিসের ভয়ে গুলি ভরে পিস্তল রেডি রাখে লোকটা?

'বন্দুক জিনিসটা সবার কাছেই বিপজ্জনক,' ভালকান বলছে। 'সাবধান থাকতে হয়। কখন যে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাবে কেউ বলতে পারে না।' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অসাবধানে নাড়াচাড়া করলে তুমিও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসতে পারো।' দুজনকে নিয়ে আগুনের কাছে ফিরে এল সে। 'এই এলাকায় আরেকজন শিকারি ছিল, নাম ব্রেক বারবি। তুষারের মধ্যে শিকারে বেরোনো খুব পছন্দ ছিল তার। খেপাটে লোক। বহুবার বুঝিয়েছি তাকে, তুষারপাতের মধ্যে ওভাবে রিস্ক নেয়া উচিত নয়। শোনেনি। উল্টে তর্ক করত, বাধা থাকলে নাকি শিকারে অনেক বেশি আনন্দ।'

'কি শিকার করত?' জানতে চাইল পটার। 'পাহাড়ী সিংহ?'

'না,' মাথা নাড়ল ভালকান, 'হরিণ। বারবি বলত, তুষারের মধ্যে নাকি অনেক দূর থেকে হরিণ চোখে পড়ে। সাদার মধ্যে গায়ের রঙ মিশিয়ে লুকানোর সুবিধে কম। কথাটা ঠিক। তবে একটা জরুরী ব্যাপারকে গুরুত্ব দেয়নি ও। তুষারপাতের মধ্যে দূর থেকে হরিণ আর শিকারিকে আলাদা করে চেনা কঠিন। শুধু নড়াচড়া দেখে অনুমানে গুলি ছোঁড়ে শিকারি। একই সময়ে দুজন শিকারি যদি দুদিক থেকে বেরিয়ে পড়ে, কি ঘটবে অনুমান করতে পারো?'

'কি ঘটবে?' বুঝতে পারল না মুসা।

চোখ দেখেই বোঝা গেল অস্বস্তি বোধ করছে পটার। রবিন আর কিশোর তাকিয়ে আছে ভালকানের দিকে। গল্পের শেষটা শুনতে আগ্রহী।

'কেন, বোঝা তো সহজ,' ভালকান বলল। বার কয়েক বুটের তলা ঠুকল মেঝেতে। 'একদিন কোন এক বোকা শিকারি বারবিকেই হরিণ ভেবে বসেছিল। বরফের মধ্যে পাও[illegible] গেল ওর লাশ। ভারি রাইফেলের গুলিতে মাথার অর্ধেকটা গায়েব।' যেন ম[illegible] এক রসিকতা করে ফেলেছে, তাই মাথা

পেছনে হেলিয়ে, নাক উঁচু করে অট্টহাসি হেসে উঠল সে।

তার হাসিতে যোগ দিতে পারল না কেউ। চুপ করে আছে। কিশোরের দিকে তাকাল পটার। তার চোখ দুটো যেন নীরবে জিজ্ঞেস করল—এ রকম বোকার মত হাসছে কেন লোকটা? পাগল নাকি? হরিণ ভেবে একজন মানুষ আরেকজনকে নৃশংসভাবে খুন করল, এতে হাসির কি আছে?

ভালকানকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'বারবি আপনার বন্ধু ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ,' যেন সেটা আরও মজার ব্যাপার, তাই আরও জোরে হেসে উঠল ভালকান। 'ভাবতে পারো? ওর মত একটা বোকা লোক আমার বন্ধু! বোকা তো ছিলই, পাগলও ছিল।'

ভালকানের মাথার স্থিরতা সম্পর্কে সন্দেহ হলো কিশোরের। গান-র‍্যাকটার দিকে তাকাল। এতগুলো রাইফেল-পিস্তলের মালিক ওই পাগলটা! কখন কি ঘটিয়ে বসবে···শিরশির করে উঠল তার মেরুদণ্ডের নিচের অংশ।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে পটার। চোখের পাতা নামাল সামান্য একটু। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চাইল সে-ও একই কথা ভাবছে।

ভুরু কুঁচকে ভালকানের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। রবিন অবাক।

'তুষার পড়া বন্ধ হলে কাল সবাই মিলে আমরা শিকারে যেতে পারি, কি বলো?' আচমকা প্রস্তাব দিয়ে বসল ভালকান।

'আমি যাচ্ছি না,' সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল পটার। 'এই শীতের মধ্যে বেরোনোর চেয়ে আগুনের ধারে শুয়ে থাকা অনেক আরামের। কোন পাগলে যায় ওই হাঁটু দেবে যাওয়া তুষারের মধ্যে হাঁটতে।'

হাসি মুছে গেল ভালকানের। কুঁচকে গেল দুই চোখের কোণ। জবাবটা মোটেও পছন্দ হয়নি তার।

ঘাবড়ে গেল কিশোর। পাগলকে 'পাগল' বললে তো চটে যায়! এখনই কিছু করে বসবে না তো? লোকটার মেজাজের এই ঘন ঘন পরিবর্তন ভাল লাগছে না তার। আবার শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ডের ভেতর। ভালকানের চেহারা, গান-র‍্যাক, শিকারের নেশা, বন্ধুর মৃত্যু নিয়ে রসিকতা, মেজাজের পরিবর্তন, সব কিছুই ভয় ধরানোর মত।

উঠে দাঁড়াল সে। এগিয়ে গেল একপাশের দেয়াল জুড়ে থাকা বিশাল জানালাটার দিকে। বাইরে গর্জন করে ফিরছে তুষারভরা রাতের বাতাস, তুষারকণা ছুঁড়ে ফেলছে জানালার পুরু কাঁচে।

ভালকান কিছুটা খেপাটে—নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, তবে লোক খারাপ নয়। ওর কথার প্রতিবাদ না করলেই হলো। আর খেপবে না।

অস্বস্তি দূর হলো না। ছোট মনে হলো নিজেকে। ভাল একজন মানুষ, যে ওদেরকে এই বিপদের মধ্যে জায়গা দিয়েছে, খাবার দিচ্ছে, তাকে সন্দেহ করছে বলে। কিন্তু কোন কারণ না থাকলে সন্দেহটা জাগলই বা কেন? নিজের মন থেকে প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না সে।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে রান্নাঘরের দিকে এগোল।

বেশ বড় একটা ঘর। উষ্ণতায় ভরা বাতাসে আপেল আর দারুচিনির গন্ধ সাধারণত স্কি লজের রান্নাঘরগুলো এই ডিজাইনেই তৈরি করা হয় গাঢ় রঙের কাঠের দেয়াল, ছাতে বেরিয়ে থাকা মোটা মোটা কড়িবরগা একদিকের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে পুরানো আমলের একটা বড় চুলা। তাতে বসানো বড় গোল তামার পাত্রে কি যেন ফুটছে। মাঝখানে লম্বা একটা কাঠের ডাইনিং টেবিল। তিনদিকের দেয়ালে কাঠের আলমারি আর তাক লাগানো। পেছনের দেয়ালে বড় একটা জানালা আছে। পর্দা সরানো। বাইরে বেরোনোর একটা দরজাও আছে।

ডাবল সিংকে কফির কাপ ধুচ্ছে লিসা, খানিক আগে ওরা যেগুলোকে এঁটো করেছিল। কি করছে দেখতেই পাচ্ছে, তবু আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি করছেন?'

চমকে মুখ ফেরাল লিসা। কিশোর যে ঢুকেছে টের পায়নি। মনে হলো গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল। চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকাল কিশোরের দিকে। 'সরি। নামটা যেন কি তোমার? ভুলে গেছি!' সামান্য লাল হলো মহিলার গাল।

'কিশোর। আপনাকে বোধহয় বিরক্ত করলাম। ঠাণ্ডাটা যায়নি এখনও আমার। এক কাপ চা পাওয়া যাবে? কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিন, নিজেই বানিয়ে নেব।'

'দাঁড়াও, দিচ্ছি,' তোয়ালে দিয়ে হাত মুছল লিসা। কিশোরের পাশ দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কতগুলো তাকের সামনে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু করল শরীরটা। চা পাতার প্যাকেট খুঁজছে।

'ওখানে আছে? আমি বের করে নিই?'

'না, আমিই পারব।'

ওই তাকে পাওয়া গেল না। আরেকটা তাকে খুঁজল লিসা। সেটাতেও না পেয়ে গিয়ে একটা দেয়াল আলমারির পাল্লা টান দিল।

খটকা লাগল কিশোরের। কেমন অদ্ভুত না? এটা যদি লিসার নিজের রান্নাঘর হয়ে থাকে, তাহলে চা পাতা খুঁজে পাচ্ছে না কেন?

যেন ওর মনের কথা বুঝে ফেলেই কৈফিয়ত দিতে চাইল লিসা, উফ্ যন্ত্রণা! বের করলে কোথায় যে কি ভরে রাখে ও, সে-ই জানে। গিয়ে এখন জিজ্ঞেস করে দেখো হেরিংকে, বলতে পারবে না, ভুলে বসে আছে।...এই যে দেখো না, কোথায় এনে রেখেছে।' সবচেয়ে ওপরের তাকটা থেকে টান দিয়ে একটা টি-ব্যাগের বাক্স বের করল সে।

হাত বাড়াল কিশোর, 'দিন।'

বাক্সটা টেবিলে রেখে লিসা বলল, 'পানি বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি বানিয়ে নিয়ো।'

'আচ্ছা।'

টেবিলের পাশে পেতে রাখা লম্বা বেঞ্চটায় বসল কিশোর। কেটলিতে পানি ভরে স্টোভে চাপাল মহিলা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে আলাপ শুরু

করার জন্যে বলল সে. 'বাড়িটা কিন্তু সত্যি চমৎকার

ঘুরল না লিসা। আলতো ভাবে কাঁধ দুটো ঝাঁকি খেতে দেখা গেল নিচু গলায় কি বলল স্পষ্ট হলো না কিশোরের মনে হলো. 'চমৎকার না ছাই' গোছের কিছু বলেছে মহিলা।

এই সময় ঘরে ঢুকল মুসা। ওকে দেখে খুশি হলো কিশোর। লিসার সঙ্গে একা আলোচনা জমাতে অসুবিধে হচ্ছিল।

মুসা বলল, 'এদিকে আসতে দেখলাম তোমাকে।'

'হ্যাঁ. ঠাণ্ডাটা যাচ্ছিল না। ভাবলাম. এক কাপ চা খাই।'

'তাই নাকি? খুব ভাল। আমারও এক কাপ দরকার।'

ঘুরে দাঁড়াল লিসা। 'ফ্লাস্ক। যার যার মত ঢেলে নিয়ো।'

'আচ্ছা। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে.' কিশোর বলল।

আর কিছু না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল লিসা।

ফিসফিস করে মুসা বলল. 'বেশি চুপচাপ। বয়েসও কম। ভালকানের সঙ্গে একেবারেই মানায় না। কি বলো?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর. পিস্তলের গুলির মত তীক্ষ্ণ একটা শব্দে থেমে গেল।

পাঁচ

'খাইছে! কিসের শব্দ?' প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। পরিস্থিতি যেন স্বভাব বদলে দিয়েছে ওর. ভীতু করে তুলেছে। সেজন্যে অল্পতেই চমকে উঠছে।

কিশোরও ভয় পেয়েছে। তবে সামলে নিল দ্রুত। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল, 'আমার কাছে শব্দটা···'

টেবিলের পেছনে মেঝেতে চোখ পড়তেই থেমে গেল।

'কি?' কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে মুসাও দেখতে পেল জিনিসটা। হেসে ফেলল। 'ও, এটা! আর আমি ভাবলাম কিনা কেউ গুলি করেছে। ধূর! ভয়ে আসলে কাবু হয়ে গেছি আমরা।'

'মন বলছে "ভয়"। অথচ ভয়টা কিসের, বোঝা যাচ্ছে না, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'হ্যাঁ।'

'যাই বলো, বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

'কিসের বিপদ?'

'বুঝতে পারছি না!'

মেঝেতে একটা ইঁদুরের কল। ইস্পাতের বাঁকা শিকটা চেপে বসেছে ছোট একটা বাদামী ইঁদুরের ঘাড়ে। কালো চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। খুদে খুদে পা ঘষছে ফাঁদের কাঠের অংশে।

শেষ একটা ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল ওগুলো।

'ভয়ঙ্কর দৃশ্য, তাই না?' মুসা বলল। 'অথচ সামান্য একটা ইঁদুর...'

'পরিস্থিতি সামান্য জিনিসকেও অসামান্য করে দেয়। ইঁদুরটার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করছ নিশ্চয়?'

জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল মুসা। কলটা পা দিয়ে চেপে ধরে এক হাতে শিক তুলে নিচ থেকে বের করে আনল মরা ইঁদুরটা। অন্য কোন সময় হলে হয়তো রসিকতা করত, 'চায়ের সঙ্গে ইঁদুর ভাজার নাস্তা হলে মন্দ হয় না', কিন্তু এখন সেসবের মধ্যে গেল না। সিংকের নিচে একটা ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ইঁদুরটা ফেলে হাত ধুয়ে নিল।

শিস দিচ্ছে কেটলির নল। বাষ্প বেরোচ্ছে। এগিয়ে গেল কিশোর। কেটলি তুলে দুটো কাপে গরম পানি ঢেলে এনে টেবিলে রাখল। বাক্স থেকে টি-ব্যাগ বের করে একটাতে ফেলে ঠেলে দিল মুসার দিকে। আরও একটা বের করে নিজের কাপে ফেলল। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে। তুষারপাতের বিরাম নেই। তুষারে ছাওয়া গাছপালাগুলোর পেছনে আরও কালো হয়ে গেছে আকাশটা। এলোমেলো বইছে ঝোড়ো বাতাস, তুষারের কণা বয়ে এনে আছড়ে ফেলছে জানালার কাঁচে।

'সহজে এখান থেকে আমরা বেরোতে পারব বলে মনে হয় না,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল মুসা।

'অত ভেবো না। সকাল নাগাদ রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলবে ওরা,' মুসাকে শোনাল বটে, কিন্তু নিজেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না কিশোর।

চায়ের কাপে চুমুক দিল মুসা। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে জিভ পোড়াল। খটাস করে পিরিচে কাপটা রেখে দিয়ে তাকাল কিশোরের দিকে। 'পটারকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'এত তাড়াতাড়ি মানুষ চেনা কঠিন। তবে এখন পর্যন্ত ভালই মনে হচ্ছে।'

'আমি বলছি, ও ভাল লোক। ও না থাকলে এই বাড়িটা খুঁজে পেতাম না আমরা। এতক্ষণে কি অবস্থা হত কে জানে!'

আরেকটা বিকট শব্দ হলো। গুলিরও নয়, ইঁদুরের কলেরও নয়। শব্দটা এল লিভিং রুম থেকে। যেন ছাত ধসে পড়ছে।

লাফ দিয়ে উঠে বড় হলঘরটার দিকে দৌড় দিল দুজনে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভালকান। হাতে বিয়ারের ক্যান। ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর পটার। আগুনের কমলা রঙ ওদের চেহারাকেও কমলা করে তুলেছে।

ওপরতলা থেকে জানতে চাইল লিসা, 'কিসের শব্দ, হেরিং?'

'কি জানি, বুঝলাম না।'

সাইড টেবিলে ক্যানটা নামিয়ে রেখে লম্বা পায়ে দরজার দিকে এগোল সে। মৃদু টলছে। প্রচুর মদ গিলেছে বোধহয়। তারই প্রতিক্রিয়া।

ওর পেছনে প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোল তিন গোয়েন্দা আর পটার। দরজা খুলতেই প্রচণ্ড ঝাপটা মারল তুষার মেশানো ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস।

যেন অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ দরজার বাইরে।

ঝট করে পিছিয়ে আসতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল ভালকান, দরজার নব চেপে ধরে সামলে নিল। সামনে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে তাকাল বারান্দার ওপাশে উঠানের মত জায়গাটার দিকে। 'ডাল ভেঙে পড়েছে।'

জোরে জোরে কয়েকটা গালি দিল ডাল আর ঝড়কে। ফিরে তাকাল গোয়েন্দাদের দিকে। চুল-দাড়িতে তুষারের কণা লেগে গেছে। 'পড়ার আর জায়গা পেল না! বরফে মাথা ভারি হয়ে গেছিল, গোড়াটা ভার সইতে পারেনি।'

কেঁপে উঠল রবিন, 'উফ, কি ঠাণ্ডা! দরজাটা বন্ধ করে দিন!'

আবার গলা বাড়িয়ে বাইরে তাকাল ভালকান। বাতাসের আরেকটা ঝাপটা এসে লাগল, ফোয়ারার মত তুষারকণা ছিটাল ঘরের মধ্যে।

'বারান্দার চালে পড়েছে,' ভালকান জানাল। 'ভাগ্যিস ঘরের মাঝখানে পড়েনি।' পিছিয়ে এসে দরজা লাগিয়ে দিল সে। ঝাড়া দিয়ে চুলে লেগে থাকা তুষার ফেলার চেষ্টা করল।

'চলুন, সরিয়ে ফেলি,' মুসা বলল। 'ব্যায়াম হবে তাতে, গা গরম হবে।' জবাবের অপেক্ষা না করে জ্যাকেটের জন্যে দেয়াল-আলমারির দিকে রওনা দিল সে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ভালকান বলল, 'চলো।' পটারের দিকে ফিরে একভুরু উঁচু করল, 'তুমি যাবে?'

'চলুন,' যাবার ইচ্ছে নেই পটারের, কিন্তু মুখের ওপর সরাসরি 'না' বলতে বাধল।

স্কি জ্যাকেট বের করে পরে ফেলল মুসা। দরজার দিকে এগোল।

দরজার পাশে হুকে ঝোলানো একটা জ্যাকেট পেড়ে নিয়ে গায়ে দিল ভালকান। জিপার নিয়ে টানাটানি শুরু করল।

ব্যাপারটা অবাক করল কিশোরকে। জ্যাকেটটা ঠিকমত গায়ে লাগেনি ভালকানের। হাতা খাটো।

'আমরা আসব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ফিরে তাকাল মুসা, 'লাগবে না। আমরা তিনজনেই পারব।'

'হ্যাঁ, থাকো,' ভালকান বলল। 'দরকার হলে ডাকব।'

সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল তিনজনে। বাইরে থেকে পাল্লাটা টেনে দিল ভালকান।

রান্নাঘরে চায়ের কাপ ফেলে এসেছে। গিয়ে নিয়ে এল কিশোর। রবিনের জন্যেও এক কাপ এনেছে। দরজার কাছের ঠাণ্ডা থেকে দূরে ফায়ারপ্লেসের আগুনের কাছে বসল। বাইরে থেকে ভালকান, পটার, মুসা, তিনজনেরই হই-চই ভেসে আসছে। ডালটা সরানোর চেষ্টা করছে।

আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে রবিন বলল, 'বেশ উত্তেজনা যাচ্ছে কিন্তু আজ।'

'আমার ধারণা সেটা আরও বাড়বে।'

ঝট করে ফিরে তাকাল রবিন। 'কেন?'

'জানি না। চমৎকার একটা বাড়িতে জায়গা পেয়েছি, আরামে রয়েছি, ঝড় সহজে না থামলেও আমাদের কোন ভাবনা নেই, তারপরেও কেন যেন শান্তি পাচ্ছি না মনে। অস্বস্তিবোধটা কিছুতেই যাচ্ছে না।'

'আমারও না।' আগুনের দিকে ফিরল আবার রবিন। চায়ের কাপে চুমুক দিল চুপচাপ। তারপর আবার ফিরে আচমকা ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা, 'পটারকে তোমার কেমন লাগে?'

'একটু আগে ঠিক এ প্রশ্নটাই করেছিল মুসা। কেন, তোমার কি খারাপ লেগেছে?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন, 'বরং ভাল। ওর জন্যেই এখন আরামে বসে চা খেতে পারছি।'

'হুঁ! আমার কাছেও ভালই লাগছে...'

বাইরে ধুড়ুস করে একটা আওয়াজ হলো। চালা থেকে নিশ্চয় সরিয়ে ফেলা হয়েছে ডালটা। নিচে পড়ে আওয়াজ করেছে।

'ভালকানকে কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমাদের যেহেতু তাড়িয়ে দেয়নি, ভাল তো বলতেই হবে।' কোণের গান-র‍্যাকটার দিকে দৃষ্টি চলে গেল কিশোরের। ভুল করে অন্য শিকারির গুলিতে বারবির খুন হওয়ার ঘটনাটা নিয়ে ভাবল। সেই শিকারিটা কে? ভাবনাটা আনতে চাইল না মাথায়, তবু জোর করে চলে এল—ভালকান নয় তো? বন্ধুর মৃত্যুতে অত হাসি কেন তার?

কয়েক মিনিট পর ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল তিনজন। ঠাণ্ডায় লাল হয়ে গেছে ভালকানের মুখ। পটার হাঁপাচ্ছে। মুসার কালো মুখটা আরও কালো। তুষারে ভেজা।

'হুয়া! আমি তোমাকে ওভাবে সরাতে বলিনি! চালাটা তো শেষ!' মুসার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল ভালকান। 'কতবার মানা করলাম...কানে কম শোনো নাকি?'

'ওভাবে ছাড়া সরানোর আর কোন উপায়ও ছিল না,' মুসাও সমান তেজে জবাব দিল। 'ঠিক আছে, পরের বার বেশি বেশি শুনব। ডাল আর সরানো লাগবে না তাহলে। কিংবা একা যাবেন। দেখব, কেমন পারেন।'

'কি হয়েছে?' ওপরতলা থেকে জানতে চাইল লিসা।

এই আরেকটা ব্যাপার স্বাভাবিক লাগছে না কিশোরের। ওপরতলা থেকে নামছে না কেন মহিলা? একা একা ঘরে কি করছে? সবার সঙ্গে আগুনের পাশে এসে বসছে না কেন?

'কি আর হবে,' ওপর দিকে মুখ তুলে গজগজ করতে লাগল ভালকান, 'পোলাপানের গোঁয়ার্তুমি। হিরো হওয়ার শখ। একাই সব সেরে ফেলার ইচ্ছা।' মেঝেতে বুট ঠুকে তুষার ঝাড়ল সে। জিপার খোলার সময় আটকে গেল জ্যাকেটের গায়ে সুতা দিয়ে ঝোলানো একটা স্কি-লিফট টিকেটে। খুলতে প্রচুর টানাটানি করতে হলো। গাল দিল। জ্যাকেটটা ঝুলিয়ে রাখল

আগের জায়গায়।

'ভালকানের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না মুসার,' ফিসফিস করে রবিনকে বলল কিশোর। 'লক্ষণ ভাল না।'

মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'প্রচুর মদ গিলেছে নিশ্চয়, সেজন্যেই মেজাজ অত খারাপ লোকটার। কথাবার্তার কোন ঠিকঠিকানা নেই।'

'মুসাকে ওর কাছ থেকে দূরে রাখা দরকার। কখন লেগে যাবে ঠিক নেই। শেষে রেগেমেগে এই ঝড়তুফানের মধ্যেই আমাদের বের করে দেবে ভালকান।'

উঠে গিয়ে মুসাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল কিশোর।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরই অবস্থার উন্নতি হলো। ডাল সরাতে গিয়ে যে বিবাদ হয়েছিল সেটা ভুলে গেল ভালকান। খোশালাপ শুরু করে দিল মুসার সঙ্গে। আগুনের পাশে এসে বসেছে সবাই, লিসা বাদে। চিলি খেতে খেতে ভালকানের গল্প শুনছে। এরচেয়ে খারাপ ঝড়ের মধ্যে নাকি এক অচেনা বাড়িতে আটকা পড়েছিল সে। রাত দুপুরে ওই বাড়িতে ঢুকে দেখে পুরুষ মানুষ কেউ নেই, কেবল তিনজন সুন্দরী মেয়ে। ওকে খুব খাতিরযত্ন করতে লাগল। সন্দেহ হলো ওর। বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না। কান পেতে রইল। সুন্দরীদের ফিসফাস কথা কানে এল। রক্ত খাওয়ার কথা কি যেন আলোচনা করছিল ওরা। পিলে চমকে গেল ভালকানের। আড়ি পেতে জানতে পারল, মেয়েগুলো সব ডাইনী, প্রেতসাধনা করে। ওকে ধরে জবাই করে ওর রক্ত দিয়ে শয়তানের পূজা করার ফন্দি আঁটছে। বাঁচার জন্যেই তো বাড়িতে আশ্রয় নেয়া। পৈত্রিক প্রাণটাই যদি বাঁচাতে না পারল থেকে কি লাভ? এদিকেও বিপদ, ওদিকেও। ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়াটাই বরং কম বিপজ্জনক মনে হলো তার। আর কোন উপায় না দেখে শেষে সেই ঝড় মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল সে। মরতে মরতে কোনমতে বেঁচে গিয়েছিল সেদিন।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল মুসা। বিয়ার আনতে যখন ভালকান উঠে রান্নাঘরে চলে গেল, চাপা স্বরে বলল, 'আমরাও কোন প্রেতসাধকদের খপ্পরে পড়লাম না তো? ওদের আচার-আচরণ কিন্তু মোটেও সুবিধের ঠেকছে না আমার...'

কথা শেষ হলো না ওর। ফিরে এল ভালকান। ফায়ারপ্লেসের সামনে এসে বলল, 'তোমাদের ভাগ্য আমার চেয়ে অনেক ভাল। অন্তত ডাইনীদের খপ্পরে পড়োনি তোমরা।' লাল শার্টের একপাশ গুঁজল প্যান্টের মধ্যে। তুষারে ভেজা ওর বাদামী চুল লেপ্টে রয়েছে মাথায়, পুরোপুরি শুকায়নি এখনও।

'ঝড়ের তাড়া খেয়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়াটাই একটা বড় দুর্ভাগ্য,' না বলে আর পারল না রবিন।

'তা ঠিক। সুখের পর যেমন দুঃখ আসে, তেমনি সৌভাগ্যের পরে আসে দুর্ভাগ্য। বেড়াতে গিয়ে অনেক মজা করেছ, আনন্দ করেছ, তার খেসারত তো খানিকটা দিতেই হবে।' চোখা একটা লোহার শিক দিয়ে আগুনের

কয়লাগুলো খোঁচাতে খোঁচাতে আরেক কথায় চলে গেল ভালকাম. 'স্কিয়িং করতে আমার খুব ভাল লাগে। একটা স্কি লজেই লিসার সঙ্গে দেখা। সেই শেষ। তারপর বহু বছর আর স্কিয়িং করতে যাইনি।'

আরেকটা খটকা লাগল কিশোরের। বহু বছর যদি স্কিয়িং করতে না-ই গিয়ে থাকে, জ্যাকেটে টিকেট কেন? ওই জ্যাকেট পরে যে ইদানীং কেউ স্কিয়িং করে এসেছে টিকেটটাই তার প্রমাণ।

জ্যাকেটটা যে ভালকানের নয়, কোন সন্দেহ রইল না আর কিশোরের।

তাহলে কার? কোনও একটা রহস্য রয়েছে বাড়িটাকে ঘিরে। কি সেই রহস্য? ভাবতে গিয়ে কোন জবাব খুঁজে পেল না।

হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করতে লাগল সে। শুয়ে পড়ার জন্যে আনচান করে উঠল মন।

বকবক করেই চলেছে ভালকান, 'জানো, সেবার স্কিয়িং করতে গিয়ে কি ঘটেছিল? একটা বোকা গাধার পাল্লায় পড়েছিলাম। স্কিয়িঙের কিচ্ছু জানে না. খালি বড় বড় গপ্প। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যেই পড়ে গিয়ে ঠ্যাং ভাঙল···সে এক মজার গল্প। দাঁড়াও, সবটা বলেই ফেলি তোমাদের···' আরেকটা রোমাঞ্চকর গল্প ফাঁদতে যাচ্ছে সে।

শোনার ধৈর্য হলো না আর কিশোরের। চিলি খাওয়া শেষ করে খালি বাটিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল এঁটো বাসন-পেয়ালা সিংকে ফেলছে লিসা। শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। ভীষণ মন খারাপ। চোখে শূন্য দৃষ্টি। কোন কথা না বলে আবার মুখ ফেরাল সিংকের দিকে।

কোথায় ঘুমাবে জিজ্ঞেস করল কিশোর। মহিলার পিছু নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়। ওঠার সময় পায়ের চাপে মৃদু মচমচ করে উঠল সিঁড়ি। ওপরতলাটা নিচের চেয়ে গরম। ব্যালকনির রেলিঙ ঘেঁষে ঝুঁকে নিচে তাকাল। পাশাপাশি বসে আছে মুসা আর রবিন। শিক দিয়ে ফায়ারপ্লেসের কয়লা খোঁচাচ্ছে পটার। গল্প শোনাচ্ছে ভালকান। মাথার ওপরের কড়িবরগায় বাড়ি খেয়ে ফিরে যাচ্ছে তার ভারি মোটা গলা।

সরু একটা হলওয়ে ধরে নিয়ে চলল লিসা। একটা দরজা খুলে সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে বলল, 'তোমার ব্যাগ দিয়ে যাব?'

'না না, আপনার কষ্ট করা লাগবে না। আমিই আনব।'

চিলেকোঠার এই ঘরটাকে গেস্টরুম করা হয়েছে। সাদা দেয়াল। ছোট একটা জানালা দিয়ে সামনের আঙিনা দেখা যায়। একটা ডাবলবেড, একটা ড্রেসার, আর পিঠখাড়া একটা কাঠের চেয়ার আছে।

'মাথা উঁচু করতে সাবধান।' ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া নিচু ছাত দেখাল লিসা, 'বাড়ি খাবে।'

ঘরটা দেখে খুব খুশি কিশোর। সাংঘাতিক তুষারপাতের মধ্যে বড় আরামের জায়গা। লাল টকটকে বালিশের কভার। একই রঙের ভারি কম্বল।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে লিসা বলল, 'কোন জিনিসের দরকার হলে ডেকো আমাকে। লজ্জা কোরো না। দরজা থেকে চিৎকার করলেই শুনতে পাব।'

পাজামা রয়েছে ব্যাগের মধ্যে। একছুটে নিচে নেমে এল কিশোর। কারও দিকে না তাকিয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়ে আবার উঠে এল ওপরে। পোশাক পাল্টে আলো নিভিয়ে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। চাপ লাগতে মচমচ করে উঠল স্প্রিং। শব্দটাকে পাত্তাই দিল না। মুহূর্তে হারিয়ে গেল ঘুমের জগতে।

স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমাল কতক্ষণ ঠিক বলতে পারবে না। নড়েওনি যে স্প্রিঙের শব্দে ঘুম ভাঙবে। কিন্তু ভাঙল। সে নিশ্চিত, বাতাসের ঝাপটায় জোরে দরজা লেগে যাওয়ার শব্দ শুনেছে।

মুহূর্তে পুরো সজাগ হয়ে গেল। কান খাড়া।

দরজা খুলেছিল কেউ। হয় বেরিয়েছে, নয়তো ঢুকেছে। কোনটা?

উত্তেজনায় বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে হৃৎপিণ্ডটা। আস্তে করে বিছানা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল জানালায়। কপাল চেপে ধরল ঠাণ্ডা কাঁচে। ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া সামনের আঙিনাটার দিকে তাকাল।

কেউ নেই।

এখনও তুষার পড়ছে। কণাগুলোর আকার অনেকটা ছোট। পাতলাও হয়েছে। ওগুলোর নিজেরই আলো আছে বোধহয়, তাই অন্ধকারেও চমকায়। রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে উঠে পুরো দৃশ্যটাই কেমন অবাস্তব লাগছে। ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে। এখনই জেগে উঠে দেখবে সব মিলিয়ে গেছে, সে রয়েছে বিছানায়।

নিচতলায় কাঠের মেঝেতে মড়মড় শব্দ।

তারমানে বেরোয়নি, ঢুকেছে লোকটা। চোরের মত চলাফেরা করছে নিচে।

পা টিপে টিপে দরজার কাছে চলে এল কিশোর। নিঃশব্দে দরজা খুলে হলওয়ে পেরিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল।

ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভু নিভু। জ্বলন্ত কয়লা লালচে আভা সৃষ্টি করছে। পোড়া কাঠগুলোকে লাগছে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কালো কঙ্কালের মত।

আবার মড়মড় করে উঠল নিচের কাঠের মেঝে। কাশি শোনা গেল।

আলো নেই।

অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা।

রাতদুপুরে এ ভাবে চোরের মত কে ঢুকল? এ রকম তুষারঝরা দুর্যোগের রাতে?

ডাক দিতে গিয়েও দিল না কিশোর। ঝনঝন করে কি যেন মেঝেতে পড়ল। নিশ্চয় লোকটার হাতে লেগে পড়েছে। অসতর্ক চোর! নাকি ওদের মতই কোন বিপদে পড়া লোক আশ্রয় চাইতে ঢুকেছে? কিন্তু বাইরে থেকে তালা খুলল কি করে?

ভালকানের রক্তলোভী ডাইনীদের গল্প মনে পড়ল কিশোরের। আরেকটা প্রায় একই ধরনের হরর গল্পের কথা ভাবল। রাত দুপুরে অসহায় আশ্রিতকে ধরে কুড়াল আর করাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে গল্পের বিকৃত-মস্তিষ্ক

ভিলেন। ভালকানেরও মাথার ঠিক নেই…

গায়ে কাঁটা দিল ওর। ব্যালকনিতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। গায়ে গরম কাপড় নেই।

নিচের শব্দ থেমে গেছে।

আরও একটা মিনিট দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। কাঁপুনি ধরে গেল। আর থাকা যাচ্ছে না। ভীষণ ঠাণ্ডা। ঘরে ফেরার জন্যে ঘুরতে যাবে ঠিক এই সময় মচমচ করে উঠল সিঁড়ি।

বরফের মত জমে গেল যেন সে। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

উঠে আসছে লোকটা।

ছয়

দ্রুত হলওয়ে পার হয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। প্রয়োজন হলে চট করে ঘরে ঢুকে যাতে দরজা লাগিয়ে দিতে পারে। কুড়াল কিংবা বড় ছুরি হাতে কাউকে আসতে দেখলে দাঁড়িয়ে থাকার অকারণ ঝুঁকি নেবে না…

কালো একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল সিঁড়ির মাথায়। মনে হলো ওকে দেখে ফেলেছে। একবার দ্বিধা করে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

'আপনি!' চিনে ফেলল কিশোর।

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল পটার। কিশোরের কাঁধ চেপে ধরে ঠেলে নিয়ে এল ঘরের ভেতর। দরজা লাগিয়ে দিল।

'আপনার হাত এত ঠাণ্ডা কেন? কোথায় গিয়েছিলেন?'

আবার ওকে আস্তে কথা বলতে ইশারা করল পটার।

সুইচটা হাতড়ে খুঁজে বের করে বেডসাইড ল্যাম্প জ্বেলে দিল কিশোর।

পটারের গায়ে জ্যাকেট। ঠাণ্ডায় লাল হয়ে গেছে কানের লতি। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঘুমাওনি?' জিপার টেনে জ্যাকেটটা গা থেকে খুলে ফেলল সে।

'ঘুমিয়েছিলাম। আপনি জাগিয়েছেন। সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় গিয়েছিলেন এত রাতে?'

বিছানার পাশে বসে হাতের তালু ডলে গরম করতে লাগল পটার। 'ঘুম আসছিল না।' হাতের আঙুল চিরুনির মত ব্যবহার করে পেছনে সরিয়ে দিতে লাগল লম্বা চুল। 'লিসাদের বেডরূমের পাশের একটা ঘরে আমাকে থাকতে দিয়েছে,' চোখে অস্বস্তি নিয়ে দরজার দিকে তাকাল সে। 'এত জোরে জোরে চিৎকার করছিল… ঝগড়া…'

'এতে অবাক হওয়ার কি হলো?' একটা বালিশ কোলের ওপর টেনে নিয়ে তাতে থুঁতনি রাখল কিশোর। 'স্বামী-স্ত্রী মানেই সারাক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি…'

'ওই ঝগড়া নয়।' কিশোরের কাছে ঝুঁকে এসে কণ্ঠস্বর আরও খাদে

নামিয়ে বলল পটার, 'লিসাকে মেরেছে ভালকান।'

'তাতেই বা কি? রাগ হলে অনেক স্বামীই স্ত্রীকে চড় মারে। কিলঘুসিও মারে। স্ত্রীরাও কম যায় না...'

'ঘুসি মেরেছে। সাংঘাতিক জোরে।'

'তা মারতেই পারে। ভালকানকে দিয়ে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।'

'সেটাই বলতে চাইছি আমি।'

'বলাবলির দরকার কি? কারও স্ত্রীকে কেউ যদি মারে তো আমরা কি করতে পারি?'

'তুমি বুঝতে পারছ না। গুঙিয়ে উঠে চুপ হয়ে গেল লিসা।'

'এক ঘুসিতেই কাবু। ভয় পেয়েছে হয়তো। এই ঠাণ্ডার মধ্যে আর পিটুনি খেতে চায়নি...'

'দেখো, আমি সিরিয়াস। জেমস হেডলি চেজের একটা গল্প পড়েছিলাম, ঘুসি মেরে মহিলার ঘাড় ভেঙে দিয়েছে এক খুনী...'

'আপনি কি বলতে চাইছেন...' হালকা ভাব চলে গেছে কিশোরের কণ্ঠ থেকে। শীত লাগা বেড়ে গেল। গায়ে জড়ানোর জন্যে টান দিল কম্বলটা।

মাথা ঝাঁকাল পটার, 'ঘুসি মারার পর লিসা একেবারে চুপ। টুঁ শব্দ নেই আর। কিশোর, আমার ভয় লাগছে!'

পটারের দিকে তাকাল কিশোর, 'কি নিয়ে ঝগড়া করছিল?'

'বুঝতে পারিনি। চেঁচানো শুরু করতেই বিরক্ত হয়ে বালিশ দিয়ে কান ঢেকে ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম। ওদের কথা তাই ভালমত কানে ঢোকেনি। শেষে কৌতূহল ঠেকাতে না পেরে বালিশ সরালাম। এই সময় ঘুসি মেরে বসল ভালকান।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটল কিশোর। 'হুঁ, চিন্তারই কথা। কি করা যায়? পুলিশকে ফোন?'

'বুঝতে পারছি না। সব কিছু না জেনে শুধু সন্দেহের বশে এক্ষুণি ডাকাটা বোধহয় ঠিক হবে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল পটার।

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি এত রাতে বাইরে গিয়েছিলেন কেন?'

'মাথা ঠাণ্ডা করতে। ওদের ঝগড়াঝাঁটি মাথা গরম করে দিয়েছিল আমার।'

'কিন্তু বাইরে তো ভয়ানক ঠাণ্ডা!'

'তাহলেই বোঝো, কতটা গরম হয়ে গিয়েছিল মাথা।' কিশোরের দিকে তাকাল পটার, খুব সুন্দর হয়ে আছে এখন বাইরেটা। সাদা বরফ, ঝকঝকে পরিষ্কার। বাতাস নেই। সব চুপচাপ।...ওসব কথা থাক, কিশোর, আমার ভাল লাগছে না। যে কথাটা বলতে এলাম। আমাদের পালাতে হবে! ভালকান একটা উন্মাদ!'

'বেশি গিলে মাতাল হয়ে গেছে।'

'মুসার সঙ্গেও বনছে না। তুমি চলে আসার পর তর্ক শুরু করল। যে কোন সময় লেগে যাবে। মুসার অবশ্য তেমন দোষ নেই। তাকে অকারণে

খোঁচাচ্ছিল ভালকান। উত্তেজিত করে একটা গণ্ডগোল বাধানোর চেষ্টা করছিল। বুঝলাম না কেন।'

'হুঁ!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'ভাল একটা গ্যাড়াকলেই পড়লাম। আকাশ পুরোপুরি ভাল না হলে বাড়িও রওনা হতে পারব না। মুসাকে বলে দিতে হবে, ভালকান যা করে করুক. সে যেন ঝগড়া না বাধায়।'

'যাই,' উঠে দাঁড়াল পটার। 'সাবধানে থেকো।'

পাল্লাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল সে।

বালিশে থুতনি ঠেকিয়ে কয়েক মিনিট ভাবল কিশোর। তারপর শুয়ে কম্বলটা টেনে দিল গলার কাছে। ঘুমিয়ে পড়ল।

চোখ মেলতে মেলতে সকাল। কোথায় রয়েছে মনে করতে সময় লাগল। নিচতলা থেকে ভেসে এল মাংস আর ডিমভাজার সুবাস। মোচড় দিয়ে উঠল পেট। খিদে পেয়েছে।

গরম বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করল না। জোর করে টেনে তুলল নিজেকে। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল রোদ। রাতেই তুষারপাত থেমে গেছে। তবে দমকা বাতাস বইছে। ঝাপটা মেরে পেঁজা তুলোর মত উড়িয়ে দিচ্ছে বরফে পড়ে থাকা আলগা তুষারের কণা। গাছের গায়ে পুরু বরফ।

রাস্তার দিকে তাকাল। আলাদাভাবে কিছু চোখে পড়ল না। শুধু বরফ আর বরফ। মসৃণ, চকচকে, সাদা বরফ। মানুষজন নেই। স্নোপ্লাউ আসেনি। রাস্তা সাফ করার শ্রমিকরা কাজ করছে না।

নিচে কথা শোনা যাচ্ছে। ব্যাগ খুলে মোটা গরম কাপড়ের শার্ট-প্যান্ট বের করে পরল সে। গায়ে দিল সবচেয়ে ভারি সোয়েটারটা। চুল আঁচড়াল। তারপর নিচে রওনা হলো। খাবারের গন্ধ পাগল করে তুলেছে।

'ওই যে, এসে গেছে কোঁকড়াচুল। গুড মর্নিং,' হাসি হাসি কণ্ঠে স্বাগত জানাল ভালকান।

রান্নাঘরে স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। ফ্রাইং প্যানে ডিম ভাজছে। গায়ে আগের রাতের সেই লাল শার্টটা। পরনে একই প্যান্ট। লম্বা টেবিলের সামনে বেঞ্চে বসে পড়েছে মুসা, রবিন আর পটার। জানালা দিয়ে আলো আসছে।

'তুষার পড়া থেমে গেছে,' হাসিমুখে জানাল রবিন, যেন এখনও সেটা জানে না কিশোর।

'বরফ সরানোর মেশিন চলে আসবে যে কোন সময়,' ভালকান বলল। প্যানটা এনে রাখল টেবিলে। একটা হাতা দিয়ে খোঁচা মেরে ডিম তুলে দিতে লাগল সবার পাতে। একধারে রাখা বোতল দেখিয়ে কিশোরকে বলল, 'কমলার রস। ঢেলে নাও।'

ধন্যবাদ দিয়ে এক গ্লাস রস ঢেলে নিল কিশোর।

মুখভর্তি গরম ডিম নিয়ে বিপাকে পড়ে গেল মুসা। জিভ নেড়ে কোনমতে

এপাশ ওপাশ করে গিলে ফেলল কোঁৎ করে। 'উফ্, জিভটা গেছেরে বাবা!...' কিশোরের দিকে তাকাল, 'রেডিও বলল, আরেকটা ঝড় আসছে। যেটা গেছে তারচেয়ে বড়। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পালাতে হবে আমাদের।'

'আমার কথা যদি শোনো, বরফ সরানোর আগে বেরিয়ো না,' সাবধান করল ভালকান। 'কয়েক ফুট উঁচু হয়ে জমেছে। নষ্ট গাড়িতে করে...'

'নষ্ট নয়,' শুধরে দিল মুসা, 'পুরানো।'

'ওই একই কথা। পুরানো এঞ্জিনের ওপর ভরসা নেই।'

চোখের ইশারায় মুসাকে তর্ক করতে নিষেধ করল কিশোর। লিসা নেই রান্নাঘরে। ভালকানকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার স্ত্রী কোথায়?'

শূন্য প্যানটা নিয়ে গিয়ে সিংকে ফেলল ভালকান। গরম পানি ছেড়ে দিল ওটার ওপর। পেছন ফিরে জবাব দিল, 'ঘুমের বড়ি গিলিয়ে দিয়েছি। মরার মত ঘুমাচ্ছে।'

চট করে কিশোরের চোখে চোখে তাকাল পটার।

চামচ দিয়ে ডিম কাটল কিশোর। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। লিসা কি বেঁচে আছে? মিথ্যে বলছে না তো ভালকান? বলে বলুকগে। ওদের এখন একমাত্র কাজ, এখান থেকে বেরোনোর চেষ্টা করা। ঝড় আসার আগেই। শহরে যেতে পারলে পুলিশকে সব জানানো যাবে। ওরা এসে দেখবে লিসার কি হয়েছে।

নাস্তার পর পাশে রাখা জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে দরজার দিকে এগোল মুসা। ভালকান জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ, তারের জাল?'

'গাড়িটা দেখতে।'

'খামাখা যাচ্ছ। স্নোপ্লাউ না এলে রাস্তাই পাবে না।'

'এঞ্জিনটা স্টার্ট নেয় কিনা দেখব।' বুট পরতে শুরু করল মুসা। 'ব্যাটারিটাও দুর্বল...'

'সেজন্যেই তো বলছি, যেয়ো না। মরবে।'

কিশোর বলল। 'ঘরে থাকতে আর ভাল লাগছে না। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।'

'আমিও যাব।' জ্যাকেট আনতে হলঘরে চলে গেল পটার।

'আমি বরং থাকি,' রান্নাঘরের উষ্ণতা ছেড়ে এত ঠাণ্ডায় বেরোতে ইচ্ছে করছে না রবিনের। 'ডিশপ্লেটগুলো ধুয়ে ফেলি। মিসেস ভালকানকে কষ্ট দিতে চাই না আর।'

খুশি হলো ভালকান। রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। দাড়ির গোড়া চুলকাল। মুসাকে বলল, 'যাওয়ার জন্যে এত তাড়াহুড়া করছ কেন তোমরা বুঝতে পারছি না। এখানে তো থাকা-খাওয়ার কোন অভাব হচ্ছে না। অযথা গোঁয়ার্তুমি করছ কেন? কপাল ভাল, আমি তোমার বাবা নই।'

'সত্যি ভাল,' সাফ জবাব দিয়ে দিল মুসা।

অবাক লাগছে কিশোরের। থাকার জন্যে এত চাপাচাপি করছে কেন ভালকান? ওরা থাকলেই তো বরং ঝামেলা! মুসাকে তার গাড়ি দেখতে যেতে

দিতেও নারাজ লোকটা। ঘটনাটা কি?

বাইরে বেরিয়ে আগে আগে চলল পটার আর মুসা। পেছনে কিশোর।

তুষারে ঢাকা ঢালু আঙিনা ধরে নামার সময় কোন শব্দ হলো না। বুটের শব্দকে ঢেকে দিচ্ছে নরম তুষার। জুতো দেবে গিয়ে গোড়ালি পর্যন্ত উঠে আসছে।

'দারুণ তো!' নিচু হয়ে এক খাবলা তুষার তুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে স্নোবল বানাল মুসা, ছুঁড়ে দিল কিশোরকে সই করে। মাথা নিচু করে ফেলল কিশোর। বলটা উড়ে গেল ওপর দিয়ে। বরফে পড়ে নিঃশব্দে ভেঙে চুরচুর হয়ে ছড়িয়ে গেল।

পটার বলল, 'দৌড়ানো দরকার। নইলে গা গরম হবে না।'

কয়েক পা দৌড়ে গিয়েই বুঝল এত নরম তুষারের মধ্যে কাজটা অসম্ভব। ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল। মুখ দেবে গেল তুষারে।

কাছে গিয়ে ওকে উঠতে সাহায্য করল কিশোর। হাত ধরে টেনে তুলতে গিয়ে পা পিছলাল। নিজেও আছাড় খেয়ে পড়ল তুষারে।

পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। হাসতে হাসতে বলল, 'কি হলো?'

'খুব মজা কিন্তু!' উঠে বসল কিশোর। সোয়েটারের বুক থেকে তুষার ঝাড়ল। 'দেখো গড়াগড়ি করে। মনে হবে তুলোর মধ্যে গড়াচ্ছ।'

'তুলো এত ঠাণ্ডা নয়।'

'তারপরেও মজা।'

হাসাহাসি করতে করতে এগোল তিনজনে।

রাস্তার কাছে এসে দাঁড়াল। বরফে ঢেকে গিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিশোরের অনুমান এখান থেকেই শুরু হয়েছে রাস্তাটা।

'গাড়িটা কই?' বরফে রোদ ঠিকরে আসছে। চোখ বাঁচানোর জন্যে কপালে হাত তুলে এদিক ওদিক তাকাল মুসা। একটা বাঁকের অন্যপাশে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। হাঁ হয়ে গেল মুখ। দুচোখে বিস্ময়।

কিশোরও তাকাল। বাঁকের পরে সোজা রাস্তা। আর কোন মোড় নেই। অনেক দূর চোখে পড়ে। কিন্তু কোথাও দেখা গেল না গাড়িটা।

নেই!

সাত

শূন্য পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনে। আরেকবার চাচার রসিকতার কথা মনে পড়ল কিশোরের। দৃশ্যপট সাদা কাগজের মতই সাদা।

ঝাঁকি মেরে গাছ থেকে তুষার ঝরিয়ে দিয়ে গেল দমকা বাতাস। কিন্তু সে সৌন্দর্য দেখার মত মনের অবস্থা এখন কারোরই নেই।

'ওখানে গাড়িটা রেখেছিলাম,' কয়েকটা গাছ দেখিয়ে বলল মুসা। কথা বলার সময় মুখ থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম সাদা বরফের কণায়

পরিণত হচ্ছে বাতাস
রাস্তার পাশে গভীর খাদ। আছাড় খাওয়ার পরোয়া না করে বুটের মচমচ শব্দ তুলে সেই খাদের ধারে দৌড়ে গেল পটার। ঝুঁকে তাকাল-নিচের দিকে।

কিশোর ভেবে পাচ্ছে না, এই নির্জন জায়গায় তুষারঝড়ের মধ্যে কে এল এত পুরানো একটা গাড়ি চুরি করতে?

'ওই যে!' আঙুল তুলে নিচে দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল পটার।

দেখার জন্যে ছুটে গেল মুসা আর কিশোর।

খাদের মধ্যে নাক গুঁজে পড়ে আছে জেলপি। অর্ধেক শরীর ঢেকে গেছে তুষারে।

'খাইছে! বিশ্বাস করতে পারছি না আমি!' দস্তানাপরা ডান হাত মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল মুসার। 'ওই গাছগুলোর কাছে রেখেছিলাম আমি, পরিষ্কার মনে আছে। খাদের নিচে গেল কি করে?'

'রাস্তা সাফ করতে এসে স্নোপ্লাউ দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে হয়তো,' দস্তানা পরা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভুরুতে লেগে থাকা তুষার পরিষ্কার করল পটার। 'অন্ধকারে দেখতে পায়নি।'

রাস্তার দিকে তাকাল আবার মুসা আর কিশোর।

'কেউ আসেনি তুষার সরাতে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর। 'মেশিন চালালে বরফে চেনের দাগ থাকত, এত মসৃণ থাকত না ওপরটা।'

'সরিয়ে যাওয়ার পর আবার তুষার পড়ে সমান করে দিয়েছে হয়তো।'

বিশ্বাস করতে পারল না কিশোর। তার মনে হলো, ইচ্ছে করে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে দরজায় তালা ছিল না। ভেতরে ঢুকে হ্যান্ডব্রেক খুলে দিলেই ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাবে গাড়ি। সহজ কাজ।

কিন্তু এই সহজ কাজটা কে করল?

ভালকান?

কিন্তু সে কেন করবে? ওদের আটকানোর জন্যে। আটকাতে চায় কেন?

মন থেকে কোন জবাব পেল না কিশোর।

তবে আটকা পড়েছে ওরা ভালমত। অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত খেপাটে একজন মানুষের বাড়িতে। লোকটা পাগল। অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের মালিক।

'এখন কি হবে? আটকা তো পড়লাম,' বলে উঠল মুসা। 'বাড়ি যাব কি করে?'

'ভালকান আমাদের শহরে দিয়ে আসবে,' কিশোর বলল। 'থাকতে দিয়ে অনেক সাহায্য করেছে, আশা করি এটুকুও করবে। ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে কিংবা বাস ধরে চলে যাব।'

'গাড়িটার কিন্তু তেমন ক্ষতি হয়নি,' খাদের দিকে তাকিয়ে বলল পটার। আশা ছাড়তে পারছে না। ঠাণ্ডায় আগুনের মত লাল হয়ে গেছে গাল। 'তুলে আনা গেলে স্টার্ট নিতে পারে।'

'কে তুলে আনবে?' মুসার প্রশ্ন।

'টো-ট্রাক কোম্পানি,' জবাবটা দিল কিশোর। মুসার হাত ধরে টানল. 'ঘরে চলো। ওদের ফোন করব।'.

যতটা খুশি খুশি মন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল ওরা, ফেরার সময় সেটা থাকল না। হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ।

বরফে প্রতিফলিত হয়ে আসা উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে চোখ বাঁচানোর জন্যে মুখ নিচু করে রেখেছে কিশোর। বাড়ির কথা ভাবছে। ওর মেসেজ নিশ্চয় এতক্ষণে পেয়ে গেছে চাচা-চাচী। তারা কি এখন দুশ্চিন্তা করছে? নিজের শোবার ঘরটার কথা ভাবল। সেটার সঙ্গে ভালকানের চিলেকোঠার তুলনা করে মনটা খারাপ হয়ে গেল। নাহ্, আজ আর থাকবে না কোনমতেই। রাতের মধ্যেই বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করবে।

সামনের দরজার কাছে ওদের স্বাগত জানাল ভালকান। হাসিমুখে একটা ইঁদুরের কল তুলে দেখাল, 'এই দেখো, কি ধরেছি। লাঞ্চের সময় ভেজে দিলে কেমন হয়?' ফাঁদে আটকা পড়েছে একটা ছোট ইঁদুর। পেটের কাছে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে বাঁকা শিকটা। নাড়ীভুঁড়ি সব বেরিয়ে গেছে। বীভৎস দৃশ্য দেখে মজা পাচ্ছে যেন ভালকান। মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে বলল, 'একেবারে দুটুকরো করে দিয়েছে।'

'উফ্,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল পটার, 'আপনি কি মানুষ, ভালকান? দেখলেই তো বমি আসে! আর আপনি মজা পাচ্ছেন!'

উজ্জ্বল আলো থেকে এসে চোখে ঘরের আলো সওয়াতে সময় লাগছে কিশোরের।

ভালকান জবাব দিল, 'শিকার একটা মজার জিনিস। বমি আসবে কেন? আজকালকার ছেলেগুলো যে এত ভীতু...!' হঠাৎ যেন লক্ষ করল ওদের মন খারাপ। 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'গাড়িটা খাদে পড়ে গেছে,' ভোঁতাস্বরে বলল মুসা। বুটের তুষারগলা পানি কার্পেট ভিজিয়ে দিচ্ছে দেখে খুলে ফেলার জন্যে নিচু হলো।

'খাদে?' হাসি হাসি ভঙ্গিটা চলে গেল ভালকানের। 'দাঁড়াও, আসছি। শুনব।'

পাশের ঘরে চলে গেল সে। বোধহয় ইঁদুরটাকে ফেলে আসতে।

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল রবিন। পোশাক পরা। বেরোনোর জন্যে তৈরি। ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাগ নিয়ে আসব?'

'না,' ওপর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল কিশোর, 'বেরোতে পারব না। গাড়ি খাদে পড়ে গেছে।'

'কি করে!'

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ফিরে এল ভালকান। বলল, 'নিশ্চয় ঢালু জায়গায় রেখেছিলে। তাড়াহুড়োয় হ্যান্ডব্রেক লাগাতে ভুলে গেছ।'

'উঁহুঁ!' মাথা নাড়ল মুসা। 'আমার স্পষ্ট মনে আছে...'

'অত চিন্তার কিছু নেই। টো সার্ভিস আছে শহরে। ফোন করলেই চলে আসবে,' তোয়ালেটা চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলে ফোনের দিকে এগিয়ে গেল ভালকান। টেবিলের কোণ থেকে ডিরেক্টরি টেনে এনে নম্বরের জন্যে হলুদ পাতাগুলো ওল্টাতে শুরু করল।

'আজ নিশ্চয় অনেক ব্যস্ত ওরা। ঝড়ের মধ্যে বহু গাড়ি খাদে পড়ে কিংবা বরফে দেবে যায়। টো কোম্পানির পোয়াবারো।' নম্বরটা খুঁজে পেল সে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল।

মিলিয়ে গেল হাসিটা। কানের ওপর চেপে ধরল রিসিভার। জোরে জোরে নম্বর টিপতে লাগল।

'কি হয়েছে?' জবাবটা আন্দাজ করে ফেলেও জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ফিরে তাকাল ভালকান। বিরক্তিতে কুঁচকে গেছে কপাল। 'ডেড! বোধহয় লাইন খারাপ!'

আট

রিসিভারটা ক্রেডলে আছড়ে ফেলল সে। ষাঁড়ের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল, 'হুয়া! কাল রাতে ঝড়ের মধ্যেও ঠিক ছিল। আর নষ্ট হলো কিনা ঝড় থেমে যাবার পর। কোন মানে হয়?'

রাগ সামলাতে না পেরে টেলিফোন সেটটা তুলেই ছুঁড়ে মারল দেয়ালের গায়ে।

ভয় পেয়ে গেল পটার, 'থাক না! ওটাকে ভেঙে আর কি হবে!'

ভয়ে ভয়ে মুসা বলল, 'তারে নিশ্চয় খুব বেশি বরফ জমে গিয়েছিল। ভার সইতে না পেরে ছিঁড়েছে।'

কারও কথাই যেন কানে ঢুকল না ভালকানের। দ্রুতপায়ে পায়চারি করতে করতে বার বার ফিরে তাকাতে লাগল ফোনটার দিকে। চোখে আক্রোশ।

দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। গাড়ি ঠেলে ফেলার ব্যাপারে ভালকানকে সন্দেহ করতে পারছে না আর। আটকেও বোধহয় রাখতে চায় না। তাহলে ফোন নষ্ট হওয়ায় খুশি না হয়ে এ ভাবে রেগে যেত না।

তবে তাতে দুশ্চিন্তা কমল না কিশোরের। বাড়ল আরও। গাড়ি নেই। ফোন নষ্ট। কারও সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না। রাতের মধ্যে বাড়ি পৌঁছার আশা শেষ।

রবিনের মুখ কালো। ওপরতলা থেকে নেমে এসে সোফায় বসেছে।

'এরপর কোনটা যাবে?' চিৎকার করে উঠল ভালকান, 'ইলেকট্রিসিটি? সব অন্ধকার! সামান্য একটু ঝড় হলো কি না হলো, সব শেষ! এখানে বাস করবে কি করে মানুষ!' দুই হাতে দাড়ি খামচাতে খামচাতে ওসব সংস্থার কর্মচারীদের গালাগাল শুরু করল সে।

ভালকানের খেপামি বন্ধ করার জন্যে শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'কাছাকাছি শহরে যাওয়ার নিশ্চয় কোন উপায় আছে?'

'গাধাগুলো সে ব্যবস্থাও করছে নাকি?' আরও খেপে উঠল ভালকান। 'বরফ সাফ করে দিলে জীপ নিয়ে চলে যেতে পারতাম। আলসের দল নড়তেই চাইছে না! জানে খালি ট্যাক্স নিতে!'

'আপনার জীপ আছে?' জ্বলজ্বল করছে মুসার চোখ।

'কেন, থাকাটা কি দোষের?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল মুসা, 'কোথায় ওটা?'

'গোলাঘরে।'

'ফোর-হুইল ড্রাইভ? তাহলে বরফেও চালানো যাবে।'

'হ্যাঁ,' মুসার সঙ্গে সুর মেলাল পটার।

মাথা নেড়ে আবার রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল ভালকান। আছাড় দিয়ে ফেলল। 'নাহ্, গেছে!' ধাঁ করে লাথি মারল একটা আর্মচেয়ারের পায়ায়। 'যাবে না! ফোর কেন, এইট-হুইল ড্রাইভ হলেও এই বরফ ঠেলে এগোতে পারবে না। স্নোপ্লাউ ছাড়া আর কিচ্ছু চলতে পারবে না এখন।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?' আশা ছাড়তে পারছে না মুসা। 'খারাপ রাস্তায় চলার উপযোগী করেই তৈরি হয় জীপগুলো।'

জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল ভালকান। 'বেশি ওস্তাদ মনে হয়?'

'ও ঠিকই তো বলছে,' ভালকানের মেজাজের জন্যে জোর দিয়ে বলতে সাহস করল না পটার, 'দেখতে দোষ কি?'

খেঁকিয়ে উঠল না আর ভালকান। লেপ্টে থাকা চুলে আঙুল চালাল। 'কি করব কিছু বুঝতে পারছি না...'

'দেখুন,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থাটা। বাড়িতে নিশ্চয় সবাই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে। একটা ফোন করেও যদি জানিয়ে দিতে পারি, আমরা ভাল আছি, দুশ্চিন্তাটা অন্তত কম করবে।'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল, 'দেখাই যাক না বেরিয়ে। এগোতে না পারলে আবার ফিরে আসব।'

'বেশ,' রাগ অনেকটা কমল ভালকানের, 'চলো, দেখি কি করা যায়। ঝড়টা এসে পড়ার আগেই যদি শহরে পৌছে যেতে পারি...তোমাদের থাকতে বলতে আর সাহস পাচ্ছি না। যা শুরু করেছ, যেতে না দিলে ধরে খেয়েই ফেলবে আমাকে!'

'চলুন,' খুলে রাখা বুটজোড়া আবার টেনে নিল মুসা।

'এখনই বেরোতে পারছি না,' হাত নাড়ল ভালকান, 'কয়েকটা কাজ সেরে নিতে হবে আগে। বাইরে গিয়ে স্নোবল খেলো, সময় কাটবে, অস্থিরতাও কমবে। আমি ততক্ষণে সেরে ফেলি।'

ঘরে থাকতে মোটেও ভাল লাগছে না কিশোরের। 'ঠিক আছে।' দুই সহকারীকে বলল, 'এই, চলো।' পটারের দিকে তাকাল, 'আপনি যাবেন?'

'চলো,' ঘাড় কাত করল পটার। ওসব ছেলেমানুষী খেলা খেলার ইচ্ছে তেমন নেই। বাইরে বেরোনোটাই আসল উদ্দেশ্য।

'দেখো, আবার তুষার খাওয়া শুরু করে দিয়ো না,' নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হেসে উঠল ভালকান। আর কেউ হাসল না। এত স্থূল রসিকতায় হাসি আসে না কারও।

'শহরে রেন্ট-আ-কারের দোকান আছে?' জানতে চাইল রবিন।

'তা বোধহয় আছে,' রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ভালকান। 'থাকারই কথা।' হাসিটা উধাও হয়ে গেল মুহূর্তে। কুঁচকে ফেলল মুখচোখ। ফোনের আশা বাদ্ দিয়ে নিচু স্বরে গালাগাল করতে করতে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

ব্যাগ নেয়ার জন্যে ওপরতলায় এসে উঠল তিন গোয়েন্দা আর পটার। গোছগাছ করে নিতে দুমিনিটের বেশি লাগল না। বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা।

নিচে নেমে ব্যাগগুলো রেখে দিল রান্নাঘরের দরজার পাশে। বুট পরে জ্যাকেট গায়ে দিয়ে বাইরে বেরোল খেলাধুলা করে সময় কাটাতে। উত্তর থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসছে ধূসর রঙের একটুকরো মেঘ। বাকি আকাশটা নীল। পেছনের আঙিনায় জমা তুষার চকচক করছে রোদে। খুব সুন্দর।

বাড়ির পেছন দিকে গোলাঘর। কাঠের পুরানো একটা ছাউনি। কত বছর রঙ করা হয়নি কে জানে। ছাতে বরফ জমে আছে। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। টিলাটক্করের মত। অদ্ভুত দেখতে।

গোলাবাড়ির পেছনে একটা লেক। পানি এখন জমাট বরফ। তার ওপর তুষার পড়েছে। চিকচিক করছে সকালের রোদে।

'ইস্, আইস স্কেট থাকলে ভাল হত,' অপূর্ব সুন্দর সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আফসোস করল মুসা। 'স্কেটিং করতে পারতাম।'

'গোলাঘরে থাকতে পারে,' রবিন বলল।

ছাউনিতে ঢুকে দেখার জন্যে পা বাড়াল মুসা। তুষারে দেবে যাচ্ছে বুট।

ডেকে ওকে থামাল কিশোর, 'স্কেটিঙের সময় নেই এখন। ভালকান বেরোলেই রওনা হব।'

'তাহলে স্নোবল খেলি?'

'বাচ্চাদের খেলা। অনেক বড় হয়ে গেছি আমরা।'

'কিছু একটা করে সময় তো কাটানো দরকার। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে ঠাণ্ডাও লাগবে বেশি।'

ভালকান বেরোয় কিনা দেখার জন্যে রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকাল কিশোর। কানে এল পটারের চিৎকার, 'কিশোর, মাথা সরাও!'

ঝট করে সরিয়ে ফেলল কিশোর। কিন্তু পুরোপুরি বাঁচতে পারল না। কাঁধে এসে লাগল তুষারের গোলা। তাকিয়ে দেখল মুসা হাসছে। হাতে একতাল তুষার। সে তাকাতেই বলল, 'দারুণ! চাপ দিলেই বল হয়ে যায়।'

ছোটবেলায় গ্রীনহিলসে থাকতে বড়দিনের তুষারপাতের সময় চুটিয়ে

স্নোবল খেলত ওরা। ওখান থেকে চলে আসার পর বহুদিন খেলেনি। কি জানি কি মনে হলো, নিচু হয়ে এক খাবলা তুষার তুলে নিল কিশোর। মুহূর্তে চাপ দিয়ে বল বানিয়ে ছুঁড়ে মারল মুসাকে সই করে। লাগাতে পার না। মুসার পায়ের কাছে পড়ল ওটা।

রবিনও চুপ করে রইল না। দেখাদেখি পটারও বল বানাতে শুরু করল। ছুঁড়ে মারতে শুরু করল একে অন্যকে সই করে। 'ছেলেমানুষী খেলা' কথাটা মাথা থেকে উড়িয়ে দিতেই মজা পেয়ে গেল।

সবচেয়ে বেশি মজা পাচ্ছে মুসা। রীতিমত একটা ভাঁড় হয়ে গেল। হি-হি করে হাসছে গোলা এড়ানোর জন্যে। তুষারে গড়াগড়ি খাচ্ছে বাচ্চাদের মত।

কখন যে দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা, বলতে পারবে না। রবিন আর কিশোর একদলে, মুসা আর পটার আরেক দল। বল বানাচ্ছে আর ছুঁড়ছে। বিরতি নেই। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। পাঁচটা মারলে একটা লাগে।

কিশোর একটা বল মারতেই মাথা নিচু করে ফেলল পটার। ঠিক এই সময় বল মারল রবিন। একেবারে পটারের মুখে লেগে ফাটল। হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'পটার, বুলস-আই!'

মুসা একটা বল লাগিয়ে দিল রবিনের কপালে, 'আমাদেরও বুলস! সমান সমান পয়েন্ট!'

হাসি আর খেলায় এতই মগ্ন ওরা, গোলাঘরের দরজা থেকে চমকে দিল ভালকান, 'অ্যাই, তোমাদের ব্যাগ তোলো। আমি জীপের চাবি নিয়ে আসি।'

কখন সে ঢুকেছিল ওখানে, দেখেনি ওরা।

হাতের বলটা ফেলে দিল কিশোর। খেলায় মগ্ন থাকায় আরেকটা জিনিস লক্ষ করেনি এতক্ষণ, আকাশের নীল আর দেখা যাচ্ছে না। ঘন কালো ভারি মেঘ ঢেকে দিয়েছে। ঠাণ্ডাটাও টের পেল হঠাৎ। তুষারে গড়াগড়ি করে ভিজে গেছে শরীরের খোলা অংশগুলো। গাল মনে হচ্ছে আগুনে পুড়ছে। হাত দিয়ে নাক ছুঁয়ে দেখল। অনুভূতি নেই।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের সামনে থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে এসে গোলাঘরে ঢুকল ওরা। বাইরের চেয়ে তাপমাত্রা বেশি এখানে। তবে খুব সামান্য। শক্ত মাটি। খড় পড়ে আছে সর্বত্র। বাতাস ভারি। তাতে একধরনের পুরানো মিষ্টি গন্ধ।

সুইচ খুঁজে বের করে টিপে দিল পটার। ছাতের বর্গায় লাগানো একটা ফ্লোরেসেন্ট লাইট জ্বলে উঠল।

ছোট জীপটা দেখা গেল। গাড়ি দেখে এত খুশি আর জীবনে হয়নি কিশোর।

গোলাঘরের পেছনের দেয়ালের দিকে হাত তুলে মুসা বলল, 'ওই দেখো, একটা স্নোমোবাইল!'

'ইস্‌সি, আগে জানলে কাজ হত,' আফসোস করল রবিন। 'স্নোবল না খেলে তুষারে ছুটাছুটি করতে পারতাম। এখন তো আর সময়ই নেই।'

বাইরে বাতাসের বেগ বাড়ছে। অন্ধকার হচ্ছে আকাশ।

শহরে পৌঁছানো গেলেও বাড়ি রওনা হতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো কিশোরের। টো-ট্রাক এনে এই আবহাওয়ায় মুসার গাড়ি উদ্ধারের আশাও বাদ। যা হয় হবে, আগে শহরে তো পৌঁছানো যাক—দুশ্চিন্তাগুলো মাথা থেকে দূর করে দিল সে। জীপের পেছনে ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে চোখ পড়ল নম্বর প্লেটের দিকে, 'এই দেখো, আলাবামার লাইসেন্স প্লেট। লস অ্যাঞ্জেলেসের নয়।'

'তাতে কি?' অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটল পটারের চোখে।

'বাস করছে লস অ্যাঞ্জেলেসে, গাড়ির লাইসেন্স আলাবামার হবে কেন?'

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? এক জায়গা থেকে গাড়ি কিনে হামেশাই আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে লোকে।' প্লেটের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল পটার, 'তবে, তোমার অবাক লাগাটা অমূলক নয়। আমারও লাগছে।'

'কেন?'

'বলতে পারব না…আই কিশোর, ভালকান আর লিসা আলাবামা থেকে আসেনি তো?'

'আসতেও পারে।'

'দূর!' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিতে চাইল মুসা, 'যেখানকার খুশি নম্বর প্লেট হোক, যেখান থেকে খুশি আসুক ওরা, আমাদের কি? আমরা ওই জীপটায় করে শহরে যেতে পারলেই হলো।'

'ওই যে, ভালকান আসছে,' রবিন বলল।

তাড়াহুড়া করে আসছে সে। গায়ে সেই জ্যাকেটটা, যেটা ঠিকমত ফিট হয় না। টেনেটুনে জিপার লাগানোর চেষ্টা করছে। মাথা নিচু করে রেখেছে দমকা বাতাস থেকে বাঁচার জন্যে। গোলাঘরে ঢুকে বুট ঠুকে তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'হুইই! ঠাণ্ডাহ্!'

তার মুখে বিয়ারের গন্ধ পেল কিশোর। লাঞ্চের সময় হয়নি এখনও, এত সকালেই গেলা শুরু করেছে?

থাকগে! আমার কি? মনে মনে নিজেকে ধমক লাগাল কিশোর। এত খুঁটিনাটি দেখার দরকার নেই। একবার যেতে পারলে জীবনে এমুখো হবে না আর।

'ওঠো সবাই।' ড্রাইভারের পাশের দরজা টেনে খুলল ভালকান। 'ঠাসাঠাসি করে বসতে হবে।'

সেটা বরং ভাল। গায়ে গা ঠেকিয়ে বসলে ঠাণ্ডা কম লাগবে। তবে গাদাগাদিটা বেশিই হলো। চারজনের সীটে পাঁচজন, তার ওপর এতগুলো ব্যাগ। সামনে ভালকানের পাশে বসেছে পটার। পেছনের দুটো সীটে ঠেলেঠুলে কোনমতে বসল তিন গোয়েন্দা। কষ্ট হচ্ছে। কিছু বলল না। এখান থেকে যাওয়ার যে একটা উপায় করতে পেরেছে, তাতেই খুশি।

'বোঝা তো নিলাম,' পকেটে চাবি হাতড়াচ্ছে ভালকান, 'যেতে পারলেই হয় এখন। পিছলে গিয়ে যদি খাদে পড়ি, হলুদ বরফ।' বলে হা-হা করে হাসতে শুরু করল। এই হলুদ বরফটা যে কি জিনিস, আর এতে হাসিরই বা

কি আছে, কেউ বুঝতে পারল না। কিন্তু এতই মজা পেল ভালকান, হাসির সঙ্গে সঙ্গে চাপড়ও মারতে লাগল স্টীয়ারিং হুইলে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে, ক্লাচ চেপে নিউট্রালে গিয়ার ফেলল সে। মোচড় দিল চাবিতে।

কিছুই ঘটল না।

আবার মোচড় দিল।

নীরব এঞ্জিন।

'অবাক কাণ্ড!' হাসি চলে গেল ভালকানের।

'নিউট্রালে আছে তো?' পটার বলল।

'শেখাচ্ছ নাকি আমাকে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ভালকানের কণ্ঠ। 'গাড়ি চালাতে জানি না?'

'না না, তা বলছি না···দেখুন আবার চেষ্টা করে।'

চাবিতে মোচড় দিয়ে গ্যাস পেডাল জোরে চেপে ধরল ভালকান।

স্টার্ট নিল না এঞ্জিন। কোন শব্দই করল না। একবার কাশল না পর্যন্ত।

নীরবতা। স্তব্ধ, অস্বস্তিকর নীরবতা।

'গ্যাস পেডালে এত চাপ দিচ্ছেন কেন?' পটার বলল। 'তেল বেশি চলে যাচ্ছে কারবুরেটরে। ফ্লাড করে দিলে স্টার্ট নেবে না।'

'দেখো, আমাকে শেখাতে এসো না!' ধমকে উঠল ভালকান। 'এটা আমার গাড়ি। কতটা চাপ দিলে স্টার্ট হয়, আমার মুখস্থ।'

ধমকে কান দিল না পটার। এঞ্জিন চালু করাটা এখন জরুরী। 'দেখুন গিয়ারশিফট জমে গেল কিনা? বেশি ঠাণ্ডায় হয় ওরকম। কয়েকবার টানাটানি করুন।'

ভুরু কুঁচকে পটারের দিকে তাকাল ভালকান। ভঙ্গি দেখে প্রমাদ গুণল তিন গোয়েন্দা। মেরে না বসে!

মারল ভালকান, তবে পটারকে নয়। জোরে এক থাপ্পড় মারল স্টীয়ারিঙে। পটারের কথামত গিয়ারশিফট আগে-পিছে করল কয়েকবার। চাবিতে মোচড় দিল।

গুঞ্জন তুলে কয়েকবার ফটফট করে চুপ হয়ে গেল এঞ্জিন।

'এই তো হচ্ছে,' উৎসাহের সঙ্গে বলল পটার। 'চালিয়ে যান।'

কিন্তু শত চেষ্টায়ও চালু হলো না এঞ্জিন। রাগে চিৎকার করে গাল দিয়ে উঠল ভালকান, 'শয়তানের বাচ্চা এঞ্জিন! নষ্ট হওয়ার আর সময় পেল না!' এক ধাক্কায় দরজা খুলে লাফিয়ে মাটিতে নামল সে। দড়াম করে লাগিয়ে দিল আবার। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। কি করবে ভাবছে যেন। গোলাঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে চোখ পড়তে খেঁকিয়ে উঠল, 'ওই যে, শুরু হয়েছে আবার!'

'তুষারের বাচ্চার' মা-বাপ তুলে অতি জঘন্য একটা গালি দিয়ে পা ঠুকল মেঝেতে। সামনে এগোল দু পা, এক পা পিছাল। তারপর 'নাহ্, যাওয়া আর গেল না!' বলে গটমট করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল বাড়ির দিকে।

বসে থেকে আর লাভ নেই। হতাশ হয়ে জীপ থেকে নেমে এল তিন গোয়েন্দা।

পটারও নামল। থমথমে চেহারা।

তুষার পড়তে শুরু করেছে আবার। বাতাসের বেগ বাড়ছে। ঝড়ের দেরি নেই।

নয়

শিক দিয়ে খোঁচা মেরে একটা কাঠ ওল্টাল মুসা। লাফিয়ে উঠল আগুন। প্রতিফলিত হলো তার কালো চোখের তারায়। হাত দুটো আগুনের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

কিশোর আর রবিন বসে আছে ফায়ারপ্লেসের সামনে। নাক ডলে দেখল কিশোর। অনুভূতি ফিরতে শুরু করেছে।

পটার নেই। এসেছিল, আবার গোলাঘরে চলে গেছে। অনেক চাপাচাপি করে রাজি করিয়েছে ভালক্মানকে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, জীপের এঞ্জিন স্টার্ট নেয়াতে পারবে সে। মুসাও সাহায্য করতে যেতে চেয়েছিল। নেয়নি ওকে পটার। সে একাই নাকি পারবে

'পটার অনেক দেরি করছে,' ভারি সোয়েটারের হাতা দুটো ভাল করে টেনে দিল রবিন।

'পারেনি আরকি এখনও,' ফায়ারপ্লেসে একটুকরো কাঠ ফেলল মুসা। 'করুক চেষ্টা। নিজেকে অতি বড় মেকানিক ভাবে। অহেতুক গিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে আঙুলগুলোর বারোটা বাজাবে। চালু করেও এখন কোন লাভ নেই। বেরোনো যাবে না।' শিক রেখে বড় জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। 'কি নামা নেমেছে। কমপক্ষে দুতিন ফুট বরফ জমে যাবে আরও।'

'স্নোপ্লাউ তাহলে এলই না!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল কিশোর।

বাইরে ধূসর আলো। রাস্তাটার দিকে তাকাল মুসা। ভালমত দেখা যায় না। 'কই, এলে তো দেখতাম।'

'এ রাস্তায় হয়তো পরে আসবে ওরা,' রবিন বলল। 'আগে হাইওয়ে সাফ করার চেষ্টা করবে।'

'করতেও পারে,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর। একটা কাউচে উঠে বসল। 'কতদিন বেরোতে পারব না কে জানে।'

'না পারলে নেই। এখানেই বসে থাকব। সময়মত যখন বাড়ি যেতে পারলাম না, মা'র সামনে যত দেরিতে যাওয়া ততই ভাল।' কি ভেবে কোণের গান-র‍্যাকটার কাছে চলে গেল মুসা। তরের বন্দুক-পিস্তলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হঠাৎ পিঠ সোজা করে ফেলল কিশোর। 'আই, শহরে যোগাযোগ করার একটা উপায় কিন্তু আছে!'

'কি?' জানতে চাইল রবিন।
ফিরে তাকাল মুসা।
'স্নোমোবাইল!' উত্তেজনায় চকচক করছে কিশোরের চোখ। 'সহজেই শহরে চলে যেতে পারব। বাড়িতে ফোন করব। টো-ট্রাক কোম্পানিতে গিয়ে মুসার গাড়ি তোলার সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসতে পারব...'
'পারবে না,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা ভারি কণ্ঠ।
ফিরে তাকাল কিশোর। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ভালকান। 'বহুদিন চালানো হয় না। পড়ে থেকে থেকে বাতিল হয়ে গেছে।' চুমুক দিল হাতের বিয়ারের ক্যানে।
হতাশ ভঙ্গিতে আবার কাউচে হেলান দিল কিশোর।
'মিস্টার চীফ এঞ্জিনিয়ার কি এখনও জীপটার পেছনে লেগে আছেন নাকি?' পটারকে না দেখে জিজ্ঞেস করল ভালকান।
'মনে তো হয়,' জবাব দিল মুসা, 'আসছে না যখন।'
'আমার ধারণা ফুয়েল লাইন জমে গেছে,' হাসল ভালকান, যেন এটাও রসিকতা। 'একটা লোককে একবার তার গাড়িতে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।' মুখের হাসি চওড়া হলো, ছড়িয়ে পড়ল দাড়ির কিনার আর চোখের কোণে।
ভড়কে গেল কিশোর। আবার শুরু হতে যাচ্ছে ভালকানের খাপছাড়া রোমাঞ্চ গল্প!
'ঠাণ্ডায় জমে মরেছিল লোকটা,' ক্যানের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল ভালকান। 'তক্তার মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। মরা সাদা কেঁচোর মত নীল।' হাসতে শুরু করল আবার। 'বসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল একটা হোঁৎকা বেবুন!'
গল্পটা আচমকা থামিয়ে দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'হুয়া!'
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'ঠিক হয়েছে নাকি?'
'না!' ফাটা বেলুনের মত কিশোরকে চুপসে দিতে পারার আনন্দে খিকখিক করে হাসল ভালকান। 'ঠিক হয়নি, তবে খড়খড় করছে। তারমানে লাইনে কাজ করছে গাধার দল। ঠিক হয়ে যাবে শীঘ্রি।'
ঘড়ি দেখল কিশোর। দুপুর একটা বাজে। অথচ বাইরেটা প্রায় রাতের মত অন্ধকার।
ঘড়াৎ করে ঢেকুর তুলল ভালকান। 'খিদে পেয়েছে?' লম্বা চুমুকে বিয়ার শেষ করে ক্যানটা দুআঙুলে টিপে চ্যাপ্টা করল সে। 'শুধু স্যান্ডউইচ। বানানোর কেউ নেই। যার যারটা বানিয়ে নিতে হবে।'
লিসার কথা মনে পড়ল কিশোরের। রাতের পর একটিবারের জন্যেও আর দেখেনি মহিলাকে। নিচে নামেনি। ভালকানের চোখের দিকে তাকাল সে, 'আপনার স্ত্রীর ঘুম কি এখনও ভাঙেনি?'
জবাব দিল না ভালকান। শোনেইনি যেন। ঘুরে চলে গেল রান্নাঘরের

দিকে।

এগিয়ে এল মুসা। 'আমার খিদে পেয়েছে। চলো, স্যান্ডউইচ বানানো শুরু করে দিই। এখানে এনে আগুনের কাছে বসে খাব।'

'পটারকেও ডাকা দরকার,' রবিন বলল। 'তারও নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

'আগে বানাই, তারপর ডাকব,' রান্নাঘরে রওনা হলো মুসা। পেছনে চলল রবিন।

কিশোর বলল, 'তোমরা যাও, আমি আসছি।'

লিসার কি হয়েছে দেখতে হবে। একটা বাজে। লাঞ্চের সময়। ঘুমালে এতক্ষণে জেগে যাওয়ার কথা।

কাউচ থেকে উঠতেই গান-র‍্যাকটার ওপর চোখ পড়ল। উন্মাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র অনেক বেশি বিপজ্জনক। সাবধান থাকা দরকার—ভাবতে ভাবতে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওঠা শুরু করল। কিন্তু যত সাবধানেই পা ফেলুক, পুরানো কাঠের সিঁড়িতে মচমচ শব্দ হয়েই যাচ্ছে। বাতাসের শব্দের জন্যে দূর থেকে শোনা যাবে না অবশ্য। অন্তত রান্নাঘরে ভালকানের কানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সরু হলওয়ে দিয়ে লিসার বেডরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। বন্ধ। কান পেতে ভেতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল।

রান্নাঘরে মুসা আর রবিনের সঙ্গে কথা বলছে ভালকান। অনুমান করল, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে তার ঠিক নিচেই বোধহয় রান্নাঘরটা।

দরজায় কান ঠেকাল। কোন শব্দ নেই ভেতরে।

আস্তে করে টোকা দিল। একবার। দুবার।

সাড়া নেই।

আরেকটু জোরে টোকা দিল। মনে মনে বলল, লিসা, জবাব দিন! জেগে উঠুন! বলুন কিছু!

পাল্লায় ঠোঁট ঠেকিয়ে নিচু স্বরে ডাকল, 'লিসা?'

জবাব এল না।

'লিসা? আপনি কি জেগে আছেন?'

নিচে রান্নাঘরে ভালকানের অট্টহাসি শোনা গেল। আবার কোন বিদঘুটে গল্প ফেঁদেছে হয়তো।

'লিসা?'

জবাব নেই।

লম্বা দম নিয়ে পিতলের নবটা ধরে মোচড় দিল কিশোর। ঠেলতেই খুলে গেল পাল্লা। ডাকল আবার, 'লিসা?'

বেডরুমের ভেতরটা গরম। পর্দা সরানো। জানালা দিয়ে আবছা আলো আসছে। বিছানায় চিত হয়ে আছে লিসা। মাথাটা বালিশের পাশে পড়ে আছে। নিথর। চোখ দুটো খোলা।

নিজের অজান্তে ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

দশ

চোখ মিটমিট করল লিসা। নড়ে উঠল শরীর। দরজার দিকে চোখ।

চিৎকার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে ওর।

নিজেকে একটা গর্দভ মনে হলো কিশোরের। কিন্তু ওর কি দোষ? যে ভঙ্গিতে পড়ে ছিল মহিলা যে কেউই লাশ ভেবে ভুল করত।

'কি?' ঘুমজড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করল লিসা।

'ঘু-ঘু-ঘুমাচ্ছিলেন?'

'হ্যা।'

'সরি, জাগিয়ে দিলাম! চোখ দুটো খোলা ছিল আপনার...'

'মাঝে মাঝে আমি চোখ মেলেই ঘুমাই,' আড়ষ্টতা কাটছে না মহিলার। খসখসে কণ্ঠস্বর। যেন এখনও বুঝতে পারছে না কোথায় রয়েছে, কি অবস্থা।

ডান চোখের নিচে একটা বড় নীলচে দাগ। ফুলে গেছে। চোখটা পুরো খুলতে পারছে না।

'সরি...' দরজার দিকে এক পা পিছিয়ে গেল কিশোর।

'এখানে এলে কেন মরতে!' ফিসফিস করে বলল লিসা।

'কি বললেন?' ঠিকমত শুনতে পায়নি যেন কিশোর।

'বলছি, এখানে আসা ঠিক হয়নি,' আরেকটু জোরে, আরও স্পষ্ট করে বলল লিসা।

'সরি, এখানে ঢোকাটা সত্যি উচিত হয়নি আমার!' বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

ঠাণ্ডার মধ্যেও কপালে ঘাম ফুটেছে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্বাভাবিক হয়ে এল নিঃশ্বাস। তখনই মাথায় এল চিন্তাটা। 'এখানে আসা ঠিক হয়নি' বলে কি বোঝাতে চেয়েছে লিসা? ওর ঘরে ঢোকা ঠিক হয়নি, নাকি এ বাড়িতে ঢোকা ঠিক হয়নি? এত ভীত দেখাচ্ছিল কেন ওকে?

চিন্তিত ভঙ্গিতে সরে এসে ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর। মনে মনে বলল, 'লিসা, আমরা এখানে আসতে চাইনি। চলেও যাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এমন ফাঁদে পড়েছি, বেরোতে পারছি না কিছুতেই।'

নিচে লিভিং রুমের দিকে তাকাল সে। আলো জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে। রান্নাঘর থেকে স্যান্ডউইচের প্লেট হাতে বেরোল মুসা আর রবিন। নিয়ে গিয়ে রাখল কাউচের ওপর। জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। পালকের মত তুষারকণা বাতাসের ঝাপটায় উড়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে।

বুক ভরে বাতাস টেনে ধীরে ধীরে ছাড়ল কিশোর। কিন্তু কিছুতেই স্বাভাবিক করতে পারল না টানটান হয়ে থাকা স্নায়ু।

নিচে নেমে এল। কানে বাজছে লিসার ঘুমজড়িত কণ্ঠ। রান্নাঘরে রওনা হলো। কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পেছনের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে ভালকান। তুষারপাত দেখছে। শব্দ শুনে ফিরে তাকাল, 'এই যে, কোঁকড়া, এসো। তোমাদের দোস্ত পটার তো এখনও এল না।...বললাম যে ওই এঞ্জিন ঠিক হবে না...এতক্ষণ কি করছে? ঠাণ্ডায় জমে যায়নি তো গাড়িতে দেখা বেবুনটার মত? দেখতে যাব নাকি ভাবছি,' কথা বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে ওর। চোখ টকটকে লাল। অনেক বেশি গিলে ফেলেছে।

ওয়াল ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে। কয়েক সেকেন্ড শোনার পর লাল হয়ে গেল মুখ, রাগ ফুটল চোখের তারায়। 'এখনও হয়নি!' ষাঁড়ের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে গাল দিল টেলিফোন কর্মীদের। হাতের ক্যান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুহাতে চেপে ধরল পুরো যন্ত্রটা। হ্যাঁচকা টানে খসিয়ে আনল দেয়াল থেকে।

কিছু বলল না কিশোর। কি করবে বুঝতে পারল না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে উন্মাদটা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল সে। হাতের জিনিসটা কাউন্টারে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে।

খালি পেটে থেকে লাভ নেই। স্যান্ডউইচ বানাতে শুরু করল কিশোর। মনোযোগ নেই। কিসের মধ্যে যে কি ভরল নিজেও বলতে পারবে না। কোনমতে একটা কিছু বানিয়ে প্লেটে তুলে নিয়ে ফিরে এল লিভিং রুমে, মুসা আর রবিনের কাছে।

এখনও ফেরেনি পটার। কি করছে এতক্ষণ? দুশ্চিন্তা শুরু হলো ওর জন্যেও। চারজনের একসঙ্গে থাকা দরকার। ভয়ঙ্কর কিছু করতে চাইলেও একা এঁটে উঠতে পারবে না খেপাটে মাতাল ভালকান।

লিসার গালের দাগটার কথা ভাবল। রান্নাঘরে হ্যাঁচকা টানে টেলিফোন খসিয়ে আনার দৃশ্যটাও পীড়াদায়ক। এ বাড়িতে আর মোটেও নিরাপদ নয় ওরা। ক্রমেই পাগলামি বাড়ছে ভালকানের। কখন যে কি করে বসে ঠিক নেই।

ফায়ারপ্লেসের সামনে এসে বসতেই রবিন জানতে চাইল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'ওপরে, লিসার ঘরে গিয়েছিলাম,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। দেখে নিল আশেপাশে ভালকান আছে কিনা। লিসা কি করেছে, কি বলেছে জানাল ওদের।

'চোখ মেলে ঘুমায়?' মুসা অবাক।

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য!'

ভালকানের পাগলামির কথা শুনে মুসা আর রবিনও ভয় পেয়ে গেল।

গড়িয়ে চলল বিকেল। কোন কাজ নেই, বসে বসে আগুনকে কাঠ খাওয়ানো ছাড়া। কাঠ ফেললেই দপ করে লাফিয়ে উঠছে কমলা আগুন,

চড়চড় করে কাঠ পুড়ছে, ফোঁসফাঁস শব্দ করছে জীবন্ত প্রাণীর মত।
একসময় ওপরতলা থেকে নেমে এল লিসা। ওদের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ঢুকে গেল রান্নাঘরে।
বাইরে গর্জন করে চলেছে বাতাস। তুষারপাতের বিরাম নেই। জানালায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বাতাসের ঝাপটায় কাত হয়ে যাচ্ছে গাছের মাথা। ডালপালাগুলো তুষারের ভারে নুয়ে পড়েছে।
এক বান্ডিল তাস খুঁজে বের করল মুসা। তিনজনে খেলতে বসে গেল। কিন্তু কেউ মন বসাতে পারল না। এমনকি তিন দান খেলার আগে ধরতেও পারল না যে চারটে তাস কম।
এ খেলার কোন মানে নেই। তাস রেখে দিল ওরা। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। জানালার দিকে চোখ পড়তেই লোকটাকে দেখতে পেল কিশোর। জানালার কাঁচে নাক ঠেকানো। নীল স্কি মাস্কে মুখ ঢাকা। নাক আর চোখ দুটো কেবল দেখা যায়। নিঃশ্বাসের গরম বাতাস ঘোলা করে দিচ্ছে কাঁচ।
সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে চোখ দুটো।

এগারো

স্তব্ধ হয়ে রইল কিশোর। একটা মুহূর্ত। তারপরই উঠে দৌড় দিল।
'লোকটা কে?' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
জানালার কাছে পৌছে গেছে ততক্ষণে কিশোর। নেই লোকটা। কিন্তু ছিল যে তার প্রমাণ রেখে গেছে কাঁচের গায়ে। নিঃশ্বাসের বাষ্প বরফের কণা হয়ে লেগে রয়েছে।
কাঁচে কপাল চেপে ধরে কাত হয়ে বাড়ির ডানে-বাঁয়ে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। কাউকে চোখে পড়ল না।
'চলে গেছে!' আনমনে বিড়বিড় করল সে।
'লোকটা কে?' রবিনের প্রশ্নটা মুসাও করল।
'কি করে বলব?' বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর, 'ওই দেখো, তুষারে পায়ের ছাপ। অতএব ভূত নয়।'
ভাল করে দেখার জন্যে কিশোরকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল মুসা। 'খাইছে! তাই তো!'
'স্কি মাস্কে মুখ ঢেকে রেখেছে কেন?' রবিন বলল, 'ভয়ঙ্কর লাগছিল। হরর মুভির মত।'
'কে লোকটা?' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।
হাত ওল্টাল মুসা, 'আমি কি করে বলব?'
'এই তুষারপাতের মধ্যে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে,' রবিন বলল, 'দরজায় ধাক্কা দিল না কেন?'
'অমন করে উঁকিই বা দিল কেন জানালায়?' মুসার প্রশ্ন। 'দিয়ে আবার

কেউ ভাল করে দেখার আগেই চলে গেল।'

'ব্যাপারটা রহস্যময়!' মন্তব্য করল কিশোর।

'কোন ব্যাপারটা?' ব্যালকনি থেকে চমকে দিল গমগমে কণ্ঠ। ভালকান। তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

'বাইরে কে যেন ঘুরছে,' জানাল কিশোর।

'কে ঘুরছে?'

'জানি না। স্কি মাস্ক দিয়ে মুখ ঢাকা, ডাকাতের মত। জানালা দিয়ে উঁকি মেরেছিল।'

'পটার নাকি?'

'না।'

হেসে উঠল ভালকান। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে বলল, 'মনে হয় তোমরাও আমার মত গিলে বসে আছ?'

'তিনজনেই দেখেছি আমরা। ভুল হতে পারে না।'

ব্যালকনিতে দেখা দিল পটার। একটা সোয়েটার পরছে। বাড়িতে ঢুকতে দেখেনি ওকে তিন গোয়েন্দা। মুখ লাল। ঠাণ্ডার মধ্যে থেকে হয়েছে এমন।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল সে।

'আপনি কখন এলেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অনেকক্ষণ। তুমি তখন রান্নাঘরে। ঠাণ্ডায় এতটাই কাবু হয়ে গিয়েছিলাম, সোজা ঘরে গিয়ে লেপের তলে ঢুকলাম। এত চেঁচামেচি করছ কেন?'

'স্কি মাস্ক পরা কাকে নাকি দেখেছে আমাদের কোঁকড়া,' হেসে বলল ভালকান। 'আমি ভাবছি, তুষারমানব না তো?' হা হা করে হাসতে লাগল সে।

রাগ লাগল কিশোরের। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, 'লোকটাকে সত্যি দেখেছি আমরা!'

'তাহলে দরজা ধাক্কা দিল না কেন?' পটারের প্রশ্ন।

'মানুষ হলে তো ধাক্কা দেবে,' ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিল ভালকান। 'আগুনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এমন হয়। হ্যালুসিনেশন। উল্টোপাল্টা দেখে।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'নাকি ভূত দেখেছ?'

'দেখুন, হাসবেন না,' রেগে উঠল মুসা, 'ভুল আমরা দেখিনি! তিনজনেরই একসঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলতে চান?'

রহস্যময় লোকটার ব্যাপারে আর কোন মন্তব্য করল না ভালকান। পটারের দিকে তাকাল, 'তারপর, চীফ এঞ্জিনিয়ার, এলে যে আমাদের জানালে না কেন? আমি তো সার্চ পার্টি পাঠানোর কথা ভাবছিলাম। জীপটা ঠিক হলো?'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল পটার। মাথা নেড়ে বলল, 'নাহ্। কোনমতেই গোলমালটা ধরতে পারলাম না। ঠাণ্ডার মধ্যে আঙুল গেল অসাড় হয়ে। ধরাই যাচ্ছিল না কিছু ঠিকমত।'

'হুয়া! ফোনটাও ঠিক হচ্ছে না। তাহলে গ্যারেজে ফোন করে মিস্ত্রি ডাকতে পারতাম,' বিড়বিড় করে টেলিফোন কর্মীদের গাল দিল আবার ভালকান। 'রান্নাঘরের সেটটাকে কি করেছি জানো? খসিয়ে রেখে এসেছি। বুঝুক এখন ব্যাটা। শয়তানি করবে নাকি আর!' মাথা পেছনে হেলিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠল সে।

কেউ যোগ দিল না তাতে।

কেঁপে উঠল পটার। ঠাণ্ডায়। চলে গেল আগুনের সামনে। হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বরফ হয়ে গেছে। আঙুলগুলো কোনদিন আর নড়বে বলে মনে হচ্ছে না।'

অবাক হলো কিশোর, 'এতক্ষণ লেপের তলায় শুয়ে থেকেও গরম হলো না?'

পটার জবাব দেয়ার আগেই গলা চড়িয়ে ডাকল ভালকান, 'লিসা, গরম পানি বসাও। কফি লাগবে।'

জানালায় দেখা লোকটার কথা ভুলতে পারছে না মুসা। কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে, বলো তো?'

কথাটা লুফে নিল যেন ভালকান। ইয়ার্কি মারার ভঙ্গিতে বলল, 'জ্যাক ফ্রস্ট এসেছিল। কিংবা সান্তা ক্লজ। এত বরফ দেখে ভেবে বসেছিল এটা উত্তর মেরু।' আবার মাথাটা পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে ছাতের দিকে মুখ তুলে হাসতে লাগল সে।

একে পাগল, তার ওপর নিশ্চয় গলা পর্যন্ত গিলেছে। বেহেড মাতাল। এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। চুপ হয়ে গেল মুসা।

কিন্তু ভালকান থামল না। বলল, 'গায়ে-গতরে তো বেশ জোয়ানই লাগছে তোমাকে, তারের জাল। হয়ে যাক না এক হাত?'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'এককালে কুস্তি লড়া আমার পেশা ছিল,' উঠে দাঁড়াল ভালকান। টিপে দেখতে শুরু করল মুসার হাতের পেশী। 'বাহ্, চমৎকার। লড়বে নাকি?'

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল মুসার, 'এই ঘরের মধ্যে?'

'অসুবিধে কি? বাইরে তো আর এখন যাওয়া যাচ্ছে না।' কাউচের পেছনটা দেখাল ভালকান। 'ওখানে চলো।'

'বেশ, চলুন।'

ভয় পেয়ে গেল কিশোর। ভালকানের ওপর রেগে আছে মুসা। চ্যালেঞ্জটা নিয়ে ফেলেছে। আর ওকে ঠেকানো যাবে না। মরুক-বাঁচুক, একটা ফাইট দেবেই এখন। তবু বাধা দিল কিশোর, 'মুসা, ওসব থাক...'

'কঁক-কঁক করছ কেন ভীতু মুরগী?' কিশোরকে ব্যঙ্গ করল ভালকান। মুসার দিকে ফিরে বাঁকা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি মিয়া, ছানার মত পালকের তলে লুকাবে না মোরগের মত তাকত দেখাবে?' জোরে এক ধাক্কা মারল মুসার বুকে। 'ভয় লাগছে?'

'না, লাগছে না।'

সোফার পেছনে কার্পেটের ওপর একটা কম্বল বিছাল ভালকান। হাত নেড়ে ডাকল মুসাকে, 'এসো, তারের জাল, বেশি ব্যথা দেব না।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল লিসা। 'কি করছ তোমরা?'

'তোমার জানার দরকার নেই। যাও এখান থেকে।'

'হেরি, ও ছেলেমানুষ···তোমার মত বুড়োধাড়ি···'

'চুপ!' অধৈর্য ভঙ্গিতে ধমকে উঠল ভালকান। 'নইলে আবার দেব কয়েক ঘণ্টার জন্যে মুখ বন্ধ করে!' ভালকানের জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে কুঁকড়ে গেল লিসা।

মুসার দিকে তাকাল ভালকান, 'এসো, দেরি করছ কেন? ভয় লাগলে বলো।'

সোয়েটার খুলে রাখল মুসা। নিচে পুলওভার। সেটা পরেই কম্বলের ওপর উঠে এল। 'আসুন।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিরুপায় ভঙ্গি করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল লিসা। কাউচের পাশে কম্বলের কিনারে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন। ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পটার। কঠিন হয়ে গেছে চোয়াল। ভালকানের এসব পাগলামি তারও বোধহয় পছন্দ হচ্ছে না।

'দেখো ভাই, আমি বুড়ো মানুষ,' তরল গলায় বলল ভালকান, 'বেশি পিটিয়ো না আমাকে। চেঁচামেচি করলে ছেড়ে দিয়ো।' দুই হাত তুলে প্রার্থনার ভান করল। তারপর বাড়িয়ে দিল সামনে। কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে দিয়ে সরতে লাগল এপাশ থেকে ওপাশে।

নিচু হয়ে ওর বাঁ পা-টা ধরে হ্যাঁচকা টানে ভালকানকে কম্বলের ওপর ফেলে দিল মুসা। হাত দুটো মুচড়ে এনে পিঠে চেপে ধরল।

ছাড়িয়ে নিল ভালকান। জাপটে ধরল মুসাকে। গড়াগড়ি খেতে লাগল কম্বলের ওপর। নানা রকম অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে দুজনের মুখ থেকে।

চিৎকার করে মুসাকে উৎসাহ দিতে লাগল রবিন। কিশোরের স্নায়ুও ঢিল হয়ে এল ধীরে ধীরে। মারাত্মক কিছু ঘটবে না। শুধুই খেলা।

ভালকানকে চিত করে ফেলে চেপে ধরল মুসা। রেফারির কাজটা নিজেই করল। গুণল, 'এক···দুই···তিন···' ভালকান ওকে সরাতে পারল না।

ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। হেসে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মুরগীর ছানাটা এখন কে?'

কথাটা বলা উচিত হয়নি মুসার। আচমকা হাত বাড়িয়ে ওর পা চেপে ধরল ভালকান। মুখ লাল। কপালে ঘামের বিন্দু। নিঃশ্বাস ভারি। 'পোলাপান বলে ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভাল্লাগেনি! মুরগীর ছানা কে দেখাচ্ছি!' হাসি হাসি ভঙ্গিটা নেই আর।

পটারও লক্ষ করল সেটা। ভয় পেয়ে গেল। আগুনের কাছ থেকে ডেকে বলল, 'ভালকান, দেখুন···'

কিন্তু কানেই তুলল না ভালকান। টান মেরে মুসাকে কম্বলের ওপর ফেলে দিল। গাল দিতে দিতে মুসার কব্জি চেপে মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের

ওপর। চাপ দিতে শুরু করল।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'কে? মুরগীর ছানা এখন কে!' ফোঁস ফোঁস করে বাতাস বেরোচ্ছে ভালকানের দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

খেলা নেই আর এখন ব্যাপারটা। সত্যি সত্যি ব্যথা দিতে চাইছে ভালকান। মুসার পিঠে বসে মাথার পেছনে তালু দিয়ে চেপে ধরে কপাল ঠুকতে শুরু করল কাঠের মেঝেতে। 'কি, বলো? জলদি বলো! মুরগীর ছানা কে?'

'ভালকান! ভাল হচ্ছে না কিন্তু! থামান এসব!' দৌড়ে এল পটার।

বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন। ভালকানকে যে বাধা দেয়া দরকার, সেটাও যেন ভুলে গেছে।

মুসার একটা পা চেপে ধরল ভালকান। বেকায়দা ভঙ্গিতে মোচড় দিতে শুরু করল।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল মুসা। পেশাদার কুস্তিগীরের হাত থেকে পা ছাড়ানো তার কর্ম নয়।

ভালকানের কাঁধ চেপে ধরে তাকে টেনে সরানোর চেষ্টা করল পটার।

এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরে পেল কিশোর। লাফ দিয়ে গিয়ে ভালকানের হাত চেপে ধরল। রবিনও সাহায্য করতে এগোল। তিনজনে মিলে টেনেহিঁচড়ে পাগলটাকে সরাল মুসার ওপর থেকে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে ভালকান। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি।

পা চেপে ধরে গোঙাচ্ছে মুসা। 'উফ্, ভেঙে ফেলেছে...উহুহু! মরে গেছি!'

'তখনই মানা করেছিলাম, লাগতে যেও না পাগলের সঙ্গে!' ভালকান কি ভাববে না ভাববে সেইধার আর ধারল না কিশোর। রেগে গেছে ভীষণ। অনেক সহ্য করা হয়েছে পাগলের পাগলামি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, কিছু করতে এলে এখন সবাই মিলে ধরে তাকে বাঁধবে।

মুসার পায়ের কাছে বসে পড়ল রবিন।

দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল ভালকানের। ভোঁস ভোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। কড়া বিয়ারের গন্ধ এসে লাগল নাকে। ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিল কিশোর।

মুসার দিকে তাকিয়ে ভালকান বলল, 'কি হয়েছে? অমন করছে কেন ছেলেটা?'

অবাক কাণ্ড! কিছুই যেন জানে না সে। ঘোরের মধ্যে করেছে নাকি সব?

টিপেটুপে দেখে মুখ তুলল রবিন, 'ভাঙেনি। গোড়ালিতে মোচড়টা বেশি লেগেছে।'

'উঠুন। চোখেমুখে পানি দিন,' ভালকানকে সরিয়ে নিতে চাইল পটার। এখন এখানে ওর বসে থাকাটা নিরাপদ না। 'কফি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'হুয়া, কফি, অ্যাঁ? ঠিক বলেছ। বুদ্ধি আছে তোমার।' শব্দ করে হেসে উঠল ভালকান।

ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গেল ওকে পটার। দরজার ওপাশে ঠেলে দিয়ে ফিরে এল। চোখে উদ্বেগ।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে মুসা। মচকে যাওয়া গোড়ালিতে চাপ লাগতে উফ্ করে উঠল।

ওদের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'জলদি চলো। কথা আছে।'

বারো

পাঁচ মিনিটের মধ্যে চিলেকোঠায় জমায়েত হলো সবাই। কিশোর, মুসা আর রবিন বসল খাটে। জানালার কাছে পায়চারি করতে লাগল পটার।

ছয়টা বেজেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে মধ্যরাত। অন্ধকারও সেরকম। ঝোড়ো হাওয়া প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে কাঁপিয়ে দিল জানালার কাঁচ। কয়েক সেকেন্ড মিটমিট করল বাতিটা, কিন্তু নিভল না।

কিছুতেই অস্বস্তি যাচ্ছে না কিশোরের। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়ে আছে। ধরতে পারছে না। হাত দুটো বরফের মত শীতল। গরম করার জন্যে কম্বলের নিচে ঢুকিয়ে দিল।

পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মুসা বলল, 'ইচ্ছে করে আমাকে ব্যথা দিয়েছে!'

'জানি! ও একটা উন্মাদ!' পটার বলল। 'মাথা বিগড়ানো লোক। কি করেছে ও নিজেই জানে না।'

'জানে!' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'পরে না জানার ভান শুরু করেছিল। ওটা স্রেফ অভিনয়। আমার কথায় চটে গিয়ে ইচ্ছে করে ব্যথা দিয়েছে।'

'যাই করুক না কেন, বিপজ্জনক লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেরতে হবে আমাদের···এখুনি!'

'চলে যাব?' জানালার বাইরে তাকাল রবিন।

'হ্যাঁ। আর কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু, পটার,' পা দুটো সোজা করে দিল কিশোর, 'বাইরের অবস্থা দেখছেন? কি ভয়ানক অন্ধকার?'

'অন্ধকারকে কেয়ার করি না। তুষার পড়া থেমে গেছে। শোনো, বেশিদূর যেতে হবে না আমাদের। পাশের শহরটা খুঁজে বের করতে পারব। না পারলে রাত কাটানোর জন্যে আরেকটা বাড়ি খুঁজে নেব। যা-ই করি না কেন, এখানে আর একটা মুহূর্তও নয়।'

'এত তাড়াহুড়ো কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'ভালকান পাগলামি করলেও আমাদের কোন ক্ষতি এখনও করেনি। মুসার সঙ্গে খেলতে গিয়ে ইচ্ছে করে একবার হেরেছে। পরে মুসা ওকে না ঘাঁটালে···'

রবিনের কথায় সুর মেলাল মুসা, 'এত তাড়াহুড়ার কারণটা কিন্তু আমিও বুঝতে পারছি না।' পা ডলছে এখনও। 'ভালকান পাগল, বুঝলাম, কিন্তু আমাদের তো কোন অসুবিধে করছে না। ওর পাগলামি আমরা দেখতে যাই কেন? খেতে পাচ্ছি, ঘুমানোর জায়গা পেয়েছি...'

ঠোঁটে আঙুল রেখে আস্তে কথা বলতে ইশারা করল পটার। ফিসফিস করে বলল, 'তা পাচ্ছি, কিন্তু পাগলকে বিশ্বাস নেই। ক্ষতি এখনও তেমন করেনি, কিন্তু করতে কতক্ষণ?' দরজার কাছে গিয়ে দেখে এল ছিটকানি লাগানো কিনা। 'কেন পালাতে চাইছি, আসল কথাটা বলি। ও একটা খুনী।'

'খাইছে!' পা ডলা বন্ধ করে দিল মুসা।

'কি বলছেন?' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'আস্তে!' হাত তুলল পটার।

'আপনি কি করে জানলেন?' শান্ত থাকার চেষ্টা করছে কিশোর, পারছে না। কম্বলের নিচে অনেকটা গরম হয়েছে হাত দুটো। কিন্তু শীত যাচ্ছে না শরীর থেকে।

'লিসার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করছিল,' প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল পটার। 'গোলাঘর থেকে ফিরে যে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে আছি আমি, জানত না।'

'কি বলছিল?'

'লিসাকে ধমকাচ্ছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল লিসা। ধমক দিয়ে তাকে থামানোর চেষ্টা করছিল ভালকান।'

পিঠ সোজা হয়ে গেছে কিশোরের, 'বারবিকে খুন করেনি তো?'

'বুঝতে পারিনি,' মাথা নাড়ল পটার। 'কারও নাম বলেনি সে। আমাদের কথাও কি যেন বলাবলি করছিল। বার বার মানা করছিল লিসা, কাজটা যাতে না করে। খুন শব্দটা কয়েকবার কানে এসেছে আমার।'

'আমাদের খুন করার কথা বলেছে নাকি?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার।

'করতেও পারে। পাগল তো।'

'কিন্তু কেন করবে? আমরা কি করেছি?'

'জানি না। ও খুনে-পাগলও হতে পারে। খুন করা ওর নেশা। মানুষ মারতে ভাল লাগে। খেয়াল করোনি, মরা মানুষের গল্প বলার সময় কি রকম চকচক করছিল ওর চোখ? এখন বুঝতে পারছি, এই খুনোখুনি নিয়েই গতরাতেও ঝগড়া করেছে দুজনে। কোন একটা ব্যাপারে লিসাকে রাজি করানোর চেষ্টা করেছে। না পেরে খেপে গিয়ে ঘুসি মেরেছে।'

'আজ বিকেলেও কথা কাটাকাটি করেছে দুজনে?' পটারের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।

'হ্যাঁ। কিন্তু তার কথায় লিসাকে রাজি করাতে পারেনি। আজও হয়তো মারত। ঠিক ওই সময় নীল স্কি মাস্ক পরা লোকটাকে দেখে চিৎকার শুরু করলে তোমরা। বেরিয়ে গেল ভালকান। আমিও বেরোলাম।'

'কে হতে পারে লোকটা?' প্রশ্ন করল মুসা।
'আমাদের কথা হেসে উড়িয়ে দেয়ার ভানই বা করল কেন ভালকান?' কিশোরের প্রশ্ন।
'ওই লোকটাও আছে হয়তো এই খুনোখুনির মধ্যে, ভালকানের দোসর,' জবাব দিল পটার। 'সেজন্যেই বলছি, ঝামেলায় জড়ানোর আগেই পালাতে হবে আমাদের। ভুলে যেয়ো না, অনেকগুলো বন্দুক আছে ভালকানের কাছে। আমাদের খুন করতে চাইলে সহজেই করে ফেলতে পারবে...'
খচমচ করে একটা শব্দ হলো। চমকে গেল সবাই।
'কিসের শব্দ?' আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন।
'ছাত থেকে বরফ খসে পড়ছে,' হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে মুসার। 'যাই বলো, এখানে থাকতে এখন আর সাহস পাচ্ছি না আমি!'
'দাঁড়াও, একটা জিনিস এনে দেখাই। সহজে ভয় পেয়েছি আমি ভেব না,' বলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল পটার। পায়ের শব্দে বোঝা গেল হলঘরের দিকে যাচ্ছে। ফিরে এল আধমিনিটের মধ্যে। হাতে প্লেক্সিগ্লাস ফ্রেমে লাগানো দুটো ফটোগ্রাফ। একজন পুরুষ আর একজন মহিলার এনলার্জ করা ছবি। দুজনেরই বয়েস তিরিশের কোঠায়। মহিলার কালো চুল, ছোটখাট, সাদামাঠা চেহারা। লোকটা লম্বা, হাসি হাসি মুখ, কোঁকড়া কালো ঘন চুল। 'আমার ঘরে ড্রেসারের নিচের ড্রয়ারে পেয়েছি।'
'এরা কে?' জানতে চাইল রবিন।
'আমারও সেটাই প্রশ্ন,' ড্রেসারের ওপর ছবি দুটো নামিয়ে রাখল পটার। 'কারা এরা? ছবিগুলো শূন্য ড্রেসারের নিচের ড্রয়ারে রেখে একেবারে শেষ মাথায় ঠেলে দেয়া হলো কেন? নিশ্চয় লুকানোর জন্যে। যাতে কারও চোখে না পড়ে।'
'কিন্তু ঠিকই পড়ে গেল,' রহস্য পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। 'আপনার কি মনে হয়?'
'অদ্ভুত কিছু ঘটছে এ বাড়িতে,' দরজার দিকে চোখ চলে গেল পটারের। কেউ আড়ি পেতে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। 'নিচের লিভিং রুমে ম্যানটেলের ওপর এই ছবিগুলো রাখা ছিল।'
'কি করে বুঝলেন?'
'ধুলো নেই দেখে। অনেক দিন ধুলো পরিষ্কার করা হয়নি বাড়িটার। সবখানে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ম্যানটেলের ওপরে নেই। দেখেছি আমি। নিশ্চয় ছবিগুলো সরিয়ে ফেলার সময় মুছেছে, কিংবা হাতের ডলা লেগে মুছে গেছে।'
'কে সরিয়েছে?' রবিনের প্রশ্ন। 'আপনার কি ধারণা...'
'ভালকান সরিয়েছে। নিয়ে গিয়ে লুকিয়েছে ড্রেসারের ড্রয়ারে।'
'দেখি?' হাত বাড়াল কিশোর। লোকটার ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার চেনা কারও সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে!'
'কারা এরা?' গলা কাঁপছে রবিনের।

'জানি না,' মাথা নাড়ল পটার। 'একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার। বাড়িটা ভালকানের নয়। ম্যানটেলের ওপর ছবি রাখা ছিল। তারমানে ছবির এই লোকটাই বাড়ির মালিক হতে পারে।'

'ঠিক বলেছেন!' মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর, 'চায়ের ব্যাগ খুঁজে না পাওয়ার কারণটা বোঝা গেল এতক্ষণে!'

'মানে?' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

'কাল রাতে চা খেতে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে, মনে আছে? আমি ঢুকে লিসার কাছে চা চেয়েছিলাম। সমস্ত আলমারি খুঁজে খুঁজে তারপর চায়ের পাতা বের করল।'

'পাবে কি করে?' গলার জোর বেড়ে গেল পটারের, 'নিজের ঘর হলে তো।'

'সদর দরজার পাশে হুকে ঝোলানো জ্যাকেটটাও ভালকানের গায়ে ফিট করেনি,' আনমনে বলল কিশোর, 'অনেকটাই ছোট। গায়ে দিতে রীতিমত জোরাজুরি করতে হচ্ছিল ওকে।'

'ওর জ্যাকেট না ওটা?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছে মুসা।

'না,' জবাব দিল পটার। 'জিপারে টিকেট আটকে গিয়েছিল, সেটাও দেখেছি। ও বলল, বহু বছর নাকি স্কিয়িং করতে যায় না। তাহলে টিকেট এল কোথা থেকে?'

'ও, আপনিও খেয়াল করেছেন ব্যাপারটা!' কিশোর বলল।

মাথা ঝাঁকাল পটার।

'আমার কিন্তু সত্যি ভয় লাগছে এখন,' জোরে বলতে গিয়েও কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল রবিন।

'আমারও,' মুসা বলল। 'কোন কারণে এ বাড়ির আসল মালিক আর তার স্ত্রীকে খুন করেছে ভালকান। এমন হতে পারে, বাড়িটার লোভেই খুন করেছে সে। ওদেরকে সরিয়ে দিয়ে নিজে মালিক হয়ে বসেছে। লিসা সেটা মেনে নিতে পারছে না বলেই তার সঙ্গে ঝগড়া করছে।'

'অসম্ভব না,' জানালার দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল পটার।

'সরে পড়াই উচিত আমাদের,' গোড়ালির কথা ভুলে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে আঁউ করে উঠল মুসা। 'কে যায় অহেতুক ঝামেলায় জড়াতে! গিয়ে পুলিশকে খবর দেব।'

'তা নাহয় দিলাম,' হাত দুটো আড়াআড়ি বুকে চেপে ধরেছে রবিন। 'কিন্তু যাব কি করে?'

'ব্যবস্থা করে রেখেছি,' রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে পড়ল পটারের মুখে। প্যান্টের পকেট থেকে একটা চাবি টেনে বের করল। 'জীপের।'

'জীপ!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'আস্তে!'

'জীপটা নাকি মেরামত হয়নি?' ভুরু নাচাল মুসা।

হাসিটা বাড়ল পটারের, 'মিথ্যে কথা বলেছি।'

'তাই!'

'আমি কোন এঞ্জিনে হাত দেব আর সেটা ঠিক হবে না, এমন ঘটনা ঘটেনি কখনও। ঠিক করে তারপর বেরিয়েছি গোলাঘর থেকে। ফুয়েল লাইন চেক করতে গিয়ে দেখলাম ময়লা। বের করে দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। গোলাঘর থেকে ফিরে তখন ভালকানের সঙ্গে দেখা হলে বলে দিতাম। ভাগ্যিস দেখা হয়নি! ঘরে গিয়ে ওর কথা শুনে ফেলার পর ঠিক করলাম, বলব না। ওই জীপে করেই পালাতে হবে আমাদের। তাই চাবিটাও ফেরত দিলাম না আর।'

'খুব ভাল করেছেন।'

'অত খুশি হয়ো না,' গম্ভীর হয়ে গেল আবার পটার। 'বেরিয়ে এখনও যেতে পারিনি আমরা। ভালকানের চোখে ফাঁকি দিয়ে ঘর থেকে বেরোনোটাই হবে সবচেয়ে কঠিন কাজ।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'আমাদের দল বেঁধে বেরোতে দেখলেই…'

'সন্দেহ করে বসবে। ধরা পড়ে গেলে কি করবে কে জানে!' আঙুল চালিয়ে চুলের মাথা পেছনে ঠেলে দিল পটার। অস্বস্তি বোধ করছে। 'সারাটা দিন মদ খেয়েছে। মাতাল অবস্থায় ও যে কি ভয়ঙ্কর, খানিক আগে তো নিজেই টের পেলে।'

'আরেকটু হলেই পা-টা ভেঙে দিয়েছিল আমার!' আবার হাঁটু ডলতে শুরু করল মুসা।

'কি করবে ধরতে পারলে?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'এতগুলো লোককে তো খুন করে ফেলতে পারবে না…'

শ্‌শ্‌শ্‌! ঠোঁটে আঙুল রাখল পটার। চুপ থাকতে ইশারা করল সবাইকে।

যে যেখানে ছিল, স্থির হয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কে? ভালকান, না লিসা?

ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেল হালকা পায়ের শব্দ। লিসার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

'ওরা ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব নাকি?' সবার মতামত চাইল পটার।

'এখনও বেরোনো যায়,' মুসা বলল। 'ওই লোকটার সঙ্গে আরেকবার ডিনারে বসতে রুচি হচ্ছে না আমার।'

'আমারও না,' ভীত দেখাচ্ছে রবিনকে।

'এখন পারব না,' পটার বলল। 'নিশ্চয় হলঘরে বসে আছে ভালকান।'

পটারের এই পালানোর পরিকল্পনাটা পছন্দ হচ্ছে না কিশোরের। কিন্তু অন্য দুজনের আগ্রহ দেখে চুপ করে রইল।

তেরো

দল বেঁধে রাতের খাবার খেতে নামল ওরা। উত্তেজনায় টানটান স্নায়ু। ভালকানের দিকে ঠিকমত তাকাতে পারছে না আর এখন। ওদের এই পরিবর্ত সে-ও লক্ষ করেছে। সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে অভিযোগ করতে থাকল ফোন খারাপ হওয়া আর তুষারপাত নিয়ে। ক্যানের পর ক্যান বিয়ার গিলে চলেছে।

দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে সে, ভাবল কিশোর।

কিন্তু ওর ধারণা ভুল। কোনমতে খেয়ে এসে ব্যাগ রেডি করে বসে রইল ওরা। কিন্তু ভালকানের ওঠার নাম নেই। মাঝরাতের আগে ওপরতলায় উঠল না সে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘর থেকে বেরোল ওরা।

আগে আগে সিঁড়ির দিকে রওনা দিল পটার।

'দেখে ফেললে কি বলব?' জেনে নিতে চাইল রবিন।

'বলব হাওয়া খেতে যাচ্ছি,' বলে দিল মুসা।

'খেয়ে আর কাজ পেল না। ব্যাগট্যাগ নিয়ে এই ঠাণ্ডার মধ্যে হাওয়া…বিশ্বাস করবে ভেবেছ?'

'যখন দেখে তখন দেখা যাবে,' পটার বলল। 'ওসব নিয়ে এত ভাবতে গেলে বেরোনোই হবে না।'

এ ভাবে চোরের মত পালানোটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না কিশোর। পটারের চাপাচাপিতে রাজি হয়েছে। রাজি না হলে, আর সত্যি সত্যি ভালকান কিছু করে বসলে তখন ওকে দোষ দিতে থাকবে সবাই। পটার এত ভয় পাচ্ছে কেন, সেটাও মাথায় ঢুকছে না ওর। ভালকান যদি সত্যি সত্যি খুন করে থাকে, সেটা তদন্তের ভার নেবে পুলিশ। ওদের কি? পটারের এত ভয় কেন?

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'আরে, আমাদের জ্যাকেটগুলো!'

'তাই তো!' চিন্তিত ভঙ্গিতে পটার বলল, 'জ্যাকেট না নিয়ে যাওয়া যাবে না। যা ঠাণ্ডা!'

'সামনে দিয়েই বেরোবেন নাকি?' জানতে চাইল রবিন।

'না, রান্নাঘরের দরজা দিয়ে।'

জ্যাকেট আনতে গেলে কোন কারণে যদি ভালকান এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ায় এখন, দেখে ফেলবে। কিন্তু উপায় নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে নামতে লাগল মুসা। পেছনে পটার, তারপর রবিন, সবার পেছনে কিশোর।

শত চেষ্টা করেও নিঃশব্দে নামা সম্ভব হলো না। পায়ের চাপে মচমচ

করে উঠছে কাঠের সিঁড়ি। ভালকান জেগে থাকলে তার কানে যাবেই এই শব্দ।

পটারের নির্দেশে দাঁড়িয়ে গেল সবাই। ফিরে তাকাল সে। গলা লম্বা করে দেখল ভালকান আর লিসার বেডরুমের দরজাটা খুলল কিনা। কোথাও আলো নেই কেবল চিলেকোঠার বেডল্যাম্পটা ছাড়া। বেরোনোর সময় নিভাতে ভুলে গেছে ওরা। দরজাটাও খোলা। তবে আলো জ্বলে থাকায় এক হিসেবে ভালই হয়েছে। ভালকান ভাববে ওরা কিশোরের ঘরে আড্ডা দিচ্ছে।

আবছা অন্ধকারে কোথাও কোন ছায়া নড়তে দেখল না পটার। ভালকান বেরোয়নি ঘর থেকে।

দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। আবার নামতে শুরু করল ওরা। শব্দ হচ্ছে। দম বন্ধ করে রেখেছে। ভালকান পাগল না হলে এতটা ভয় পেত না মুসা আর রবিন। ওদের পালাতে দেখলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যে কি করে বসবে, কোন ঠিকঠিকানা নেই। গুলি করে বসাটা বিচিত্র নয়। ভয়টা বেশি সেকারণেই।

সিঁড়ির নিচে নামল সবাই। জ্যাকেট আনতে যেতে হবে। আলমারি খুলে জ্যাকেটগুলো বের করে নিয়ে, ফিরে এসে রান্নাঘরে ঢুকে, পেছনের দরজা খুলে তারপর বেরোতে হবে আঙিনায়। সব করতে হবে নিঃশব্দে। ভালকানের ঘুম না ভাঙিয়ে।

অন্ধকার হল ধরে এগিয়ে গেল ওরা। বড় জানালাটার দিকে তাকাল কিশোর। বাইরে শুধুই অন্ধকার। কিছু চোখে পড়ে না। ফায়ারপ্লেসে চড়চড় করে পুড়ছে কাঠ। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে কমলা আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘরের এই উষ্ণতা ছেড়ে রাত দুপুরে কোন কারণ ছাড়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে বেরোতে সায় দিচ্ছে না ওর মন।

নিচু টেবিলে রাখা ফোনটার পাশে ছোট একটা টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। অল্প পাওয়ারের বাল্বের সামান্য আলো তেরছাভাবে পড়েছে টেবিলে। শেডের জন্যে ছড়াতে পারছে না।

পা বাড়াল সেদিকে কিশোর। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল।

নাহ্, ডায়াল টোন নেই। খড়খড় করছে।

নিরাশ হয়ে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

আলমারি খুলল রবিন। নিজের জ্যাকেটটা বের করে নিয়ে বলল, 'পিছিয়ে রান্নাঘরে যাওয়ার ঝামেলা করে দরকার কি? এদিক দিয়েই বেরিয়ে যাই।'

কিশোর বের করে নিল তারটা। সকালে স্নোবল খেলার সময় ভিজেছিল। পুরোপুরি শুকায়নি এখনও।

'তা যাওয়া যায়,' রবিনের কথার জবাবে বলল পটার। 'পুরো বাড়ি ঘুরে যেতে হবে আরকি। তুষার মাড়ানো খুব কষ্ট।' নিজের উলের ক্যাপটা বের করে মাথার ওপর টেনে দিল সে।

'হোক কষ্ট। রান্নাঘর দিয়ে গিয়ে ভালকানের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে ভাল।' জ্যাকেটের জিপার টেনে দিল মুসা।

ব্যালকনির দিকে তাকাল কিশোর। অহেতুক ভয় পাচ্ছে ওরা। ও নিশ্চিত, ভালকান বেরোবে না। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে এটা কল্পনাও করতে পারবে না সে।

দরজার নব ধরে মোচড় দিয়েই কি ভেবে থেমে গেল পটার।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আচ্ছা, পিস্তলটা সঙ্গে নিলে কেমন হয়? ভালকান তাড়া করলে ভয় দেখাতে পারব।'

পরামর্শটা ভাল লাগল না কিশোরের, 'ভয় কি সে পাবে? বরং আমাদের হাতে পিস্তল দেখে রেগেমেগে গুলি করে বসতে পারে।'

'পাবে, পাবে। গুলি আর লাঠিকে পাগলেও ভয় পায়।'

'তাহলে একটা লাঠিই নিই না বরং...' হেসে বলল মুসা।

রেগে গেল পটার। 'রসিকতার সময় নয় এটা! ঠিক আছে, তুমি ভয় পেলে আমিই বরং নিয়ে আসি...'

'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান,' ওকে থামিয়ে দিল মুসা। 'পিস্তল নিতে ভয় পাব? কত গুলি করলাম।'

সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে গেল মুসা। গোড়ালির ব্যথাটা যেন টেরই পাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর কাঁধ চেপে ধরল কিশোর, 'নিয়ো না। পিস্তল লাগবে না আমাদের।'

'লাগবে। ভালকান একটা উন্মাদ। রেগে গিয়ে কি করে বসে কোন ঠিক নেই। আমার পা-টা যে ভেঙে দিতে চেয়েছিল ভুলে গেছ?' কিশোরের হাত সরিয়ে দ্রুত গান-র‍্যাকের কাছে চলে গেল মুসা। কাঁচের দরজা খুলে পিস্তলটা বের করে নিল।

ব্যালকনির দিকে তাকাল পটার। ভালকানের দেখা নেই। মুসা কাছে আসতে বলল, 'নিয়েছ? চলো। জীপে উঠলে আমার কাছে দিয়ে দিয়ো।'

'লাগবে না,' মুসা বলল। 'রাখতে ভয় পাচ্ছি না আমি।' পিস্তলটা পকেটে ভরল সে।

আস্তে করে দরজাটা খুলে ফেলল পটার। বাইরে পা রাখল।

ভয়াবহ ঠাণ্ডা যেন প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। দিনে যখন স্নোবল খেলতে বেরিয়েছিল তারচেয়ে কম করে হলেও বিশ ডিগ্রী নেমে গেছে তাপমাত্রা। বাতাস স্তব্ধ। নাক থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে জমে যাচ্ছে নিঃশ্বাস।

একসারিতে গোলাঘরের দিকে এগোল ওরা। সবার পিছে রইল কিশোর।

জমে শক্ত হয়ে গেছে মাটিতে পড়ে থাকা তুষারের ওপরটা। বুটের চাপে মচমচ করে ভাঙছে। নিঃশব্দে হাঁটা সম্ভব নয়। কান না দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত এগোল ওরা।

ঠাণ্ডার সুচ হুল ফোটাচ্ছে গালে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। কিশোরের মনে হলো বাঁকাচোরা কালো কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখছে রাতের পৃথিবীকে। সব কিছু যেন দুমড়ানো, মোচড়ানো, অস্বাভাবিক। সব কিছুই বরফ।

ব্যাগে টর্চ আছে। জ্বাললে ভাল করে দেখতে পারত কোনদিকে যাচ্ছে। কিন্তু আলো চোখে পড়লে জানালা দিয়ে উঁকি দিতে পারে ভালকান। দেখে ফেলবে ওদের।

ভেবেচিন্তে টর্চ না জ্বালারই সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। বেরিয়েই যখন পড়েছে, এখানে আর গোলমাল না করে শহরে পৌঁছে আগে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কি রহস্য আছে বাড়িটার, না জেনে স্বস্তি পাবে না সে।

এগিয়ে চলল দলটা। কারও মুখে কথা নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কথাও যেন জমাট বেঁধে গেছে।

গোলাঘর থেকে কয়েক গজ দূরে থাকতে মুখ ফিরিয়ে বাড়ির দিকে তাকাল কিশোর। ওপরতলার একটা জানালায় আবছা হলদে আলো। পর্দা টানা। আলোটা নিশ্চয় শেডের নিচে। ভালকান আর লিসার বেডরূমে কিনা, বুঝতে পারল না।

দরজার কাছে পৌঁছে গেল মুসা আর পটার। বরফে আটকে যাওয়া পাল্লা খোলার জন্যে টানাটানি শুরু করল।

'নিচের দিকে বরফ জমেছে,' মুসা বলল।

'জমুক। থেমো না।'

বাড়ির পাশ ঘুরে এসে ঝাপটা মেরে গেল একঝলক বাতাস। যেন রসিকতা করল ওদের সঙ্গে। লেগে থাকা দরজাটাকে আরও শক্ত করে চেপে দিয়ে গেল।

টানাটানিতে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আবার আটকে গেল পাল্লা। ফাঁক হয়ে থাকা কিনারটা চেপে ধরে গায়ের জোরে টানতে শুরু করল দুজনে।

নড়ে উঠল পাল্লা। কিছুটা ফাঁক হয়ে আবার আটকে গেল।

দরজার নিচে জমে থাকা তুষার লাথি মেরে সরাল মুসা। আবার দুজনে টান দিল পাল্লায়। বাঁকা হয়ে গেছে শরীর।

অবশেষে অনেকটাই খুলে গেল দরজা। জীপ বের করার জন্যে যথেষ্ট।

হাঁপাতে লাগল দুজনে। বরফ হয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাস। কালো আকাশের পটভূমিতে ধূসর ধোঁয়ার মত লাগছে দেখতে।

গোলাঘরে ঢুকল সবাই।

মানুষ দেখে হুটোপুটি করে ছুটে পালাল ইঁদুর। বাইরের তুলনায় ভেতরে আরও অন্ধকার। কিন্তু আলো জ্বালতে সাহস করল না ওরা।

'জীপটার দিকে এগোও,' পটার বলল।

ভালমত দেখা যায় না ওটা। কালো আবছা একটা স্তূপের মত লাগছে।

দুই পা-ও এগোয়নি, দড়াম করে লেগে গেল দরজাটা।

'খাইছে!' বলে চিৎকার করে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা।

বাইরে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।

কাঁপা গলায় রবিন বলল, 'বাতাসে বন্ধ করেছে!'

'দূর! যন্ত্রণা!' বিরক্ত কণ্ঠে বলে দরজাটা আবার খুলতে চলল মুসা। সঙ্গে গেল পটার।

ভেতর থেকে ঠেলা দিতে সুবিধে। খুলতে ততটা কষ্ট হলো না।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিশোরের। অবশ। হাড়ে ঠাণ্ডা ঢোকা কাকে বলে অনুভব করল হাড়ে হাড়ে।

'আলোটা জ্বেলে দেয়া উচিত,' আবার বলল রবিন।

'লাগবে না,' অন্ধকারে জবাব দিল পটার। 'গাড়িটা কোথায় জানা আছে আমার। অন্ধকারে স্টার্ট দেয়া কোন ব্যাপারই না।'

কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ ছিল বাতাস। আবার শুরু হয়েছে। সোঁ সোঁ করে ঢুকছে খোলা দরজা দিয়ে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জীপের দিকে এগোল ওরা। শক্ত মাটিতে বুটের শব্দ। মাথার ওপর ফড়ফড় করে উঠল কি যেন।

'বাদুড়!' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা।

এত উত্তেজনার মধ্যেও রসিকতা করতে ছাড়ল না রবিন, 'ভ্যাম্পায়ার যে বলোনি, সেটাই ভাগ্য!'

'চুপ করো! কি সব অলক্ষুণে কথা!'

অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

চমকে গেল মুসা, 'কি হলো!' গলা কাঁপছে। বাদুড়টা রীতিমত ভড়কে দিয়েছে ওকে।

'মানুষ!'

অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে সবার। থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পেল আবছামত। হাতে লম্বা একটা জিনিস। নিশ্চয় রাইফেল।

'ভালকান!' চিৎকার করে বলল পটার, 'মুসা, পিস্তলটা দাও!'

পকেটে হাত ঢোকাল মুসা।

চোদ্দ

গুলি ফোটার প্রচণ্ড শব্দে লাফিয়ে উঠল কিশোর। ছাউনির ছাত আর কড়িবরগায় দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি তুলল শব্দটা। কাকে গুলি করল ভালকান?

একপাশে টলে পড়ে যাচ্ছে মূর্তিটা। টুঁ শব্দ করল না। পড়ে গিয়ে এত জোরে শব্দ হলো, যেন শক্ত বিশাল এক পাথরের চাঙড় আছড়ে পড়েছে।

অন্ধকারে শোনা গেল মুসার আতঙ্কিত কণ্ঠ, 'পিটার! অ্যাই পিটার! কোথায় আপনি?'

ফিরে তাকিয়ে মুসার হাতে উদ্যত পিস্তল দেখে মাথায় ঢুকল কিশোরের, ভালকান নয়, মুসা গুলি করেছে। সব কিছু যেন বড় বেশি ধীরে ঘটছে, সিনেমার স্লো মোশন অ্যাকশন দৃশ্যের মত। আসলে ঘটছে সব স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু মনে হচ্ছে ধীরে।

এদিক ওদিক তাকাল মুসা। পটার নেই ওর পাশে।

সুইচ টিপে দিল কেউ। মাথার ওপরে ফ্লোরেসেন্ট লাইটটা পিট পিটে

করতে লাগল। লাল হয়ে থাকল প্রথমে, তারপর নীলচে হলো। ছড়িয়ে দিল উজ্জ্বল আলো।

ঘুরে তাকাল কিশোর। সুইচ বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পটার।

'পটার···!' পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। 'আমি···আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না! গুলি বেরোল কিভাবে? ধরলেন না···'

রবিন চুপ। তাকিয়ে আছে মুসার দিকে।

দৌড়ে এল পটার। নাকের সামনে ক্রমাগত বরফকণার ধোঁয়াটে মেঘ তৈরি হচ্ছে।

পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'ট্রিগার টিপেছি বলে তো মনে পড়ে না। আপনার হাতে দিচ্ছিলাম···'

'তখনই কোনভাবে ট্রিগারে চাপ লেগে গেছে হয়তো।' মেঝেতে পড়ে থাকা দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল পটার। 'ভালকান···' বলেই যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

তিন গোয়েন্দাও তাকাল মানুষটার দিকে।

ভালকান নয়।

হাত থেকে দস্তানা খুলে নিল পটার। লোকটার নাকের কাছে ধরে বোঝার চেষ্টা করল নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। গলার কাছে নাড়ি টিপে দেখল। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'নেই!'

পনেরো

নিথর হয়ে আছে লাশটা। চোখ বরগার দিকে। ডান হাতের কাছে পড়ে আছে একটা তক্তা। গোলাঘরে ওদের ঢোকার শব্দ শুনে আত্মরক্ষার জন্যে তুলে নিয়েছিল হয়তো।

পাতলা একটা নীল রঙের উলের কোট গায়ে। হ্যাট নেই। দস্তানা নেই। মুখটা সরু। ঘন কোঁকড়া কালো চুল। সঠিক বয়েস অনুমান করা কঠিন, তবে তিরিশের কোঠায়।

মুসার দিকে তাকাল পটার, 'তোমার কাছে পিস্তল রাখতে দেয়াটাই ভুল হয়ে গেছে আমার।'

আতঙ্কে নিচের চোয়াল ঝুলে পড়েছে মুসার। অন্ধকারে একটা মানুষকে খুন করেছে সে। চোখ বড় বড় করে আবার তাকাল পিস্তলটার দিকে। কিছু বলার জন্যে ফাঁক হলো ঠোঁট। শব্দ বেরোল না।

লাশের কোটে বুকের কাছে একটা ছোট গোল ফুটো। চারপাশ ঘিরে যেন আগুনে ঝলসে গেছে। বাদামী দাগ হয়ে আছে। বারুদের তীব্র গন্ধ।

কোটের বোতাম খুলল পটার। নিচে শার্ট। তাতেও একই রকম ফুটো। কালচে-বাদামী রক্তের দাগ লেগে আছে ফুটোর কাছে আর তার আশেপাশে। একবার দেখেই তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিল কোটের বোতাম।

'লোকটা কে?' জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে রবিন।
'আমি শেষে মানুষ খুন করে বসলাম!' বিড়বিড় করল মুসা।
'তোমার কোন দোষ নেই,' মুসার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। 'এটা অ্যাক্সিডেন্ট।'
পেছনে দমকা বাতাসে ঝাঁকি খেল দরজাটা। সামান্য একটু সরে এসে আটকে গেল। পুরোপুরি বন্ধ হলো না।
লাশের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। চেনা চেনা লাগছে চেহারাটা। আচমকা বলে উঠল, 'আরি! এ তো সে-ই!'
'কে?' ফিরে তাকাল পটার।
'কেন, চিনতে পারছেন না? ছবির সেই লোকটা।'
'কিসের ছবি?' চোখের দৃষ্টি এখনও স্বাভাবিক হয়নি মুসার। ভয়ে ঘোলা হয়ে গেছে মগজ।
'ড্রেসারের ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যে ছবি।'
'তাই তো! ঠিকই তো বলেছ!' উঠে দাঁড়াল পটার। ক্যাপটা মাথায় রাখতে পারছে না যেন। খুলে নিল। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘাম ফুটেছে কপালে। 'সেই লোকটাই তো।'
'পু-পু-পুলিশকে খবর দেয়া দরকার!' মুসা বলল। পিস্তল ধরা হাতটা নামাল অবশেষে। আঙুলের ফাঁক থেকে খসে পড়ে গেল মাটিতে। খটাং করে শব্দ হলো। কিন্তু তাকালও না সেদিকে।
কেউ কোন জবাব দিল না।
'পুলিশ ডাকা দরকার,' আবার বলল মুসা।
দমকা বাতাস ঝাপটা মেরে পুরোটা লাগিয়ে দিল গোলাঘরের দরজা। প্রচণ্ড শব্দ হলো আরেকবার লাফিয়ে উঠল সবাই। কেবল মেঝের লাশটা বাদে।
'ফোন ঠিক না হলে খবর দেব কি করে?' লাশের দিকে তাকিয়ে বলল পটার।
'ঘরে গিয়ে দেখলেই তো হয়, হয়েছে কিনা, রবিন বলল।'
'হ্যাঁ,' শুকনো কণ্ঠে বলল মুসা।
'কিন্তু আমাদের পালানো…জীপ…'
'আমি মানুষ খুন করেছি। পালিয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না। তারচেয়ে পুলিশের হাতে ধরা দেয়া ভাল।'
বাইরে জুতোর শব্দ। শক্ত তুষার মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে কেউ। দরজার সামনে দাঁড়াল। খোলার চেষ্টা করতে লাগল।
'ভালকান!' পিছিয়ে গেল পটার। জীপটার দিকে তাকাল। উঠে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যাবে কিনা ভাবছে।
খুলে গেল দরজা। ভালকান এসেছে। হাতে রাইফেল। কালো চোখের পাতা সরু করে বলল, 'গুলির আওয়াজ শুনলাম?…এত রাতে কি করছ এখানে…'

লাশটার ওপর চোখ পড়তে চুপ হয়ে গেল সে। দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠল, 'হুয়া!' চোখ মিটমিট শুরু করল। দৌড়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল লাশের পাশে। 'ডুগান!' মুখ তুলে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল কিশোরের দিকে। 'কে মেরেছে ওকে?'

ষোলো

'আমি!' পায়ের কাছে পড়ে থাকা পিস্তলটা দেখাল মুসা।

মাটিতে রাইফেল রেখে পটারের মত একই ভাবে লাশ পরীক্ষা করল ভালকান। 'মরেই গেল! বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'কে লোকটা? চেনেন মনে হচ্ছে?' অনেকটা সামলে নিয়েছে কিশোর।

'লিসার ভাই!' লাশের কোটের পকেট খুঁজতে শুরু করল ভালকান। নীল রঙের একটা স্কি মাস্ক টেনে বের করল। 'ও, তাহলে ওকেই জানালা দিয়ে উঁকি মারতে দেখেছ,' তিক্তকণ্ঠে বলল সে। মাস্কটা উঁচু করে ধরল সবার দেখার জন্যে। 'আর আমি ভাবলাম কিনা তোমাদের চোখের ভুল...'

লিসার ভাই! ঠিক! এতক্ষণে বুঝতে পারল কিশোর, ছবির লোকটার চেহারার সঙ্গে কার মিল দেখেছিল সে। লিসার।

চোখ পানিতে ভরে গেল ভালকানের। মুখ টকটকে লাল। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে দাঁড়াল। 'আমার পিস্তল দিয়েই শেষে আমার শালাকে গুলি করে মারলে!'

চোখের দৃষ্টি বদলে গেল ওর। লাফ দিয়ে উঠে দুহাত বাড়িয়ে মুসার গলা টিপে ধরতে এগোল।

সামনে চলে এল পটার। বাধা হয়ে দাঁড়াল দুজনের মাঝে। চিৎকার করে বলল, 'পাগল হয়ে গেলেন নাকি! ও ইচ্ছে করে খুন করেনি...'

চিৎকারটা যেন ধাক্কা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল ভালকানকে। 'অ্যাঁ!' মৃত শালার দিকে তাকাল আবার সে। মুখ ফেরাল মুসার দিকে। আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'ডুগান নিশ্চয় এই ঝড়ের মধ্যে আমাদের সাহায্য করতে এসেছিল। আর বেচারাকে তুমি মেরেই ফেললে।'

'কি সাহায্য?' জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না মুসা। বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমি ট্রিগার টিপিনি। পটারের হাতে দিতে যাচ্ছিলাম...আপনাআপনি গুলি বেরিয়ে গেল...'

'আপনাআপনি কখনও গুলি বেরোয়?' মুসার দিক থেকে চোখ সরাল না ভালকান। দস্তানা পরা হাতে দাড়ি চুলকাল। পটারের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'এখানে কেন এসেছ তোমরা?' ব্যাগগুলোর দিকে চোখ পড়তে বলল, 'পালাচ্ছিলে নাকি? তারমানে জীপটা ঠিক করে ফেলেছ। আমাকে বলোনি কেন?' বুড়ো আঙুল দিয়ে মুসাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'গান-র‍্যাক থেকে

পিস্তল বের করে এনেছে কেন ও? প্ল্যানপ্রোগ্রাম করে খুন করেছ নাকি আমার শালাকে?'

'দেখুন, মিস্টার ভালকান...' বলতে গেল পটার।

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ভালকান। 'খবরদার, কোন কথা বোঝাতে আসবে না আমাকে!'

পিছিয়ে গেল পটার। ভালকানকে বিশ্বাস নেই। ঘুসি মেরে বসতে পারে।

'তোমাদের থাকতে দিয়েই ভুলটা করেছি আমি!' যেন আক্রোশ মেটাতে ডুগান যে থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটাতে ধাঁ করে লাথি মারল ভালকান।

কিশোরের মনে হলো তার নিজের গায়ে পড়ল লাথিটা। এসব হম্বিতম্বি সহ্য করতে পারল না। 'দেখুন, এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আপনার শালাকে প্ল্যান করে খুন করার কোন কারণ এখানে ঘটেনি। চিনি না জানি না এমন একজন লোককে কেন খুন করতে যাব আমরা?'

'সেটা তোমরা জানো!' রাগে চিৎকার করে উঠল ভালকান।

এই লোকের কাছে যুক্তি দেখিয়ে কোন কাজ হবে না। শান্ত করার জন্যে কিশোর বলল, 'বেশ, পুলিশ ডাকুন। ওরা এসে যা করার করবে।'

'ফোন কই?'

'তাহলে পুলিশের কাছে আমরাই যাব।'

'পালাতে চাও?'

'মোটেও না। প্রয়োজন হয় আমি একা যাব। বাকি তিনজন থাক।'

দাঁড়ি চুলকাল ভালকান। বিড়বিড় করে একটা গাল দিল তুষারকে। মাথা নেড়ে বলল, 'সেটাও সম্ভব না। যা ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা, আর রাস্তায় যা বরফ, এই রাতের বেলা বেরোনো যাবে না কোনমতে। শহরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আবার লাশটার দিকে। আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল, 'ইস্, লিসাকে যে কি করে দেব খবরটা...'

'আমাকে মাপ করে দিন,' মুসা বলল। 'সত্যি আমি দুঃখিত। পিস্তলটা আমার হাতেই ছিল...কিন্তু কখন যে ট্রিগারে চাপ লাগল...'

মুসার কথায় কানই দিল না ভালকান, 'কাল সকালে উঠে প্রথম কাজটা হলো পুলিশের কাছে যাওয়া।' অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে সে। 'এখানে থাকলে ঠাণ্ডায় মরব। ঘরে চলো সবাই।' পটারের দিকে তাকাল, 'দেখি ধরো তো, লাশটা নিয়ে যাই। সেলারে রেখে এসে তারপর জানাব লিসাকে। ভাইয়ের মরা চেহারা ওকে দেখানো যাবে না। ফিট হয়ে যাবে।' মাটিতে পড়ে থাকা পিস্তলটা রুমাল দিয়ে চেপে ধরে সাবধানে তুলে পকেটে ভরল সে। 'থাক। পুলিশকে দিতে হবে। আঙুলের ছাপ দেখতে চাইবে নিশ্চয় পুলিশ।'

ভুরু কুঁচকে ভালকানের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

মুখ দেখে মনে হলো অসুস্থ বোধ করছে পটার। দ্বিধা করল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত ঢুকিয়ে দিল ডুগানের বগলের নিচে। ভালকান ধরল পায়ের দিকটা। তুলতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল পটার। কথায় বলে সব ল্যাশই নাকি ভারী। ডুগানের লাশটাও অস্বাভাবিক ভারী লাগল। দরজার কাছে পৌছেই হাঁপিয়ে গেল। ডাকল, 'মুসা, ধরবে একটু?'

এগিয়ে গেল মুসা।

রবিনকে এগোতে বলে কিশোর চলল তার পিছে পিছে। সুইচবোর্ডের কাছাকাছি এসে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল। বেরিয়ে এল বাইরে।

বাতাসের বেগ বাড়ছে। ঝাপটা থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নিচু করে এগোল অন্ধকারের মধ্যে। এবার আর ঘুরপথে গেল না ওরা। পেছনের আঙিনা দিয়ে শর্টকাটে চলল রান্নাঘরের দরজার দিকে।

অন্ধকারে বিছিয়ে আছে যেন কালো লম্বা বাড়িটা। এখন জেলখানা মনে হচ্ছে মুসার কাছে। ইস্, বেরিয়ে তো গিয়েছিল! গোলাঘরে অঘটনটা না ঘটলে জীপ নিয়ে অনেক দূর সরে যেত ওরা এতক্ষণে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! মুক্তি তো পেলই না, জড়িয়ে পড়ল বিরাট ঝামেলায়।

কি ঘটবে এখন কে জানে? অপরিচিত একজন মানুষকে খুন করেছে সে। পিস্তল চুরির কথা পুলিশকে বলে দেবে ভালকান। বলবে জীপ চুরি করে পালাতে চেয়েছিল ওরা। অভিযোগ অনেক। কয়টা থেকে রেহাই পাবে?

রাতেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে ভাল হত।

রান্নাঘরের উষ্ণতার মধ্যে যখন ঢুকল, থরথর করে কাঁপছে কিশোর। ভীষণ ঠাণ্ডার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উত্তেজনা আর উদ্বেগ।

পাশে সরে এসে চাপা গলায় বলল রবিন, 'কিশোর, কি হবে এখন? ভালকান কি করবে?'

'জানি না!'

'ভয় লাগছে আমার!'

রান্নাঘরের ভেতরেই সেলারের সিঁড়ির দরজা। সেটা খুলে লাশ বয়ে নিয়ে নেমে গেল পটার আর ভালকান। অন্য কাউকে নামতে দিল না। মুসাকেও নয়। সরু সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে তিনজন নামতে অসুবিধে হবে বলে। ভারি বোঝা নিয়ে নামতে নিশ্চয় দুজনেরও কষ্ট হচ্ছে। ক্রমাগত ভালকানের চিৎকার আর গালাগাল ভেসে আসতে থাকল নিচ থেকে।

'ভয় আমারও লাগছে,' নিচু স্বরে বলল কিশোর। 'ভালকানকে এখন এড়িয়ে চলতে হবে। যতক্ষণ না পুলিশ আসে।'

'পুলিশ কি আমাকে ধরে নিয়ে যাবে?' ঘড়ঘড় শব্দ বেরোল মুসার গলা থেকে।

'ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট, মুসা, অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ইচ্ছে করে খুন করোনি তুমি ডুগানকে। পুলিশ সেটা বুঝবে।'

'সত্যি বুঝবে?'

'না বোঝার কিছু নেই।'

রকি বীচ হলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু কিভাবে নেবে এই এলাকার পুলিশ

জানে না কিশোর। তবু খারাপ কিছু বলে মুসাকে আরও ঘাবড়ে দিতে চাইল না।

রান্নাঘরের দরজার কাছে জুতো রেখে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠায় উঠে এল তিন গোয়েন্দা। হাতের জ্যাকেটটা এককোণে ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় উঠে পড়ল কিশোর। গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিল।

হীটার চালু করে দিয়ে তার সামনে বসল মুসা আর রবিন। ঘর গরম শুরু করল ওটা।

কারও মুখে কথা নেই।

হাঁটু ভাঁজ করে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার ওপর মাথা রাখল মুসা।

ঘরে ঢুকল পটার। একটা হাত রাখল মুসার কাঁধে। 'মুসা, অত ভেঙে পড়ার কিছু নেই। ভেব না তুমি একা।'

জবাব দিল না মুসা।

বিছানার পাশে বসল পটার। 'দোষটা আসলে আমার।'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

'সব দোষ আমার,'-আবার বলল পটার। 'আমিই মুসাকে পিস্তল নিতে বলেছি। পুলিশকে বলব সব। দোষটা ওর একার হবে কেন? ভাগাভাগি করে নেব। মুসা কোনদিনই ট্রিগার টিপত না আমি যদি...' কথা আটকে গেল তার। ঠোঁট কাঁপতে লাগল। নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

'এতরাতে গোলাঘরে কি করছিল ডুগান?'

প্রশ্নটা এমন ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিল কিশোর, চমকে গেল পটার। 'অ্যাঁ...' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'তাই তো! এটা তো ভাবিনি!'

'লিসার ভাইই যদি হবে, বাড়িতে ঢুকল না কেন সে? স্কি মাস্কে মুখ ঢেকে তুষারপাতের মধ্যে বাইরে ঘোরাফেরা করছিল কেন? গোলাঘরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাটাল কি করে এতক্ষণ? মাথায় হ্যাট নেই, হাতে দস্তানা নেই, গায়ে গরম তেমন কোন কাপড়ও নেই, বসেই বা থাকল কি করে? মেরুভালুক তো আর হয়ে যায়নি। সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা হলো—এল কোনখান থেকে সে? কিভাবে? রাস্তা তো সব বন্ধ।'

একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারল না পটার। রবিন আর মুসাও চুপ।

'আরও একটা কথা,' কিশোর বলল, 'আমাদের ঢুকতে দেখে তক্তা হাতে নিল কেন ডুগান? নিশ্চয় শত্রু ভেবেছে। এখানে কে তার শত্রু?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে পটার বলল, 'আমাদের চোর-ডাকাত ভেবেছিল হয়তো।'

'ভাবলে ভুল করেনি,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'আমরা শুধু চোর নই, খুনীও। পিস্তল চুরি করলাম, জীপ চুরি করতে যাচ্ছিলাম, শেষে খুন করে বসলাম...'

'আমি সেটা মানব না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল পটার। 'খুনী এ বাড়িতে একজনই—ডালকান। কাল পুলিশ এলে সব বলব। লিসার সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে, কেন ওকে ঘুসি মেরেছে, সব বলে দেব।'

'লিসা এখন কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'ওর ঘরে। ভালকান নিশ্চয় ডুগানের কথা বলে দিয়েছে। আসার সময় শুনলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বেচারি!'

রাগে, ক্ষোভে মেঝেতে কিল মারল মুসা। 'আমার কাঁধে আজ শয়তান ভর করেছিল! নইলে আপনাআপনি ট্রিগারে আঙুল চেপে বসবে কেন?'

পিঠে হাত রেখে মুসাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। পটারের দিকে তাকাল, 'কিশোরের প্রশ্নগুলোর জবাব জানা দরকার। ওই ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে দরজা লাগিয়ে দিয়ে এতক্ষণ কি করছিল ডুগান? আমরা যেখানে এত কাপড় পরে আগুন জ্বেলে থাকতে পারছি না, সে সেখানে সাধারণ একটা কোট পরে বসে রইল কি করে? জমেই তো মরে যাওয়ার কথা!'

'সবার রক্ত তো আর এক রকম গরম হয় না,' পটার বলল। 'সবার সহ্য ক্ষমতাও এক নয়।'

নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে কিশোরের মনে। বড় দ্রুত ঘটে গেছে গোলাঘরের ঘটনাটা! চমকে দিয়েছিল ওদেরকে। অন্ধকার, গুলি বর্ষণ, লাশ, ভালকানের উপস্থিতি মগজ গুলিয়ে দিয়েছিল। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার অবকাশ ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে মুসাকে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু আসলেই কি সে দোষী?

'কি ভাবছ, কিশোর?' ওকে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে দেখে জিজ্ঞেস করল পটার।

'ডুগানের লাশটা দেখতে যাব আমি,' কিশোর বলল।

'লাশ দেখবে!' অবাক হলো পটার। 'এখন? সেলারে! নতুন করে আর কি দেখার আছে?'

'আছে।'

'কোন সন্দেহ জেগেছে নাকি তোমার?' জানতে চাইল রবিন।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কিশোর, 'গোলাঘরে খুব দ্রুত ঘটে গেছে ঘটনাটা।'

'তো?' ভুরু কুঁচকে তাকাল পটার।

'অনেক জিনিস চোখ এড়িয়ে গেছে আমাদের।'

'যেমন?'

'রক্ত এত অল্প বেরোল কেন?'

'তাই তো!' রবিন বলল। 'পিস্তলের গুলিতে তো গলগল করে বেরোনোর কথা।'

'হয়তো ঠাণ্ডার কারণে বেরোতে পারেনি,' অনুমান করল পটার। 'যা ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা, নিঃশ্বাস বেরোলেই জমে যায়। আর রক্ত তো তরল পদার্থ। মরার সঙ্গে সঙ্গে জমে গিয়েছিল।'

'কিন্তু মরতেও তো অন্তত কয়েক সেকেন্ড লাগার কথা। যাকগে, কি হয়েছিল, সেটাই দেখে আমি শিওর হতে চাই,' কিশোর বলল।

'দেখো, নিচে যেও না এখন! ভালকান দেখে ফেললে···' খপ করে কিশোরের হাত চেপে ধরল পটার।

'ভালকানের পরোয়া করি না আমি আর···'

খুলে গেল দরজা। যেন বাইরেই অপেক্ষা করছিল সে। আড়ি পেতে শুনছিল ওদের কথা। 'কেন করো না? হাড়গোড় ভাঙিনি বলে এখনও! সকালে পুলিশ না আসাতক এখান থেকে কেউ নড়বে না বলে দিলাম। বন্দুক নিয়ে পাহারা দেব আমি। বেরোনোর চেষ্টা করলেই গুলি খাবে।' দরজাটা টেনে দিয়ে চলে গেল সে।

আর কিছু করার নেই। শুয়ে পড়ল ওরা। দুজন বিছানায়, দুজন মেঝেতে। ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগল।

চিত হয়ে আছে কিশোর। ভাবছে। ঘুম আসার কোন লক্ষণ নেই। লাশটার কথা, গুলির শব্দের কথা, রক্তের কথা ভাবছে সে। অনেক প্রশ্ন ভিড় করছে মাথায়।

গড়াগড়ি করতে লাগল বিছানায়। সময় কাটছে। ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখ লেগে এল, বলতে পারবে না।

হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম। হাতঘড়ি দেখল। ভোর ছয়টা। মুসা, রবিন, পটার—তিনজনেই ঘুমাচ্ছে। ভালকান কি করছে? দেখা দরকার। যদি দেখে ঘুমিয়ে আছে, সেলারে নামবে। পুলিশ আসার আগেই দেখতে হবে লাশটা। আস্তে করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে। দরজা খুলে বাইরে বেরোল। কান পেতে শুনল কিছু শোনা যায় কিনা।

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। নিচে দুটো বাতি জ্বলছে। কিন্তু ভালকানকে দেখতে পেল না। হলওয়ে ধরে হাঁটতে গিয়ে বেডরুমে ভালকান আর লিসাকে কথা বলতে শুনল। বাইরে বাতাসের গর্জন।

ভালকান পাহারায় নেই। ওদের ঘুমাতে দেখে নিজের ঘরে চলে গেছে। সেলারে নামার এটাই সুযোগ। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল কিশোর।

সতেরো

রেলিঙে শরীরের ভর রেখে সিঁড়িতে চাপ কম দেয়ার চেষ্টা করল সে। তারপরও শব্দ হয়েই গেল। মচমচ করতে লাগল কাঠের ধাপগুলো।

নিচে নেমে দাঁড়িয়ে গেল। কান পাতল। কারও সাড়া নেই। ভালকান বেরোল না। নামার শব্দ কানে যায়নি নিশ্চয়।

বাতাসের গর্জন একটুও কমেনি। গাছের ডাল বাড়ি মারছে ঘরের ছাতে আর দেয়ালে। মড়মড় করে বড় একটা ডাল ভেঙে পড়ল। ঝড় বইছে।

রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। সেলারের দরজা খুলল সে। সিঁড়ির মাথায় দেয়ালে সুইচ খুঁজল। পেল না। নিচে সিঁড়ির গোড়ায় আছে হয়তো।

রান্নাঘরের আলোয় দেখা যাচ্ছে সিঁড়ির ওপরের অংশটা। রেলিঙ নেই। সাবধানে নিচে নামতে শুরু করল সে।

আশেপাশে কোনখানে টপ-টপ টপ-টপ করে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। পাইপ ফুটো হয়ে গেছে সম্ভবত।

সিঁড়ি দিয়ে যতই নামছে, ঠাণ্ডা ততই বেশি লাগছে। এক ধাপ এক ধাপ করে নেমে চলেছে। বাতাস ভারী। ভেজা ভেজা। সেলার গরম করার কোন ব্যবস্থা নেই। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা।

কংক্রীটের মেঝেতে নেমে এল সে। ভেজা মেঝেতে আটকে যাচ্ছে পায়ের স্নীকার। সব কিছুই ভেজা, ঠাণ্ডা আর আঠা আঠা। টপ-টপ শব্দটা আসছে মাথার ওপরে কোনখান থেকে। টর্চ আনা উচিত ছিল। তাহলে দেখতে পারত।

হাঁচি আসছে। দম বন্ধ করে রইল সে। অনেক কষ্টে দূর করল অনুভূতিটা। গায়ে কাঁটা দিল। জ্যাকেট না এনেও ভুল করেছে।

লাইটসুইচের জন্যে কংক্রীটের ঠাণ্ডা দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল। হাতে ঠেকল মাকড়সার জাল। সরিয়ে আনল সঙ্গে সঙ্গে। বিষাক্ত কোন মাকড়সা কামড়ে দিলে মারাত্মক বিপদে পড়ে যাবে। কিন্তু সুইচ পেতে হলে দেয়ালে হাত দিতেই হবে। সাবধানে আলতো করে হাত রাখল। তৈরি রয়েছে। মাকড়সার স্পর্শ পেলেই সরিয়ে নেবে।

এগোতে গিয়ে মুখে লাগল জাল। চুল, চোখের পাপড়িতে আটকে যাচ্ছে। গাল চুলকাতে লাগল।

পাওয়া গেল না সুইচ। দেয়ালের কাছ থেকে সরে এল সে। রান্নাঘরের আলোর আভায় খুব আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা। অন্ধকার চোখে সইয়ে নিয়ে দেখার চেষ্টা করল পটারের লাশটা কোথায় আছে। পাপড়িতে লেগে থাকা জালগুলো বিরক্ত করছে। সরাল সেগুলো। মাটিতে ছোটাছুটি করছে ইঁদুর।

টপ-টপ শব্দটা কানে লাগছে।

কাশি পেল। না কেশে পারল না। শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলল বন্ধ ঘরের দেয়ালে।

দেয়ালের কাছে স্তূপ করে রাখা কতগুলো বাক্স দেখা গেল আবছামত। ওগুলোর গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা পুরানো একটা সাইকেল। একটা চাকা নেই। খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনের উঁচু স্তূপের পাশে একটা ভাঙা কাউচ।

আশেপাশেই কোথাও পড়ে আছে লাশটা। কোথায়?

আরও কয়েক পা এগিয়ে দেখতে পেল একটা তেরপল পড়ে আছে মেঝেতে। মাঝখানটা ফোলা।

পাওয়া গেছে!

নিচু হয়ে টান দিল তেরপল ধরে। বেশ ভারী। নিচে একটা কার্ডবোর্ডের ওপর চিত হয়ে আছে বেচারা ডুগান। খোলা, নিষ্প্রাণ চোখের মণি দুটো আবছা আলোতেও চিকচিক করে যেন নীরব জিজ্ঞাসা রেখেছে, 'তুমি এখানে কি চাও?'

তেরপলটা সরিয়ে ফেলল সে। হাত কাঁপছে। ইচ্ছে করছে ওটা আবার লাশের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে পালায়।

জোর করে দমন করল ইচ্ছেটা। এসেছে যখন, ভালমন্দ না দেখে যাবে

না।

কিন্তু কি করে দেখবে? অন্ধকারে স্পষ্ট নয় কিছুই। লাশটা পরীক্ষা করতে আলো দরকার। আলোর ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে ঘরে। কোথায়? এদিক ওদিক তাকাল। ছাতের দিকে চোখ পড়তে দেখতে পেল ঢাকনাবিহীন একটা নগ্ন বাল্ব। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। পাশে সরতেই গালে লাগল দড়ি। কর্ডসুইচ! টান দিল ওটা ধরে।

জ্বলে উঠল আলো। অল্প পাওয়ারের বাল্ব। প্রচুর ছায়া সৃষ্টি করে হলদে আলো ছড়িয়ে দিল সেলারের মেঝেতে। আলো খুব সামান্য, তবে ওর কাজের জন্যে যথেষ্ট। এটুকু পেয়েই ধন্য হয়ে গেল সে।

ইঁদুরের ছোটাছুটি বেড়ে গেল। অন্ধকারে লুকিয়ে পড়তে চাইছে।

মাটির নিচের ঘর। টপ-টপ পানির শব্দ। ইঁদুরের হুটোপুটি। ভয়াবহ ঠাণ্ডা। সামনে লাশ। এক ভয়াবহ নারকীয় পরিবেশ।

ঠাণ্ডায় রীতিমত কাঁপতে আরম্ভ করল সে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

লাশটার ওপর ঝুঁকল। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে।

লাশের কোটের বোতাম খুলল। নিচে শার্ট। শার্টের বোতামও খুলল। একপাশে সরাতেই দেখতে পেল বুকের ফুটোটা। মাত্র কয়েক ফোঁটা রক্ত লেগে আছে। লাল জমাট বরফ।

আশ্চর্য! শার্টে রক্ত নেই। ফুটোতে রক্ত নেই। বুক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েনি। মরার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পানি হয়ে যেতে শুনেছে, কিন্তু ভেতরে বরফ হয়ে যেতে শোনেনি।

লাশের একটা হাত তুলে নেয়ার চেষ্টা করল। পারল না। কনুই বাঁকছে না। লাঠির মত শক্ত হয়ে আছে।

আরও একটা জিনিস লক্ষ করল সে। লাশের পেট অতিরিক্ত ফোলা।

ছেড়ে দিয়ে ঘড়ি দেখল। সাড়ে ছ'টা। মুসা গুলি করার পর ছয় ঘণ্টাও পেরোয়নি। এত কম সময়ে এ ভাবে শক্ত হয়ে যাওয়ার কথা নয় লাশটার। আবহাওয়া যত ঠাণ্ডাই হোক। তা ছাড়া মাত্র ছয় ঘণ্টায় এ ভাবে ফুলে যেতে পারে না পেট।

এর একটাই জবাব...

পায়ের শব্দ শোনা গেল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

কংক্রীটের মেঝেতে জুতো ঘষার শব্দ।

সেলারে নেমেছে কেউ।

আঠারো

পাইপের ফুটো দিয়ে পানি পড়ছে টপ-টপ করে।

জোরাল হচ্ছে পায়ের শব্দ।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর।

আলোর নিচে এসে দাঁড়াল পটার। চোখ মিটমিট করছে। ঠিকমত ঘুম না হওয়াতে লাল হয়ে আছে। এলোমেলো চুল। স্নীকারের ফিতে খোলা। কিশোরকে বিছানায় না দেখে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে নেমে এসেছে মনে হচ্ছে।

'কিশোর?'

'আপনি! বাঁচলাম! আমি তো ভেবেছিলাম ভালকান...'

'নামলেই তাহলে,' সোয়েটশার্টের আস্তিন দিয়ে হাত ডলল পটার। 'উফ্, কি ঠাণ্ডা।'

'না দেখে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না...'

'বিটকেলে গন্ধ!' নাক কুঁচকাল পটার। লাশটার দিকে চোখ। তাকিয়ে রইল খোলা বুকটার দিকে। 'কি দেখলে?'

'ওপরে চলুন, বলছি। মুসা আর রবিন উঠেছে?'

হাই তুলল পটার, 'বলতে পারব না। ঘুম হয়নি আমার। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।'

'আমারও হয়নি।' পটারের হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'চলুন। ঠাণ্ডায় কাঁপ উঠে যাচ্ছে।'

চিলেকোঠায় ফিরে এসে দেখল মুসা আর রবিন চোখ মেলেছে। চোখে ঘুম। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'সেলার থেকে এলে?'

'হ্যাঁ।'

উঠে বসল রবিন। 'কি দেখলে?'

'অনেক কিছু।'

দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুসা, তুমি খুন করোনি ডুগানকে। আমাদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। বোকার মত তাতে পা দিয়ে বসে আছ তুমি। কিছুটা গোঁয়ার্তুমি করেই বলব।'

লাফ দিয়ে উঠে বসল মুসা। 'বলো কি! আমিই তো গুলি করলাম!'

'ট্রিগার টিপেছ বলতে পারো। গুলি বেরোয়নি।'

'তাহলে শব্দ শুনলাম কেন? কি বেরোল?'

'শুধুই বারুদ। কার্তুজ থেকে সীসেটা বের করে নেয়া হয়েছিল। হ্যামারের আঘাতে বারুদে বিস্ফোরণ ঘটেছে, কিন্তু গুলি বেরোয়নি।'

'খাইছে! বারুদের আঘাতেই মরে গেল!'

'না, অনেক আগেই মরে গিয়েছিল। আমরা এবাড়িতে আসারও আগে। পিস্তলের গুলিতেই অবশ্য।'

'মাথা খারাপ!' বিড়বিড় করল পটার। 'কি করে বুঝলে?'

'লাশের জখম থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়েনি। মাত্র কয়েক ফোঁটা লেগে আছে গুলির ফুটোটার কাছে। গুলি খাওয়ার পর ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটার কথা। ছুটেছিল নিশ্চয়। মুছে ফেলা হয়েছে। তা ছাড়া এত বেশি শক্ত হয়ে

আছে শরীর, আর পেট এত ফোলা, মাত্র ছয় ঘণ্টায় যেটা হওয়ার কথা নয়।'

'কিন্তু…' বলতে চাইল মুসা।

হাত নেড়ে ওকে থামতে বলল কিশোর। 'জমাট বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আছে লাশ। গোলাঘরে অনেক সময় ধরে পড়ে ছিল। সকালে আমরা যখন জীপে উঠতে গিয়েছিলাম, তখনও ছিল। নিশ্চয় খড়ের নিচে লুকানো। এ রকম বরফের মত শক্ত হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ—দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে থাকা।'

'মরা হলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিভাবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'দাঁড়িয়ে যে ছিল তাতে কোন ভুল নেই। সবাই দেখেছি আমরা।'

'শক্ত ছিল বলেই খাড়া করে রাখা গিয়েছিল,' মনের চোখে ছায়ামূর্তিটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কিশোর। 'থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। আঙুলের ফাঁকে গুঁজে দেয়া হয়েছিল তক্তা। সব সাজানো ব্যাপার…'

স্নীকারের ফিতে বেঁধে সোজা হলো পটার, 'বুঝলে কি করে সেটা?'

'গুলির শব্দের পর সামান্যতম নড়াচড়া করেনি ও, হাত-পা ছোঁড়েনি, চিৎকার করেনি, মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোয়নি, জাস্ট ঢলে পড়ে গেছে; কিছুই করেনি—পিস্তলের গুলি খেয়ে মরার সময় যা পুরোপুরি অস্বাভাবিক। একটা কথা বুঝতে পারছি না—পড়ল কিভাবে? বারুদের ধাক্কা কি এতই বেশি যে একটা লাশকে ফেলে দিতে পারে?'

'বাতাসে ফেলেছে,' রবিন বলল। 'কি জোরে জোরে ধাক্কা মেরে দরজা বন্ধ করেছে দেখোনি।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা, 'ইস্, আমি একটা গাধা! কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম…কিন্তু কেন আমাদেরকে…'

'ফাঁদে ফেলা হলো? বুঝতে পারছ না? ডুগানকে খুন করেছে ভালকান। আমাদের ওপর দোষটা চাপিয়ে দিয়ে নিজে বেঁচে যেতে চেয়েছে।'

'তুমি…বলতে চাইছ…'

'ভালকান পুলিশের সামনে তোমাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিল অন্ধকারে তুমিই গুলি করে মেরেছ ডুগানকে। আমাদের সবার মুখ থেকে শুনত পুলিশ। বিশ্বাস করত। অত তলিয়ে দেখার কথা হয়তো ভাবতই না। সত্যি সত্যি কিভাবে খুন হয়েছে লোকটা, জানতে পারত না। পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাক বা না যাক, মুক্তি পেয়ে যেত ভালকান…'

শান্তকণ্ঠে পটার বলল, 'তোমার কথা আমি মেনে নিতে পারছি না…'

'কেন পারছেন না?' মুসা বলল, 'পুরো ব্যাপারটাই একটা ফাঁদ, বুঝতে পারছেন না? অনেক আগেই মারা গেছে ডুগান। আর আমরা গাধারা…'

'মুসা, নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ খুঁজছ তুমি!'

'তাতে অসুবিধে কি?' রবিন জবাব দিল, 'ভালকান যদি…'

বাধা দিল কিশোর, 'তর্ক করার সময় নেই এখন। পালাতে হবে।' তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা পরে নিয়ে ব্যাগ তুলে নিল সে। 'এখন আমি সত্যি ভয় পাচ্ছি ভালকানকে। একবার খুন করেছে সে। আমরা জেনে গেছি এটা যদি

ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে বসে আমাদের গুলি করতে দ্বিধা করবে না।'

মুসা আর রবিনও উঠে পড়ল।

'লিসা কি জানে এসব কথা?' জ্যাকেট গায়ে দিতে দিতে বলল রবিন।

'নিশ্চয় জানে,' কিশোর বলল। 'আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্যে এক জঘন্য পরিকল্পনা করেছে তার স্বামী। জানে বলেই ঝগড়া করছিল। এ বাড়িতে ঢোকা উচিত হয়নি বলে দুপুরবেলা আমাকে সাবধান করেছিল।'

'ভালকানকে এভাবে ছেড়ে দেয়া উচিত হচ্ছে না আমাদের,' দরজায় গিয়ে দাঁড়াল পটার। 'ধরা দরকার। চারজনের বিরুদ্ধে একা কি করবে সে? পালালে বরং দোষী হয়ে যাব আমরাই।'

'ও পাগল। খুনী। ঝামেলা করতে গিয়ে অহেতুক বিপদ বাড়ানোর কোন মানে হয় না,' কিশোর বলল। 'আমরা তো আর পালিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছি না। সোজা যাব পুলিশের কাছে। সব কথা খুলে বলব।'

'কিন্তু কিভাবে পালাব?' দরজা খুলে উঁকি দিল পটার। ভালকান আসছে কিনা দেখল বোধহয়।

'কেন, জীপটা নিয়ে যাব। আপনার কাছে তো চাবি আছেই।'

মাথা ঝাঁকাল পটার। 'কিন্তু এ ভাবে পালাতে আর এখন ভাল লাগছে না আমার...'

'আর কোন উপায় নেই,' দরজা থেকে ওকে সরিয়ে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'বেরিয়ে যেতেই হবে আমাদের। এখুনি। আসুন।'

একবার দ্বিধা করে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল পটার।

রাতের মত নিঃশব্দে বেরোনোর চেষ্টা করল না আর কিশোর। পেছনের সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল। অনুসরণ করল মুসা আর রবিন। সবার পেছনে পটার।

ভালকান কিংবা লিসাকে দেখা গেল না। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। ভাঙে ভাঙুক। পরোয়া করল না কিশোর। বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরতে কিছুটা সময় লাগবে ভালকানের। তারপর পিছু নেবে। ততক্ষণে তার নাগালের বাইরে চলে যাওয়া যাবে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দ্রুত জুতো পরে নিল ওরা। রান্নাঘরের পেছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরোল। শক্ত হয়ে থাকা তুষার মাড়িয়ে ছুটল গোলাঘরের দিকে।

ওদের পেছনে সবে উঁকি দিচ্ছে কমলা রঙের বিশাল এক সূর্য। সোনার মত রাঙিয়ে দিয়েছে তুষারকে। ওদের আগে আগে ছুটে চলল লম্বা, নীলচে রঙের ছায়াগুলো। বাতাস থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে। কিন্তু সকালের এই অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার মত মানসিকতা এখন নেই কারও।

কিশোরের একটাই লক্ষ্য, কোনমতে জীপের কাছে পৌছানো। ভালকান চলে আসার আগেই বাড়িটার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে না পারলে হয়তো

কোনদিনই পারবে না আর।

গোলাঘরের দরজার কাছে পৌঁছে ফিরে তাকাল সে। মুসা আর রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'পটার কই?'

ওরাও দাঁড়িয়ে গেল। ফিরে তাকাল।

হাঁপাতে হাঁপাতে মুসা বলল, 'আমাদের পেছনেই তো ছিল।'

'ঘরেই রয়ে গেল নাকি এখনও?'

কপালের ওপর হাত এনে রোদ বাঁচিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল কিশোর। রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে পটারকে বেরোতে দেখল। তাড়াতাড়ি ছুটতে গিয়ে পা পিছলে যাচ্ছে বরফে। হাতে কি যেন রয়েছে ওর। রোদ লেগে ঝিক করে উঠছে।

আরও কাছে আসতে দেখা গেল, ওর হাতের জিনিসটা পিস্তল।

'ওটা এনেছেন কেন আবার?' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে চান নাকি? ফেলে দিন!'

ফেলল না পটার। ছুটে আসতে থাকল।

'পটার,' আরও জোরে চিৎকার করে বলল কিশোর, 'ফেলুন ওটা! পিস্তল লাগবে না আমাদের!'

'কিন্তু আমার লাগবে!' জবাব দিল পটার। শেষ কয়েক গজ দূরত্ব পেরিয়ে এসে মুখোমুখি হলো ওদের। সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করে ওপরে উঠে যাচ্ছে ওর নিঃশ্বাস। ছোট রূপালী পিস্তলটা সোজা কিশোরের বুক বরাবর তাক করে ধরল।

'সরি,' বরফে ঠিকরে আসা উজ্জ্বল রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে চোখের পাতা কুঁচকে রেখেছে পটার। 'তোমরা খুব ভাল ছেলে। কিন্তু অনেক কষ্ট করে ফাঁদটা পেতেছি আমি আর ভালকান। তোমাদের যেতে দিই কি করে?'

উনিশ

পটারের পিস্তল ধরা হাতের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোর। অনেকক্ষণ পর অবশেষে বলল, 'রসিকতা করছেন?'

মাথা নাড়ল পটার। পিস্তল নেড়ে বাড়িটা দেখিয়ে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করল।

'আপনি সত্যি ভালকানের সঙ্গে কাজ করছেন?' মুসার কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'ফাঁদে ফেলার জন্যে নিয়ে এসেছেন এখানে?'

'হ্যাঁ,' ভোঁতা কণ্ঠে স্বীকার করল পটার। ভাবলেশশূন্য চেহারা। চোখ কিশোরের দিকে। 'ভালকান ডুগানকে খুন করার পর স্কি লজে গিয়েইছিলাম শিকার জোগাড়ের জন্যে। পেয়ে গেলাম তোমাদের।'

'কিন্তু এ সব করে পার পাবেন না আপনারা!' রাগে চিৎকার করে উঠল রবিন।

জবাব দিল না পটার। বাড়ির দিকে ফিরে তাকিয়ে আবার পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল। 'চলো। দেরি করা যাবে না।'

কিছুই করার নেই। ধীরে ধীরে আবার বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। উদ্যত পিস্তল হাতে ওদের পিছে পিছে চলল পটার। কেউ কিছু বলছে না। বরফের ওপর ওদের জুতোর মচমচ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

নিজেকে একটা ছাগল মনে হচ্ছে কিশোরের।

পটার ওকে পুরোপুরি বোকা বানিয়েছে। ওদের তিনজনকেই বানিয়েছে। কি বিশ্বাসই না ওকে করেছিল ওরা! বাড়িটা খুঁজে বের করে প্রাণ বাঁচিয়েছে বলে কৃতজ্ঞ হয়েছিল। ধন্যবাদ দিয়েছিল। অথচ সারাক্ষণ ওদের বোকামির জন্যে মনে মনে হেসেছে ও।

নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো কিশোরের। আরও আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল পটারকে। বাড়িটাতে ঢোকার পর থেকেই কেন অস্বস্তিতে ভুগছিল, স্পষ্ট হয়েছে এতক্ষণে। বিষাক্ত গোখরোর সঙ্গে অজান্তে বাস করতে গেলে এ রকম অনুভূতিই হওয়ার কথা। কেন সতর্ক হলো না সে? কেন ধরতে পারল না? রাগটা হচ্ছে সেজন্যেই।

জমাট বেঁধে পুরু হয়ে গেছে তুষারের স্তর। জুতো দেবে যায় না। তাই হাঁটতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। রান্নাঘরের দরজার সামনে পৌঁছে ওদের থামতে বলল পটার। পিস্তলটা উদ্যত রেখে চিৎকার করে ভালকানকে ডাকল।

বেরিয়ে এল ভালকান। দরজার ওপাশেই অপেক্ষা করছিল। পরনে সেই ঢোলা জিনস। শার্টের ওপর চড়িয়েছে একটা তামাটে রঙের হান্টিং জ্যাকেট।

'গুড মর্নিং, তিন গোয়েন্দা,' বিকৃত ভঙ্গিতে হাসল সে।

'ধরো,' পিস্তলটা ভালকানের দিকে ছুঁড়ে দিল পটার।

লুফে নিল ভালকান। বেরিয়ে এল সিঁড়ির মাথার চওড়া জায়গায়। পিস্তলটা গোয়েন্দাদের ওপর স্থির রেখে পেছনের আঙিনায় চোখ বুলিয়ে হাসল। 'হুয়া, বাতাস থেমে গেছে। সুন্দর সকাল, তাই না?'

জবাব দিল না কেউ। তিনজনেরই চোখ পিস্তলটার দিকে।

'এত সুন্দর সকালে কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?' ভালকানের হাসিটা মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। 'আবার পালানোর চেষ্টা করেছিলে, তাই না?'

চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

'লিসার ভাইকে খুন করে পালানোর চেষ্টা করেছিলে, তাই তো?' আফসোসের ভঙ্গিতে জিভ দিয়ে চুকচুক করল ভালকান। 'বেচারা ডুগান। পুলিশকে জানাতে হবে আজই।'

ছাত থেকে জমে থাকা তুষারের একটা স্তূপ খসে পড়ল ভালকানের পাশে। রোদে গলতে আরম্ভ করেছে। ক্ষণিকের জন্যে চমকে গেল সে। সামলে নিয়ে বলল, 'সুখবর আছে তোমাদের জন্যে, ফোনটা ঠিক হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে পুলিশকে ফোন করে এখন তোমাদের স্বীকারোক্তি দিতে

পারো।'

'সত্যি কথাটা জেনে গেছি আমরা, ভালকান.' রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। 'ওসব ফোন খারাপের অভিনয় করে আর লাভ নেই। ফোনটা আসলে খারাপই হয়নি, তাই না? ভেঙে চুরে অহেতুক ভড়ং দেখাচ্ছিলেন। পাগল হয়ে যাওয়ার ভান করছিলেন। সব আপনাদের সাজানো ব্যাপার। আপনার আর পটারের।'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ভালকান। 'কিভাবে জানলে?'

'আমরা জানি মুসা ডুগানকে খুন করেনি। অনেক আগেই মরে গিয়েছিল সে। আপনি খুন করেছেন। খুব কাছে থেকে। কোটের ফুটোর চারপাশের পোড়া দাগটাই তার প্রমাণ। রাগের মাথায় খুনটা করে ফেলে নিশ্চয় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে কি করে অন্যের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেয়া যায় সেই প্ল্যানটা করেছেন।'

পটারের দিকে তাকাল ভালকান, 'এ কাদের ধরে এনেছ তুমি? এরা তো আমাদের চেয়েও চালাক।'

কাঁধ ঝাঁকাল পটার। দুই হাত প্যান্টের পকেটে। তাকিয়ে আছে ছাত থেকে পড়া তুষারের দিকে।

'অনেক বেশি চালাক,' ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ভালকানের চেহারা। কিশোরের দিকে তাকাল, 'সব তাহলে জেনে ফেলেছ? এটাও নিশ্চয় জেনে গেছ পটারই নীল মাস্ক পরে জানালায় উঁকি দিয়েছিল?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। জীপ মেরামতের ছুতোয় গোলাঘরে ফিরে গিয়েছিল সে। খড়ের নিচ থেকে লাশটা বের করে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কয়েকটা বড় ধরনের ভুল করেছিল সে। একবারও ভাবেনি, গোলাঘরে গরম কাপড় ছাড়া একটা লোক এত ঘণ্টা লুকিয়ে থাকতে পারে না—সন্দেহ জাগবে আমাদের। আরও একটা বড় ভুল ছিল, জখমের চারপাশের রক্ত মুছে ফেলা। না ফেলেও অবশ্য উপায় ছিল না। বুকে রক্ত বরফ হয়ে থাকতে দেখলেও সন্দেহ করতাম আমরা। গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারও রক্ত বেরিয়ে বরফ হতে পারে না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ভালকান। 'হুঁ! ভীষণ চালাক ছেলে তোমরা। এত চালাকদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক।' চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়ি চুলকাল সে।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, যতটা ভাবছেন তত চালাক আমরা নই। তাহলে অনেক আগেই ধরে ফেলতে পারতাম আপনাদের চালাকি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে রাত দুপুরে হাওয়া খেতে বেরোনোর কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না, অথচ পটারের কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম। সেরাতে সে আসলে বেরিয়েছিল মুসার গাড়িটা খাদে ফেলে দেয়ার জন্যে। যাতে পরদিন আমরা কোনমতেই এ বাড়ি থেকে চলে যেতে না পারি। ও-ই আমাদের পালিয়ে যাওয়ার ছুতোয় গোলাঘরে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। মুসাকে গোঁয়ার পেয়ে ফাঁসানোর জন্যে তাকে টার্গেট করেছিল। কায়দা করে পিস্তল তুলে দিয়েছিল

হাতে। গোলাঘরে লাশের সামনে দাঁড়িয়ে পিস্তল বের করতে বলেছিল। মুসা যেই ওর হাতে পিস্তলটা তুলে দিতে যাচ্ছিল, সে দ্রুত ট্রিগারটা টিপে দিয়েই একধাক্কায় ফেলে দিয়েছিল ডুগানের লাশটা। অন্ধকারে দেখতে পাইনি আমরা। তারপর চোখের পলকে সরে গিয়েছিল ওখান থেকে। গাধা না হলে এসব ব্যাপার তখনই বুঝে ফেলতাম। কারণ মুসা বার বার বলছিল, সে ট্রিগার টেপেনি। লাশ পড়ার ব্যাপারটাকেও গুরুত্ব দিইনি। অথচ দরজা দিয়ে বাতাস এসে ওরকম করে ফেলে দিতে পারে না, ভাবা উচিত ছিল।' একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলে থেমে দম নিতে লাগল সে।

'সবই তো গেল! কি করতে চাও এখন, হেরি?' গোলাঘরের দিকে তাকাল পটার।

কিশোরও তাকাল গোলাঘরের দিকে। দরজাটা খোলা। নিচের দিকটা বরফে আটকে গেছে। বন্ধ হতে পারছে না। ভেতরে আবছামত দেখা যাচ্ছে জীপটা।

'ভাবা দরকার,' জবাব দিল ভালকান। 'এই ছেলেগুলোই এখন একমাত্র সমস্যা নয় আমাদের।'

'কি বলতে চাও?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল পটারের কণ্ঠ।

'লিসা,' ভালকান বলল, 'সে-ও বড় বেশি গোলমাল করছে। সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছিল। এখন গেছে উল্টে। শিশুর মত আচরণ করছে।'

পেছনে কয়েক গজ দূরে এসে বসল একটা কাক। সাদা বরফের পটভূমিতে কুচকুচে কালো। কয়েকদিন পর নিশ্চয় বাসা থেকে বেরিয়েছে খাবারের খোঁজে। ডানা ঝাপটাল কয়েকবার। কর্কশ স্বরে কা-কা করল। ওটার দিকে পিস্তল তুলে গুলি করার ভান করল ভালকান। ভয় দেখিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল। তাতেও না যাওয়ায় মুখ দিয়ে 'ঠুস, ঠুস' শব্দ করে তাড়াল।

'ডুগানের জন্যে এখন মায়া হচ্ছে নাকি লিসার?' জানতে চাইল পটার।

মাথা ঝাঁকাল ভালকান। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, মরার পর মনে হচ্ছে ওর, ভাইকে ভীষণ ভালবাসত।'

'ডুগান আমারও ভাই ছিল। কই, আমার তো কিছু হচ্ছে না।'

'তোমার হবে কি? তুমি তো সৎভাই।'

খোঁচাটা লাগল পটারের। মুখ দেখেই অনুমান করা গেল। কিন্তু জবাব দিতে পারল না সে।

ভুরুজোড়া কাছাকাছি হলো কিশোরের। ও, লিসা তাহলে পটারেরও বোন। ভাইকে খুন করতে সহায়তা করল কেন ওরা দুজনে?

'বোনের মত তুমিও আবার মত বদলে ফেলোনি তো?' কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল ভালকান।

'না...'

দরজায় দেখা দিল লিসা। চুল এলোমেলো। চোখে বুনো, ভীত দৃষ্টি। 'ডুগানের জন্যে এখন আমার খুব খারাপ লাগছে, হেরি। আমাদের কয়টা টাকা নাহয় চুরিই করেছিল সে। তারজন্যে ধাওয়া করে এসে একেবারে মেরে

ফেলতে হবে…'

'কয়টা টাকা নয়, লিসা, এক লাখ ডলার। আমার সারা জীবনের সঞ্চয়,' কর্কশ গলায় বলল ভালকান, 'তা ছাড়া তুমি জানো, ইচ্ছে করে মারিনি আমি। শুধু ভয় দেখিয়ে টাকাটা আদায় করতে চেয়েছিলাম। ও পিস্তল ধরে টানাটানি না করলে…'

'না করলেও তুমি ওকে গুলি করতে!'

'তোমার সঙ্গে কথা বলাই বৃথা! ঘরে যাও!' ধমকে উঠল ভালকান।

গেল না লিসা। তিন গোয়েন্দাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওদেরকে এভাবে আটকে রেখেছ কেন?'

'ভেতরে যেতে বললাম না তোমাকে!' আরও জোরে ধমকে উঠল ভালকান। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল ষাঁড়ের মত। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

'ডুগান যা করেছিল সেজন্যে ওকে এখনও ঘৃণা করি আমি,' কোটের বুকের কাছে খোলা অংশটা চেপে ধরল লিসা। টেনে কাছাকাছি নিয়ে এল। 'ও আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে, আমাদের টাকা চুরি করেছে, আমাদের ঠকিয়েছে—সবই ঠিক…'

'লিসা!' গর্জে উঠল ভালকান। ধৈর্য হারাচ্ছে। 'ওসব বলে আর এখন কোন লাভ নেই। ভেতরে যাও…'

ওর কথা কানেই তুলল না লিসা। 'কিন্তু তাই বলে ওর জীবন শেষ করে দেয়াটা, একেবারে প্রাণে মেরে ফেলাটা উচিত হয়নি তোমার।' গোলাঘরের পেছনে জমাট লেকের দিকে ওর চোখ। 'খুনের সহযোগী হতে হবে জানলে তোমার সঙ্গে এখানে আসতেই রাজি হতাম না আমি। তুমি আমাকে বলেছিলে, ডুগানকে ভালমত একটা শিক্ষা দেবে…'

'এখন ওসব দুঃখ প্রকাশের সময় পার হয়ে গেছে,' কঠোর কণ্ঠে বলল ভালকান। 'ভাইয়ের পক্ষে খুব তো ওকালতি করছ। ওকি ভাল লোক ছিল নাকি? চোর, খুনী…'

চট করে কথাটা ধরল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে খুন করেছে? নিশ্চয় বারবিকে?'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল ভালকান, 'তুমি জানলে কি করে?'

'অনুমান,' নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল কিশোর। 'বাড়িটা যেহেতু ডুগানের ছিল, গান-র‍্যাকটাও নিশ্চয় তার। শিকার পছন্দ করত নাকি?'

দাড়ি চুলকাল ভালকান। 'করত। বারবির মতই আরেক ছাগল। তুষারপাতের সময় বোকা হরিণগুলোকে আরও বোকা বানানোর জন্যে বেরিয়ে যেত বন্দুক নিয়ে…'

'পুলিশকে ফোন করে দিয়েছি আমি,' ভালকানের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না লিসার। 'ওরা রওনা হয়ে গেছে। বিশ মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে। তাড়াহুড়া করলে আগেও আসতে পারে।'

ধক করে উঠল কিশোরের বুক। বহুকাল পরে যেন একটা ভাল কথা শুনল। রবিনের দিকে তাকাল। তার চোখেও হাসির ঝিলিক।

ভালকানের চোখের তারায় আগুন। গর্জে উঠল, 'পাগল হয়ে গেছ!' পিস্তলটা নাচিয়ে বলল, 'জানো তুমি নিজের কতবড় সর্বনাশ করেছ? এই ছেলেগুলোর মত নিরপরাধ তুমি নও। পুলিশকে খবর দিলেই পার পেয়ে যাবে না। খুনের সহযোগী হিসেবে তোমাকেও ছাড়বে না ওরা।'

বিশ মিনিট—ভাবল কিশোর। অত খুশি হওয়ার কিছু নেই। অনেক সময়। ততক্ষণে যা খুশি ঘটে যেতে পারে। বিপদমুক্ত নয় এখনও ওরা।

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম না, লিসা,' পটার বলল। ভয় চাপা দিতে পারছে না। জ্যাকেটের হাতা দিয়ে কপাল মুছল। এই শীতেও ঘামছে।

চিৎকার করে তর্ক জুড়ে দিল লিসা আর ভালকান। যা মুখে আসছে তাই বলে লিসাকে গালাগাল করছে সে। পটার কিংবা তিন গোয়েন্দা, কারও উপস্থিতির তোয়াক্কা করছে না।

নিচের দিকে তাকাল রবিন। চোখ আটকে গেল কয়েকটা গোল জিনিসে। আগের দিন স্নোবল খেলতে তুষারের যে সব বল বানিয়েছিল, তার কয়েকটা পড়ে আছে। খেলা শেষ করার আগেই গোলাঘরে যেতে ডাক দিয়েছিল ভালকান। ফেলে গেছে ওরা। বলগুলো এখন বরফের টুকরো। পাথরের মত শক্ত।

ঝগড়া করার জন্যে ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে ভালকান। লিসাকে গালাগাল করছে। ছাত থেকে খসে পড়া তুষারের স্তূপের কাছে রয়েছে পটার। ভালকানের সঙ্গে যোগ দিয়ে বোনকে বকাবকি করছে সে-ও। বোঝানোর চেষ্টা করছে।

একেবারে উপযুক্ত সময়।

কাজ হবে তো? হলে হবে না হলে নেই, চেষ্টা করতে দোষ কি?

নিচু হয়ে একটা বল তুলে নিল রবিন। ছুঁড়ে মারল ভালকানের মাথা সই করে।

বিশ

প্রথম বলটা মিস করল। মাথার একফুট দূর দিয়ে চলে গেল। বাড়ির ভেতরে কোন জিনিসে লেগে ঝনঝন শব্দ তুলল।

লাফ দিয়ে সরে গেল ভালকান। ফিরে তাকাল ওর দিকে। রাগে জ্বলছে চোখ।

ততক্ষণে দ্বিতীয় বলটা ছুঁড়ে দিয়েছে রবিন। ভালমত নিশানা করার সময় পায়নি। প্রথমটা লাগাতে না পেরে ভয় পেয়ে গেছে সে। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। চোখের সামনে যেন ঘুরপাক খাচ্ছে সাদা জমাট তুষার।

গায়ের শক্তি দিয়ে বল ছুঁড়েছে সে। সমস্ত রাগ, সমস্ত ক্ষোভ আর হতাশা মিশে আছে ওই ছোঁড়ার পেছনে।

বুলস-আই!

ঠিক কপালে লাগল বলটা।

ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ করে দিল ভালকানকে।

বিস্ময়ে, ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। আপনাআপনি বুজে গেল চোখের পাতা। টলে উঠল দেহ। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। আবার যেন সব কিছু ঘটতে আরম্ভ করেছে স্লো মোশনে।

কপাল চেপে ধরে সিঁড়ির ছোট্ট ধাপের ওপর বসে পড়ল সে। গালাগাল করছে বিড়বিড় করে। বরফের কণা পানি হয়ে গিয়ে গড়িয়ে নামছে গাল বেয়ে। দাড়িতে আটকে যাচ্ছে।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে লিসা।

কেউ নড়ল না।

সময় যেন বরফের মত জমে গেছে। সবাই যেন জমাট বরফ।

তারপর হঠাৎ একসঙ্গে নড়ে উঠল সবাই।

পিস্তলটার জন্যে গোলকীপারের মত দুহাত বাড়িয়ে ঝাঁপ দিল পটার।

প্রায় একই ভঙ্গিতে ঝাঁপ দিল মুসা।

পিস্তলটা ছুঁয়ে ফেলেছে পটারের আঙুল।

কনুই দিয়ে বুকের পাশে গুঁতো মেরে ওকে সরিয়ে দিল মুসা।

পিস্তল ধরার জন্যে থাবা মারল পটার। মিস করল।

লাফ দিয়ে ওর পিঠে চড়ে বসল মুসা। বুনো জানোয়ারের আক্রোশ নিয়ে চুল মুঠো করে ধরে বরফে মুখ ঠুকতে শুরু করল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল পটার। থামল না মুসা। একহাতে পটারের মাথা বরফে চেপে ধরে আরেক হাতে তুলে নিল পিস্তলটা। দূরে ছুঁড়ে ফেলল।

কোথায় পড়ল ওটা, দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল না কিশোর। রবিনকে 'দৌড় দাও' বলেই ছুটতে শুরু করল গোলাঘরের দিকে। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল মুসাও দৌড়ে আসছে। কিশোর তাকাতেই 'জীপ! জীপ!' বলে চিৎকার করে উঠল মুসা।

সিঁড়ির কাছে একে অন্যের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে ভালকান, লিসা আর পটার।

পিস্তলটা কোথায় পড়ল? ছুটতে ছুটতে ভাবছে কিশোর। কেউ কি তুলে নিচ্ছে?

প্রাণপণে ছুটছে তিনজনে। গুলি ছুটে আসার ভয়ে মাথা নিচু করে রেখেছে।

পা পিছলাল রবিন। আছাড় খেয়ে পড়ল। পিছলে গেল কয়েক ফুট। কোনমতে হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে টেনে তুলল শরীরটা। আবার ছুটল।

পেছনে তাকানোর সময় নেই কারও। বরফ মাড়ানোর মচমচ শব্দ তুলে ছুটে চলল গোলাঘরের দিকে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঢুকে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে। বাইরের আলোর তুলনায় এখানে অনেক বেশি অন্ধকার। চোখ মিটমিট করতে লাগল।

দৌড়ে গিয়ে টান মেরে জীপের দরজা খুলে পেছনের সীটে উঠে পড়ল কিশোর।

হাঁপাতে হাঁপাতে প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল রবিন।

ড্রাইভারের পাশের দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলল মুসা। উঠতে গিয়ে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

'কি হলো, মুসা?' চিৎকার করে বলল রবিন। 'দেরি করছ কেন? ওঠো!'

'উঠে কি করব?' নিরাশ ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। 'চাবি পটারের কাছে!'

একুশ

মুহূর্তে একটা কয়েদখানায় পরিণত হলো যেন গোলাঘরটা।

উত্তেজনা আর গুলির ভয়ে চাবির কথা ভুলে গিয়েছিল ওরা। বোকার মত ঢুকে পড়েছে এখানে। পিস্তল হাতে দরজায় এসে দাঁড়ালে এখন সহজেই ওদের গুলি করে মারতে পারবে ভালকান।

তাড়াতাড়ি আবার জীপ থেকে নেমে পড়ল কিশোর আর রবিন। দরজা দিয়ে দেখল ছুটে আসছে ভালকানরা।

'বেরোনোর অন্য কোন পথ নেই?' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'কই আর?' পেছনে তাকাল মুসা। 'পেছনের দরজা নেই। একটা জানালাও নেই।'

চারপাশে তাকাতে তাকাতে স্নোমোবাইলটা চোখে পড়ল কিশোরের। ছুটে গেল ওটার দিকে। স্টার্ট নেবে তো? ভালকান বলেছে বহুবছর ধরে এ ভাবেই পড়ে আছে। ওর কথার কোন বিশ্বাস নেই। অনর্গল মিথ্যে বলেছে সে আর পটার।

দরজার দিকে তাকাল কিশোর।

এখনও একশো গজ দূরে আছে দুজনে।

পালানোর পথ খুঁজছে মুসা আর রবিন। নিদেনপক্ষে গুলি থেকে বাঁচার জন্যে একটা আড়াল পেলেও হত। কিন্তু একধারে পড়ে থাকা কিছু বাক্স ছাড়া আর কিছুই নেই। ওগুলোর আড়ালে লুকিয়ে লাভ হবে না। গুলি ঠেকাতে পারবে না ওই পলকা বাক্স।

স্নোমোবাইলটার দিকে ছুটল কিশোর। এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার জন্যে পুল-রোপ আছে। দুহাতে দড়িটা চেপে ধরে জোরে টান মারল সে। ওকে অবাক করে দিয়ে গর্জে উঠল এঞ্জিন।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল মুসা আর রবিন। অবাক হয়ে গেছে কিশোরের মতই। এত সহজে স্টার্ট নিল!

দেয়ালের কাছ থেকে ওটাকে ঠেলে সরিয়ে এনে চেপে বসল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'আমি ওদের দূরে সরানোর চেষ্টা করব! সুযোগ পেলেই

বেরিয়ে চলে যাবে রাস্তায়!'

'রাস্তায় গিয়ে কি করব?' জানতে চাইল মুসা।

'পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করবে। নিয়ে আসবে এখানে।'

এত জোরে শব্দ করছে এঞ্জিন, ঠিকমত শুনল কিনা ওরা বুঝতে পারল না কিশোর। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ফিরে তাকিয়ে দেখল, দরজার কাছে চলে এসেছে শালা-ভগ্নীপতি।

পিস্তলটা কার কাছে?

কারও হাতে দেখতে পেল না কিশোর।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দরজা আগলে দাঁড়াল ওরা।

তীব্র গতিতে স্নোমোবাইলটাকে দরজার দিকে ছুটিয়ে দিল কিশোর।

কানফাটা গর্জন ইঞ্জিনের।

সাদা তুষারের পটভূমিতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে দরজায় দাঁড়ানো ভালকান আর পটারের অবয়ব। ভালকানকে তাক করে মোবাইল ছোটাল কিশোর।

চিৎকার করে কি যেন বলল পটার। বোঝা গেল না। চোখ বড় বড় হয়ে যেতে দেখল কিশোর। স্নোবোমাইল দরজার কাছে যেতেই ডাইভ দিয়ে দুদিকে পড়ল দুজনে।

বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর। বরফে ঠিকরে আসা তীব্র সাদা আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আধবোজা হয়ে গেল চোখের পাতা।

বরফের ওপর দিয়ে অতি সহজেই পিছলে চলে যাচ্ছে স্নোমোবাইল। সরে যাচ্ছে গোলাঘরের কাছ থেকে দূরে, জমাট-বাঁধা লেকের দিকে।

মুসা আর রবিন এখনও বেরোতে পারেনি গোলাঘর থেকে।

ভালকান আর পটার উঠে দাঁড়িয়েছে। দৌড় দিল কিশোরের দিকে।

যাক! চালাকিটা কাজে লেগেছে। ওর ইচ্ছে পুলিশ না আসা পর্যন্ত দুজনকে ব্যস্ত রাখা। মুসা আর রবিনের দিকে না গিয়ে ওর পিছু নিয়েছে ওরা। এটাই চেয়েছিল সে। পুরো ওপেন করে দিল থ্রটল। এত গতিতে মোড় নিতে গিয়ে আরেকটু হলেই কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল স্নোমোবাইল।

কিন্তু আসবে তো পুলিশ? মিথ্যে কথা বলে ওদের ধোঁকা দেয়নি তো লিসা? হয়তো ফোনই করেনি। ভালকানকে হুমকি দিয়ে বুঝতে চেয়েছিল কতটা রেগে যায় ও। দেখতে চেয়েছিল কি করে।

তাহলে কি আসবে না পুলিশ!

লেকের কাছে প্রায় পৌঁছে গেল কিশোর। সামনে বিছিয়ে আছে জমাট বরফ। ফিরে তাকাল। প্রাণপণে দৌড়ে আসছে ভালকান আর পটার। যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়েও ভালই এগোচ্ছে। খুব বেশি পেছনে নেই আর।

তুষারের একটা স্তূপে ধাক্কা দিয়ে ফোয়ারার মত তুষারকণা ছিটিয়ে ঢাল বেয়ে লেকে নামতে শুরু করল স্নোমোবাইল। তীরের কাছে সাদা হয়ে আছে বরফ। নিশ্চয় পাথরের মত শক্ত [illegible]। আরও কাছে যাওয়ার পর চোখে পড়ল সাদার মাঝে মাঝে কালো হয়ে আছে। অনেক জায়গায় বরফ পুরু হয়নি। ওপরে কয়েক ইঞ্চি জমেছে কেবল, নিচের পানি পানিই রয়ে গেছে।

সাদা জায়গাগুলোতে থাকার চেষ্টা করতে হবে। পাতলা স্তরের ওপর উঠলে স্নোমোবাইলের ভার সইতে পারবে না, ভেঙে যাবে। নিচের পানি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। তাতে পড়ে গেলে আর উঠতে হবে না।

লেকের কিনারে পৌঁছে গেছে ভালকান আর পটার। পাড় বেয়ে দ্রুত নেমে আসতে শুরু করল। পা পিছলাল ভালকান। পিছলে পড়ল নিচে। দৌড়ে নামার চেয়ে সহজে। দেখাদেখি পটারও বসে পড়ে পিছলে নিচে নামল।

ফিরে তাকাতে গিয়ে সামনে নজর রাখতে পারেনি কিশোর। মুখ ফেরাতেই দেখল একটা কালো দাগের কাছে চলে এসেছে স্নোমোবাইল। তাড়াতাড়ি নাক ঘুরিয়ে দিল ওটার।

কিন্তু পাতলা বরফে উঠে গেছে ততক্ষণে। একপাশ দেবে যেতে শুরু করল। নিয়ন্ত্রণ হারাতে চলেছে, বুঝতে পারল কিশোর। অস্বস্তিকর একটা মুহূর্ত। অসহায় লাগল নিজেকে। দিশেহারা হয়ে গেল। যন্ত্রটাকে বাঁচানোর কোন উপায় দেখল না।

অতিরিক্ত গতিতে তীক্ষ্ণ মোড় নিতে গিয়ে চাপটা আরও বেশি পড়ল বরফের স্তরে। সইতে পারল না। চড়চড় করে অদ্ভুত শব্দ তুলে ভেঙে যেতে শুরু করল। ফাটল তৈরি হচ্ছে। এঞ্জিন বন্ধ হয়নি স্নোমোবাইলের। ফাটলের গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল ওটা।

ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারল না কিশোর। হাত ছুটে গেল। উড়ে গি পড়ল কঠিন বরফের ওপর। এত জোরে, মনে হলো ফুসফুসের বাতাস বেরিয়ে গেছে। শ্বাস নিতে পারছে না। নড়তে পারছে না। উঠে দাঁড়ানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। আতঙ্কিত হয়ে ফুসফুসে বাতাস ঢোকানোর চেষ্টা করতে করতে দেখল পিছলে সরে যাচ্ছে স্নোমোবাইলটা।

ওঠো, কিশোর, ওঠো—তাগাদা দিল ওর মন। দম নাও! ধীরে ধীরে!

সাদা বরফ নীলচে লাগছে। সব কিছুই নীল। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে নাকি? নীল আকাশটা নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে পৃথিবীকে? না আকাশের প্রতিবিম্ব সাদা বরফে। সেজন্যেই নীল।

দম নাও! দম নাও! ভালমত!

কানে আসছে ভালকানের চিৎকার আর গালাগাল। শব্দগুলো যেন ধাক্কা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল ওকে। হাঁ করে বাতাস গিলতে শুরু করল। হাত-পা সচল হলো আবার। নিজেকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অবাক হয়ে গেল নিজেই। পারল তাহলে!

কালো একটা দাগের কাছে কাত হয়ে আছে স্নোমোবাইল। এখন ওটা কোন কাজে আসবে না ওর। মাত্র কয়েক গজ পেছনে রয়েছে ভালকান আর পটার। দৌড়াচ্ছে আর পিছলাচ্ছে।

দৌড়ানোর চেষ্টা করল কিশোর। বরফ ভীষণ পিচ্ছিল। কামড়ই বসাতে পারছে না জুতোর তলা। এর ওপর দিয়ে হাঁটার অভ্যাস নেই ওর। দৌড়ানো আরও কঠিন।

ফিরে তাকাল বাড়িটার দিকে। ছুটে আসতে দেখল মুসা আর রবিনকে।
একা!
পুলিশ নেই সঙ্গে!
এদিকে আসছে কেন?
নিশ্চয় ওকে সাহায্য করার জন্যে। ও যে বিপদে পড়েছে, দেখতে পেয়েছে। রাস্তার দিকে না গিয়ে তাই এদিকে ছুটে আসছে।
'থামো!' বরফের স্তরে বাড়ি খেয়ে যেন পিছলে সরে গেল ভালকানের চিৎকার।
'থামো, কিশোর,' পটার বলল, 'দৌড়ানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। পালাতে পারবে না।'
একেবারে পেছনে চলে এসেছে ওরা। হাঁটতেই পারছে না কিশোর। বরফের ওপর দিয়ে দৌড়ানো যে এত কঠিন, জানত না।
থামল না সে। আস্তে আস্তে শিখে ফেলল কি করে দৌড়াতে হয়। কষ্ট হচ্ছে। প্রচণ্ড পরিশ্রম। কিন্তু ছুটতে পারছে এখন। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।
ফুসফুসটা যেন ফেটে যাবে। খিঁচ ধরে যাচ্ছে পায়ের পেশীতে। স্নোমোবাইল থেকে পড়ে গিয়ে বুকে ব্যথা পেয়েছে। পাঁজর ব্যথা করছে।
একটা কালো দাগের কিনার দিয়ে দৌড়ে চলল সে।
পা পিছলাল হঠাৎ। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বরফের ওপর।
ঠিক পেছনেই 'হুয়া!' বলে চিৎকার করে উঠল ভালকান।

বাইশ

দুহাত দিয়ে ওর পা চেপে ধরল ভালকান।
মরিয়া হয়ে লাথি মারতে শুরু করল কিশোর। তুষার ছিটকে উঠল। পেছনে চিত হয়ে পড়ে গেল ভালকান।
উঠে দাঁড়ানোর আগেই কিশোরের কাঁধ চেপে ধরল পটার। ঠেসে ধরে রাখল বরফের ওপর।
'ছাড়ুন! ব্যথা লাগছে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।
উঠে এল ভালকান। মুখ নিচু করে ওর দিকে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। রাগে জ্বলছে দুই চোখ।
'ছাড়ুন আমাকে!' ঝাড়া দিয়ে পটারের হাত থেকে ছুটে যেতে চাইল কিশোর। কিন্তু গায়ের ওজন দিয়ে ঠেসে ধরেছে। সরাতে পারল না।
মুখ তুলে ভালকানের দিকে তাকাল পটার, 'কি করব?'
ভালকান জবাব দেবার আগেই দূরে সাইরেনের শব্দ কানে এল।
'পুলিশ!' বদলে গেল পটারের চেহারা। বিস্ময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভয়।

'লিসা তাহলে সত্যিই ফোন করেছে!' বিড়বিড় করে বলল ভালকান। গাল দিয়ে উঠল নিচু স্বরে।

কিশোরের কথা ভুলে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পটার। সাইরেনের আওয়াজ বাড়ছে। সেদিকে কান পেতে রেখে আবার জিজ্ঞেস করল ভালকানকে, 'কি করব? বহুত তো বড় বড় কথা বলেছিলে—কিছুই হবে না, কিছুই হবে না! এখন হলো কেন? জলদি বলো কি করব এখন!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে ওর কণ্ঠ। প্রলাপ বকা শুরু করেছে যেন।

'চুপ করো!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ভালকান। মুঠো পাকিয়ে ফেলেছে ঘুসি মারার জন্যে।

এই সুযোগে গড়িয়ে সরে গেল কিশোর। উঠে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছে।

কিন্তু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত এখন দুজনে। ওর দিকে তাকাল না।

হামাগুড়ি দিয়ে আরও দূরে সরে যেতে লাগল কিশোর।

কাছে চলে এসেছে সাইরেন।

'কি করব এখন বলছ না কেন?' আবার চিৎকার করে উঠল পটার। 'খুব তো প্ল্যান বানিয়েছিলে! সামলাও এখন! আমাকে যে টাকা দেবে বলেছিলে? কোথায়?...'

'আরে চুপ করো না! ভাবতে দাও!' দাড়ি চুলকাতে শুরু করল ভালকান।

'ভাববে আর কি! ফাঁদ এখন আমাদের জন্যেই। বাঁচতে আর পারব না তোমার বোকামির জন্যে, হেরি। শুধু তোমার গাধামি আর একগুঁয়েমির জন্যে...'

'চুপ করো, পটার! ভাল চাও তো চুপ করো!'

অনেক সরে এসেছে কিশোর। মনে মনে বলছে, চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও তোমাদের ঝগড়া! আমি ততক্ষণে সরে যাই নিরাপদ জায়গায়।

'করব না! কি করবে!' ভালকানের বুকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে বসল পটার। 'পরিস্থিতিকে জটিল করা তোমার স্বভাব। সব সময় সব কিছুকে শুধু জটিলই করেছ তুমি। সহজ বুদ্ধি তোমার মাথায় ঢোকেনি কোনকালে। তখনই বলেছিলাম চলো কেটে পড়ি। অনেক সহজ হয়ে যেত কাজটা।'

'কি সহজ হত, শুনি?' গর্জে উঠল ভালকান। 'এই এলাকার সবাই জানে আমরা ডুগানের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। তার লাশ খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আমাদের পিছু নিত। আমাদের চুরি যাওয়া টাকাও কোনদিন উদ্ধার করতে পারতাম না। অন্য কারও ওপর দোষটা চাপিয়ে দিতে পারলে সব দিক রক্ষা হত...'

'চেষ্টা তো করলে। পারলে কই? ওকে কোথাও মাটি চাপা দিয়ে চলে যেতে পারতাম আমরা। লাশ খুঁজে না পেলে কি করে জানত পুলিশ, ও খুন হয়েছে? বউটা তো বহুদিন আগেই পালিয়েছে। কোনদিন ফিরে আসত না। পরিস্থিতি শান্ত হলে একসময় এসে টাকাগুলো বের করে নেয়া যেত...'

আরও সরে গেল কিশোর। যথেষ্ট দূরে চলে এসেছে। উঠে দাঁড়াল।

কানে আসছে ভালকানের চিৎকার, 'তোমার ওই হাদা বোনটার মতই তুমিও একটা হাঁদা!'

'তুমি তো খুব চালাক! পারলে না সামলাতে? এখন পুলিশ আসে কেন? কেটে পড়লে তা-ও বাঁচার একটা সুযোগ থাকত...'

'দেখো, অত পাগল হওয়ার কিছু নেই...'

খুব জোরে শব্দ হচ্ছে সাইরেনের। বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছে নিশ্চয় পুলিশ। লেকের কিনারে চলে এসেছে মুসা আর রবিন।

'পাগল না হওয়ার আর বাকিটা আছে কি!' চিৎকার করে বলল পটার। 'তোমার যা ইচ্ছে করো, হেরি, আমি অত সহজে ধরা দিচ্ছি না। জেলে আটকে পচে মরতে পারব না।' মরিয়া হয়ে উঠেছে ও। চোখে ভীত, বুনো দৃষ্টি। 'আমি চলে যাচ্ছি...'

তেইশ

ফিরে তাকাল কিশোর। ছুটে যেতে দেখল পটারকে। পুলিশ আসতে এত দেরি করছে কেন?

বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল লিসা দৌড়ে আসছে। কোটের বোতাম খোলা। কানা দুটো বাড়ি লাগছে শরীরের দুই পাশে।

পুলিশের গাড়ির দেখা নেই।

চতুর্দিকে সব সাদা। এতই সাদা, এই উত্তেজনা আর ঘোলাটে পরিস্থিতির মধ্যেও রাশেদ পাশার জোকটা মনে পড়ল—সাদা কাগজ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বল্ তো এটা কিসের ছবি?'

সাদা রঙ। সাদা আলো। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা। পিচ্ছিল, ঠাণ্ডা বরফ। সব মিলিয়ে সাদা একটা দুঃস্বপ্ন ...

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল পটার। তুষারকণা ছিটকে গেল চতুর্দিকে।

কানে এল বিচিত্র চড়চড় শব্দ। ফিরে তাকাল কিশোর।

পাগলের মত চিৎকার করছে পটার। পাতলা বরফের ওপর পড়েছে ভেঙে যাচ্ছে স্তর।

বরফ ভাঙতে যে এত শব্দ করে, জানা ছিল না কিশোরের।

দুহাত ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল পটার। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। ওর সেই আতঙ্কিত দৃষ্টি জীবনে ভুলবে না কিশোর।

সরে গেল নিচের বরফ। টুপ করে নিচে চলে গেল পটার। প্রচণ্ড টানে ওকে তলায় নিয়ে গেল যেন কোন অদৃশ্য দানব।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। যেন নড়ার ক্ষমতা নেই। কিছু করার ক্ষমতা নেই। চোখের সামনে ভাসছে কালো পানিতে ডুবে যাওয়ার আগ পটারের আতঙ্কিত চেহারা। হাত দুটো ওপরে তোলা। বাঁচার আকুতি।

'পটার! পটার!' বলে চিৎকার করে উঠল লেকের তীরে দাঁড়ানো লিসা।

বরফের ফেটে যাওয়া জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

ভেসে উঠেছে পটার। ওপরে বেরোনোর চেষ্টা করছে। হাত-পা ছুঁড়ছে বরফের স্তরের নিচে। ঘোলাটে ভেজা কাঁচের ভেতর দিয়ে যেন দেখা যাচ্ছে শরীরটা। দোমড়ানো। কিম্ভূত। ওর অবস্থা দেখে রান্নাঘরে কলে আটকানো ছোট ইঁদুরটার কথা মনে পড়ল কিশোরের।

পটারের নাম ধরে ডেকেই চলেছে লিসা।

এতক্ষণে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। সচল হলো মগজ। দৌড়ে চলে এল পটারের কাছাকাছি। উপুড় হয়ে পড়ল বরফের ওপর। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল পাতলা কিনারটার কাছে যতটা সম্ভব। হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। পটারকে ছোঁয়ার চেষ্টা করল। মাত্র কয়েক ফুট দূরে আছে ও।

আরেকটু এগোল কিশোর।

আর মাত্র এক ফুট দূরে। কোনমতে একটা হাত ধরতে পারলেই হয়।

চড়চড় করে উঠল ওর নিচের বরফ। থামল না তবু। পটারের হাত ধরলে ও যে টান দেবে, উঠে আসতে চাইবে, তাতে চাপ পড়বে বরফের স্তরে, ভেঙে তলিয়ে যাবে দুজনেই—এ কথাটা মাথায়ই আনল না কিশোর।

আরও জোরে চড়চড় করে উঠল বরফ। সামনে থেকে খসে গেল অনেকখানি। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল পটারকে। পানিতে ডিগবাজি খেতে দেখা গেল ওর শরীরটা।

চিৎকার করেই চলেছে লিসা।

ডুবে গেছে পটার। বরফের নিচেও আর দেখা যাচ্ছে না ওকে। ভাসল না একটিবারের জন্যে।

কিশোরের নিচে আবার চড়চড় করে উঠল বরফ। আর ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। পিছিয়ে আসতে শুরু করল সে। নজর সামনের কুয়ার মত কালো গর্তটার দিকে। কিনারে সাদা বরফ। নিচে কালো পানি।

কতক্ষণ অপেক্ষা করল পটারের জন্যে বলতে পারবে না। কিন্তু আর ভাসল না ও।

সাধারণ পানি হলে এককথা ছিল। বরফ শীতল পানিতে ডুবলে জমে গিয়ে এমনিতেই খুব দ্রুত মারা যায় মানুষ। তার ওপর রয়েছে বরফ। মাথা তোলা অসম্ভব।

পটার আর ভাসবে না, বুঝতে পারছে কিশোর।

এখনও চিৎকার করছে লিসা। ভাইয়ের নাম ধরে ডাকছে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

পায়ের নিচে চড়চড় শব্দ চমকে দিল তাকে। ঝট করে মাথা নিচু করে তাকাল। ফেটে যাচ্ছে বরফ। বরফ শীতল একটা হাত যেন খামচি মেরে ধরল ওর হৃৎপিণ্ড। বুঝতে পারছে, পটারের মতই ওকেও গিলে ফেলতে চাইছে বরফ!

খবরদার! নিজেকে ধমক লাগাল কিশোর। মাথা গরম কোরো না!

এখনও পুরো ফেটে যায়নি স্তরটা, ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে শুধু। বোঝার চেষ্টা করল কোনদিকে গেলে বাড়বে না। দৌড়ে পার হয়ে যাবে, নাকি আস্তে আস্তে পা পা করে এগোবে?

ফাটলের বেশি কিনারে গেলে ওর শরীরের ভারে কাত হয়ে স্তরটা উল্টে যাওয়ার ভয় আছে। খুব সাবধানে এক পা সামনে বাড়াল সে।

চড়চড় করে উঠল বরফ। পানি ছিটকে এসে পড়ল জুতোর ওপর।

মন থেকে পটারের আতঙ্কিত চেহারাটা মুছে ফেলার চেষ্টা করল সে। গেল না ওটা। বরং আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল আতঙ্কিত মুখ, ওপর দিকে তোলা হাত, বাঁচার প্রচণ্ড আকুতিতে আঙুলগুলোর বরফের ধার খামচে ধরার দৃশ্য।

ভাবনা বাদ দাও! আবার নিজেকে ধমক লাগাল কিশোর। বাঁচার চেষ্টা করো। অন্য সব চিন্তা বাদ।

তীরের দিকে তাকাল সে। এত কাছে, অথচ মনে হচ্ছে কত দূরে! লিসাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে ভালকান। ওদের পেছনে সাইরেন বাজাতে বাজাতে আসছে দুটো পুলিশের গাড়ি। ছাতের লাল আলোগুলো ঘুরছে। ঝিলিক দিচ্ছে। প্রতিফলিত হয়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে তুষারকে।

এগিয়ে যাবে, ঠিক করল কিশোর। এক পা এগোল। হাত নাড়ল পুলিশের গাড়ির উদ্দেশ্যে। চিৎকার করে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। শব্দ হলেও যদি ফেটে যায় বরফ? তেমন কিছু ঘটার অবশ্য সম্ভাবনা নেই। কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেলে বাস্তববোধ থাকে না আর মানুষের।

তীর থেকে নেমে কিশোরের দিকে দৌড়ে আসতে শুরু করল মুসা।

হাত নেড়ে চিৎকার করে তাড়াতাড়ি পুলিশকে কাছে আসতে ডাকছে রবিন।

এসে দাঁড়াল গাড়ি দুটো। পিস্তল হাতে লাফ দিয়ে নামল কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

বাধা না দিয়ে আত্মসমর্পণ করল ভালকান। পটারের মত পালানোর চেষ্টা করল না। লিসার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

সবার চোখ এখন কিশোরের দিকে।

কাছে চলে এল মুসা। ফাটলের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে হাত লম্বা করে দিল, 'দৌড় মারো, কিশোর! ভেঙে যাচ্ছে তো!'

চড়চড় ছাড়াও বিচিত্র আরেক ধরনের শব্দ করছে এখন বরফ। দূরাগত মেঘের ডাকের মত গমগমে, চাপা শব্দ। বরফের স্তরের নিচ দিয়ে শব্দটা এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভাঙছে বরফের বিশাল স্তর।

পেছনে বরফ দেবে গিয়ে কিভাবে বেরিয়ে পড়ছে কালো পানি দেখার জন্যে পেছন ফিরে তাকাল না কিশোর। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে মুসার কথামত আচমকা ছুটতে শুরু করল।

পৌঁছে গেল মুসার বাড়ানো হাতের কয়েক গজের মধ্যে।

একটানা শব্দ করছে বরফ। বাড়ছে ক্রমেই।

পায়ের নিচে নেমে যেতে শুরু করল বরফ। ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে যাচ্ছে স্তরটা।

নাহ্, পেরোতে পারব না! অবশ হয়ে আসছে কিশোরের হাত-পা। পার হতে পারব না এই বিভীষিকা!

পেরোতেই হবে!—মনের ভেতর কোথাও গর্জে উঠে সাহস দিল ওকে একটা কণ্ঠ।

ছোটা বন্ধ করল না কিশোর। ক্রমেই আরও কাত হয়ে যাচ্ছে পায়ের নিচের বরফ। থামল না সে। পিছলে পড়তে পড়তে কোনমতে পার হলো শেষ কয়েকটা কদম। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসার বাড়ানো হাতের মধ্যে।

হ্যাঁচকা টানে ওকে কাছে টেনে নিল মুসা। চিত হয়ে পড়ে গেল শক্ত বরফে। গায়ের ওপর পড়ল কিশোর।

ওভাবেই কয়েকটা সেকেন্ড পড়ে রইল দুজনে। তারপর গড়িয়ে মুসার গায়ের ওপর থেকে সরে গেল কিশোর। পেছনে তাকিয়ে দেখল খানিক আগে যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল সে, সেটা এখন পানির নিচে। স্তরের অন্যপাশটা খাড়া হয়ে গেছে ওপর দিকে। বরফের বড় বড় টুকরোগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোনটা ডুবে যাচ্ছে, কোনটা ভুস করে মাথা তুলছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। হীমঠাণ্ডা লেকে পড়লে কি অবস্থা হত ভাবতে চাইল না আর কিশোর। ফিরে তাকাল মুসার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'ব্যথা পেয়েছ?'

মুসা জবাব দিল, 'পেয়েছি। কিন্তু টের পাচ্ছি না।'

'তাহলে মাথা ডলছ কেন?'

'এমনি।'

ভলিউম ২৭

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০